রমযান মাসের ৩০ আসর

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল উসাইমিন রহ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর কাছেই তাওবা করি; আর আমরা আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। সুতরাং আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তার ওপর, তার পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করবে তাদের সবার উপর সালাত ও যথাযথ সালাম পেশ করুন।

অতঃপর:

এ হচ্ছে ‘মুবারক রমযান মাসের কিছু আসর’; যাতে সিয়াম, কিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ও এ উত্তম মাসের উপযোগী কিছু বিধান স্থান পেয়েছে।

* আমি এটাকে দৈনিক অথবা রাত্রিকালিন আসররূপে সাজিয়েছি।

* এর অধিকাংশ খুতবা বা আসরের ভূমিকা আমি ‘কুররাতুল ‘উয়ূনিল মুবসিরাহ বি তালখীসে কিতাবিত তাবসিরাহ’ গ্রন্থ থেকে যতটুকু যথা সম্ভব পরিপাটি করে চয়ন করেছি।

* আর আমি এখানে যত বেশি সম্ভব হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান, ও আদাব নিয়ে নিয়ে এসেছি; কারণ মানুষের এটাই বেশি প্রয়োজন।

* আর আমি এটাকে ‘মাজালিসু শাহরি রামাদান’ বা ‘রমযান মাসের আসরসমূহ’ নামকরণ করেছি।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এ আমলটুকু একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বানান এবং এর দ্বারা উপকৃত করেন। নিশ্চয় তিনি অত্যাধিক দাতা ও সম্মানিত।

সূচীপত্র

প্রথম আসর

রমযান মাসের ফযীলত

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি আসমান, যমীন ও তার মধ্যকার সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। রাতের অন্ধকারে ক্ষুদ্র পীপিলিকার বেয়ে উঠাও যার দৃষ্টি বহির্ভূত নয় এবং আসমান ও যমীনের বিন্দু-বিসর্গও যার জ্ঞানের বাইরে নয়। “যা আছে আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু’য়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং যা আছে মাটির নিচে সব তাঁরই। আর যদি তুমি উচ্চস্বরে কথা বল তবে তিনি গোপন ও অতি গোপন বিষয় জানেন। আল্লাহ তিনি ছাড়া সত্য কোনো মা‘বুদ নাই; সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।” [সূরা ত্বা-হা: ৬-৮] তিনি আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরীক্ষার মাধ্যমে মনোনীত করে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি নুহ ‘আলাইহিস সালামকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে নৌকা তৈরি করেছেন এবং সেটাকে চালিয়েছেন। স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু ইব্রাহিম ‘আলাইহিস সালামকে আগুন থেকে নাজাত দিয়েছেন এবং সেটার উষ্ণতাকে

সুশীতল ও আরামদায়ক করেছেন। মুসা ‘আলাইহিস সালামকে নয়টি নিদর্শন দান করেছেন; কিন্তু ফেরআউন সেটা দ্বারা নসীহত নিতে পারেনি, তার অবস্থান থেকেও সরে আসে নি। ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে এমন নিদর্শন দান করেছেন যা সৃষ্টিকুলকে বিস্মিত করে দিয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে রয়েছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং হেদায়েত।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাঁর অফুরন্ত অসংখ্য ও অনবরত প্রাপ্ত নেয়ামতের। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক উম্মুল কুরা (মক্কায়) প্রেরিত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। অবারিত শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, হেরা গুহায় তার নিশ্চিত পরম সঙ্গী আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, সত্যের ইঙ্গিত প্রাপ্ত মতের অধিকারী এবং আল্লাহর আলোতে যিনি দেখতে পেতেন সে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তাঁর দু কন্যার স্বামী যিনি ছিলেন সত্যভাষী সে উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তাঁর চাচাত ভাই আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, যিনি ছিলেন জ্ঞানের সাগর, বনের বাঘ, তাদের সবার উপর এবং অপরাপর সম্মানিত আহলে বাইত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম যাদের শ্রেষ্ঠত্ব জগতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং

মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

- **প্রিয় ভাই সকল!** আমাদের সামনে সম্মানিত রমযান সমাগত যা ইবাদতের মহৎ মওসুম। যে মাসে আল্লাহ তা'আলা নেক আমলের সাওয়াব সীমাহীন বৃদ্ধি করে দেন এবং দান করেন অফুরন্ত কল্যাণ। উন্মুক্ত করেন নেক কাজে উৎসাহী ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সকল দ্বার। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। কল্যাণ ও বরকতের মাস। পুরস্কার ও দানের মাস।

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

'রমযান মাস, যাতে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যা বিশ্ব মানবের জন্য হেদায়েত, সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}

এ মাস রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। যার প্রথমে রয়েছে রহমত, মাঝে রয়েছে মাগফিরাত এবং শেষে জাহান্নাম হতে মুক্তি।

- এ মাসের মর্যাদা ও ফযীলতের ব্যাপারে এসেছে অনেক হাদীস সমূহ যেমন এসেছে অনেক বাণী:

  * সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»

'যখন রমযান মাস আগমন করে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়'।[1]

এ মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয় অধিকহারে নেক আমল করার জন্য এবং আমলকারীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য। আর জাহান্নামের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় ঈমানদারদের গুনাহ কম অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে। শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, যাতে সে অন্যান্য মাসের মত এ মুবারক মাসে মানুষকে পথ ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যেতে না পারে।

---

[১] বুখারী: ১৮৯৯; মুসলিম: ১০৭৯।

* ইমাম আহমদ রহ. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ، لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ: خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَئُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ»

‘আমার উম্মতকে রমযানে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোনো উম্মতকে দেয়া হয়নি: ১। সিয়াম পালনকারীর মুখের না খাওয়াজনিত গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের সুঘ্রাণ থেকেও উত্তম। ২। ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সিয়াম পালনকারীর জন্য মাগফিরাতের দো‘আ করতে থাকে। ৩। আল্লাহ তা‘আলা প্রতিদিন তাঁর জান্নাতকে সুসজ্জিত করে বলেন, আমার নেককার বান্দাগণ কষ্ট স্বীকার করে অতিশীঘ্রই তোমাদের কাছে আসছে। ৪। দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, ফলে তারা অন্য মাসের ন্যায় এ মাসে

মানুষকে গোমরাহীর পথে নিতে সক্ষম হয় না। ৫। রমযানের শেষ রজনীতে সিয়াম পালনকারীদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। বলা হলো- হে আল্লাহর রাসূল, এ ক্ষমা কি কদরের রাতে করা হয়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং কোনো শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক তখনই দেয়া হয়, যখন সে কাজ শেষ করে'।[2]

- **আমার দীনী ভাইয়েরা!** এ মূল্যবান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা অন্য সকল উম্মতের মধ্য থেকে কেবল আপনাদের দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে আপনাদের ওপর নেয়ামাত পূর্ণ করে বিশেষ ইহসান করেছেন। এভাবে আল্লাহর কতই না নেয়ামত ও অনুগ্রহ আপনাদের ওপর ছায়া হয়ে আছে; কারণ,

﴿ كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ ﴾ [ال عمران: ١١٠]

'তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং

[২] আহমদ: ৭৯১৭। হাদীসের সূত্র খুব দুর্বল। হাদীসটি আহমদ ও বাযযার সংকলন করেছেন হিশাম বিন যিয়াদ আবুল মিকদাম সূত্রে। আর বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি যঈফ। বুখারী তার সম্পর্কে বলেছেন, তার সম্পর্কে কথা আছে। আবূ দাউদ বলেছেন, অনির্ভরযোগ্য। আবূ হাতেম বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন দুর্বল বর্ণনাকারী। ইবন হিব্বান বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। হাফেয বলেছেন, পরিত্যাজ্য। [দেখুন, তারীখ ইবন মুঈন: ২/৬১৬; জারহ ওয়াত-তা'দীল: ৯/৫৮; আল-কামেল: ৭/২৫৬৪; তাহযীব: ১১/৩৮; তাকরীব: ২/৩১৮]।

অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখবে’। {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০}

[হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ]

প্রথম বৈশিষ্ট্য:

«خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

‘সিয়াম পালনকারীর মুখের না খাওয়াজনিত গন্ধ মহান আল্লাহর কাছে মিসকের চেয়েও অধিক উত্তম ঘ্রাণসম্পন্ন’।

আরবী خُلُوفُ শব্দটি প্রথম হরফে পেশ ও যবর যুক্ত হয়ে অর্থ দেয়, পাকস্থলি খাবারশূন্য হলে মুখের ঘ্রাণের পরিবর্তন এবং এক প্রকার ভিন্ন গন্ধ সৃষ্টি হওয়া। এ দুর্গন্ধ মানুষের কাছে অপ্রিয় হলেও আল্লাহ তা‘আলার কাছে মিসক থেকেও অধিক সুঘ্রাণসম্পন্ন। কেননা এ দুর্গন্ধ আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আর প্রত্যেক অপ্রিয় জিনিস যা আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতের কারণে সৃষ্টি হয় তা আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কল্যাণকর শ্রেষ্ঠ ও উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হয়।

যেমন দেখুন শহীদদের প্রতি, যিনি আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে শাহাদাত বরণ করেন। কিয়ামতের দিন তিনি এমন অবস্থায় উঠবেন যে, তার শরীরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত টপটপ করে পড়তে থাকবে যার রং হবে রক্তের কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিসকের ঘ্রাণের ন্যায়[3]।

অনুরূপভাবে হাজীদের ব্যাপারে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা আরাফাতের ময়দানের অবস্থানরতদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন,

«انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَؤُلَاءِ جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا»

'তোমরা আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করো, এরা আমার কাছে এলোমেলো চুল, ধুলিমাখা অবস্থায় হাজির হয়েছে'।[4] হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও ইবন হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

---

[৩] হাদীসে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যারাই আল্লাহর রাস্তায় যখম হবে, আর আল্লাহই ভালো জানেন কে আল্লাহর রাস্তায় যখম হয়েছে, সে ব্যক্তিই কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তার রং হবে রক্তের অথচ তার গন্ধ হবে মিসকের"। বুখারী, ২৮০৩, মুসলিম, ১৮৭৬।

[৪] ইবন হিব্বান: ৩৮৫২; মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৫ নং ৮০৩৩।

এক্ষেত্রে এলোমেলো চুল আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার কারণ, তা আল্লাহর আনুগত্যে ইহরামের নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিত্যাগ ও বিলাসিতা বর্জনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য:

«وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا»

‘সিয়ামপালনকারীর জন্য ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতাগণ মাগফিরাত কামনা করতে থাকেন।’

ফেরেশতাগণ আল্লাহর সম্মানিত বান্দা।

﴿ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ ﴾ [التحريم: ٦]

‘তারা আল্লাহর কোনো নির্দেশ অমান্য করে না। বরং তাঁর সকল নির্দেশ পালন করে।’ {সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬}

যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সিয়াম পালনকারীদের জন্য দো‘আ করার অনুমতি দিয়েছেন। এজন্য তাদের দো‘আ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদেরকেও এ উম্মতের সিয়াম পালনকারীদের জন্য জন্য দো‘আ করার

অনুমতি দিয়েছেন। যা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি, তাদের স্মরণ সমাদৃত হওয়া এবং তাদের সিয়াম অধিক ফযীলতপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আর ইস্তেগফার হচ্ছে, মাগফিরাত কামনা করা। দুনিয়া ও আখেরাতে গুনাহকে গোপন রাখা এবং এড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। এটাই প্রধান আকাঙ্ক্ষা ও সর্বোচ্চ প্রাপ্তির বিষয়। কারণ, প্রত্যেক আদম সন্তান গুনাহগার, নিজের উপর সীমালঙ্ঘনকারী, মহান আল্লাহর ক্ষমার বেশি মুখাপেক্ষী।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য:

«وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَئُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ»

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা প্রতিদিন (মাহে রমযানে) জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বলেন, অতি শীঘ্রই আমার নেককার বান্দাগণ দুনিয়ার ক্লেশ-যাতনা সহ্য করে তোমার কাছে আসছে।’

আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যহ জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন তার নেককার বান্দাদের প্রস্তুতি ও তাতে প্রবেশে উৎসাহ এবং প্রেরণা দেওয়ার জন্য।

হাদীসে বর্ণিত الْمَئُونَةَ وَالْأَذَى এর অর্থ হচ্ছে: দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট। অতএব, দুনিয়ার ক্লেশ-যাতনা সহ্য করা এবং সদা সর্বদা নেক আমলের প্রস্তুতি গ্রহণ ও তাতে লিপ্ত থাকার মধ্যেই রয়েছে মুমিনের ইহকালীন ও পরকালীণ সফলতা। এর মাধ্যমেই শান্তির আবাসস্থল জান্নাতের পথ সুগম করা উচিত।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য:

«وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ»

‘বিতাড়িত শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।’

এর ফলে এরা আল্লাহর নেককার বান্দাদের অন্য মাসের মত গোমরাহ করার এবং সৎ কাজ থেকে বিরত রাখার সুযোগ পায় না। এটা আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে মেহেরবানী যে, তিনি বান্দাদের থেকে তাদের চির শত্রু শয়তানকে বন্দি করে রেখেছেন যে শত্রুবাহিনী মানুষদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চায়।

এ কারণে আপনি দেখবেন, নেককার বান্দাগণ অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসে নেক কাজের প্রতি অধিক উৎসাহী হয় এবং গুনাহের কাজ থেকে অনেক দূরে থাকে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য:

«وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ»

‘আল্লাহ তা‘আলা মাহে রমযানের শেষ রাতে উম্মতে মুহাম্মদীকে ক্ষমা করে দেন।’

যখন তারা সিয়াম (রোযা) ও কিয়াম (তারাবীর সালাতের) মাধ্যমে এ মুবারক মাসের হক আদায় করে। তখন আল্লাহ তাদের বিশেষভাবে ক্ষমা করেন।

আর সিয়াম পালন যথাযথভাবে করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিঃসন্দেহে একটি মেহেরবানী। তিনি তাদের আমল শেষে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান দিয়ে তাদের প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করেন। কারণ একজন কাজের লোককে কাজের শেষেই তার পাওনা পুরা করে দিতে হয়।

- **মহান আল্লাহ তা‘আলা মাহে রমযানের এ প্রতিদানের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের ওপর তিন দিক থেকে করুণা ও মেহেরবানী করেছেন।**

প্রথমত: আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জন্য এ মাহে রমযানে নেক আমল করার এমন ব্যবস্থা করেছেন যা তাদের মর্যাদা বুলন্দ করাসহ তাদের গোনাহ মাফের কারণ হবে।

যদি তিনি তাদের জন্য এ ব্যবস্থা না করতেন তাহলে তারা নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতো না। সুতরাং রাসূলগণের কাছে ওহী প্রেরণ ছাড়া কোনো ইবাদতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

এ জন্যই যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার ব্যবস্থা করেন। তাদের ওপর আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের কাজকে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ﴾ [الشورى: ٢١]

‘না-কি তাদের জন্য কোন শরীক বা অংশীদার ব্যক্তিবর্গ আছে যারা তাদের জন্য কোন দ্বীন বা জীবনাদর্শ চালু করেছে যা আল্লাহ মোটেই অনুমতি দেননি’। {সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ২১}

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তাঁর বান্দাদের এ মাহে রমযানে নেক আমল করার তাওফীক দান করেন। অথচ অধিকাংশ মানুষই এ নেক আমলকে পরিত্যাগ করে থাকে। যদি আল্লাহর সাহায্য ও

মেহেরবানী তাদের প্রতি না থাকতো তবে তারা নেক আমলের সম্মান দিতে পারতো না।

সুতরাং এটি সম্পূর্ণই আল্লাহর দান এবং তিনিই পারেন কাউকে নেয়ামতের খোঁটা দিতে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيۡكَ أَنۡ أَسۡلَمُواْۖ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسۡلَٰمَكُمۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ أَنۡ هَدَىٰكُمۡ لِلۡإِيمَٰنِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٧ ﴾ [الحجرات: ١٧]

‘তারা আপনার প্রতি (ওহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলাম গ্রহণের ইহসান বা অনুগ্রহ প্রকাশ করছে। আপনি বলে দিন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করো না। বরং আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি মেহেরবানী করে তোমাদের ঈমানের পথে পরিচালিত করেছেন। যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও’। {সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৭}

তৃতীয়ত: আল্লাহ তা‘আলা এ মাহে রমযানে অনেক প্রতিদান দিয়ে মেহেরবানী করেছেন। প্রতিটি নেক আমল দশগুণ হতে সাতশত বা তার চেয়েও অধিক গুণে বর্ধিত হবে। সুতরাং নেক আমল করে অনেক সাওয়াব অর্জন করা এটা আল্লাহ

তা‘আলারই করুণা ও মেহেরবানী আর যাবতীয় প্রশংসা সকল সৃষ্টির রব আল্লাহর জন্যই।

- **আমার ভাইয়েরা!** মাহে রমযান একটি বিরাট নিয়ামত। এ নিয়ামত তার জন্য যার কাছে এ মাস পৌঁছার পর সে যথাযথভাবে এ মাসের হক পালন করে। গোনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমল ও আনুগত্যের মাধ্যমে তার রবের দিকে ধাবিত হয়, গাফলতি ছেড়ে আল্লাহর যিকিরে মত্ত হয় এবং তাঁর থেকে দূরত্ব ছেড়ে তাঁর নৈকট্য অর্জন করে তাঁর দিকে এগিয়ে যায়। কবির ভাষায়:

يا ذا الذي ما كفاه الذين في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان

لقد اظلك شهر الصوم بعدهمـــا فلا تصيره أيضا شهر عصيان

واتل القرآن وسبح فيه مجتهـــدا فإنــــــه شهر تسبيح وقرآن

كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين اهل وجيران وأخـــوان

افناهم الموت واستبقاك بعد بعد همو حيا فما اقرب القاصى من الداني

‘হে অমুক ব্যক্তি! যার গুনাহ রজব মাসে যথেষ্ট পরিমাণ হয়েছে। এমনকি শাবান মাসেও সে তার রবের প্রতি নাফরমানী করেছে।

রজব ও শাবান মাসের পর তোমার কাছে সুশীতল ছায়া বিস্তার করে মাহে রমযান হাযির হয়েছে। তাকে তুমি পাপের মাস বানিয়ে নিও না।

কুরআন তিলাওয়াত করো, গভীর মনোনিবেশ নিয়ে তাসবীহ পাঠ করো। কারণ এটা কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবীহ পাঠের মাস।

তোমার আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী যাদের অনেককেই তুমি চিনতে জানতে, তারা সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছে।

মৃত্যু তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছে। তোমাকেও মরতে হবে। অবশ্য তুমি এখনো পৃথিবীতে জীবতাবস্থায় আছ।

তবে শুনে রাখো! আমল করতে হবে। কারণ, কি করে আমল থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি আমলকারী আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাহর নিকটে বা সমপর্যায়ে আসতে পারে?

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জাগ্রত করুন উদাসীনতার নিদ্রা থেকে, তাওফীক দিন প্রস্থানের আগেই তাকওয়ায় সুসজ্জিত হতে এবং অবসর সময়গুলো কাজে লাগাতে। আর হে শ্রেষ্ঠ করুণাময়, আপনি আপনার দয়ায় ক্ষমা করুন আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতা ও সকল মুসলিমকে।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাথীদের উপর।

দ্বিতীয় আসর

সিয়ামের ফযীলতের বর্ণনা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সূক্ষ্মদ্রষ্টা, দয়ালু ও দয়াপ্রদর্শনের মালিক, অমুখাপেক্ষী, শক্তিশালী ক্ষমতাধর, সহিষ্ণু, সম্মানিত, করুণাময় ও অতিশয় দয়ার্দ্র, তিনিই প্রথম; তাঁর আগে কেউ নেই, তিনিই সর্বশেষ; তাঁর পরে কেউ নেই। তিনি যাহের-সর্বোপরে; তার ওপর কিছু নেই, তিনি বাতেন-সর্বনিকটে; তাঁর চেয়ে নিকটে কিছু নেই। যা হবে এবং হয়েছে সবই তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারের আয়ত্বাধীন। সম্মানিত করেন আবার অপমানিতও করেন, তিনি বিত্তশালী বানান এবং তিনিই বিত্তহীন করেন। যা ইচ্ছা তা করেন তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী; প্রতিদিন তিনি কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্ম করেন। যমীনকে তার বিভিন্ন প্রান্তে পাহাড় দিয়ে পেরেক মেরে দিয়েছেন। ভারী মেঘমালাকে পানি নিয়ে পাঠিয়েছেন যার মাধ্যমে যমীনকে জীবিত করেন। যমীনের বুকে বসবাসকারী প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর ক্ষণ নির্ধারণ করেছেন যাতে করে যারা অপরাধী তাদেরকে অপরাধের শাস্তি দেওয়া আর যারা ইহসান

তথা সঠিক কাজ করেছে তাদের কাজের সঠিক প্রতিদান প্রদান করা যায়।

আমি তাঁর যাবতীয় পূর্ণ-সুন্দর গুণাগুণের উপর তার প্রশংসা করছি। তার পরিপূর্ণ নে‘আমতের উপর তার শুকরিয়া আদায় করছি। আর শুকরিয়ার মাধ্যমেই দান ও দয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি রাজাধিরাজ, যথাযথ বিচারকারী। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে মানুষ ও জিন সবার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর উপর, তার পরিবার-পরিজন, সাহাবী ও যাবতকাল ব্যাপী তার অনুসারীদের উপর দরুদ পাঠ করুন এবং তাদের প্রতি যথাযথ সালাম প্রেরণ করুন।

- **দ্বীনী ভাইগণ!** নিশ্চয়ই সিয়াম হচ্ছে অন্যতম উত্তম ইবাদত ও মহান পুণ্যকর্ম। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে এর ফযীলত বর্ণিত আছে। আর এ ব্যাপারে মানুষের মাঝে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত আছে।

সিয়াম পালনের অন্যতম ফযীলত:

১। সিয়াম ফরয করা হয়েছে:

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতের ওপর তা লিখে দিয়েছেন এবং তাদের উপর তা ফরয করেছেন।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমনি ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপর, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।" {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩}

আর যদি এ সিয়াম সাধনা এমন একটি মহান ইবাদত না হতো যার দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা ব্যতীত সৃষ্টিকুল অমুখাপেক্ষী হতে পারে না, আর তার উপর ব্যাপক সওয়াবের বিষয়টি নির্ভর না করত তবে আল্লাহ সকল উম্মতের ওপর তা ফরয করতেন না।

২। সিয়াম সাধনা মানুষের পাপ মোচনের একটি উন্নত মাধ্যম:

* বুখারী ও মুসলিম এসেছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী পাপরাশী ক্ষমা করে দেয়া হবে"।[5]

অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ঈমান ও সিয়াম ফরয হওয়াকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সিয়ামের প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় এ বিধান পালন করলেই কেবল উপরোক্ত ফযীলত পাওয়া যাবে। সিয়াম ফরয হওয়াতে বিরক্ত হওয়া এবং সিয়ামের পুরস্কারের ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। এভাবে সিয়াম পালন করলেই আল্লাহ তা'আলা অতীতের পাপসমূহ মার্জনা করে দেবেন।

* অনুরূপ সহীহ মুসলিমে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[৫] বুখারী: ৩৮; মুসলিম: ৭৬০।

«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»

“পাঁচ ওয়াক্তের সালাত, এক জুমআ হতে অন্য জুমআর সালাত এবং এক রমযান হতে অন্য রমযানের সিয়াম মধ্যবর্তী সময়ের সকল অপরাধের কাফফারাস্বরূপ, যদি কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে”।[6]

৩। সিয়াম পালনকারীর প্রতিদান কোনো সংখ্যা দ্বারা সীমিত করা হয় নি, বরং সিয়াম পালনকারীকে তার সীমাহীন প্রতিদান দেয়া হবে:

* বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ»

---

[৬] মুসলিম: ২৩৩।

“আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, সিয়াম ছাড়া আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য, কারণ তা কেবল আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। যদি তোমাদের কেউ সিয়াম পালন করে, তাহলে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তবে সে যেন বলে, আমি সিয়াম পালনকারী। ওই সত্তার শপথ! যার হাতে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, নিশ্চয়ই সিয়াম পালনকারীর মুখের না-খাওয়াজনিত গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশক আম্বরের চেয়েও অধিক প্রিয়। রোযাদারের জন্য দু’টি আনন্দ রয়েছে-একটি যখন সে ইফতার করে, অন্যটি যখন সে তাঁর রব আল্লাহর দিদার লাভ করবে তখন আনন্দ প্রকাশ করবে।”[7]

* মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي»

“প্রত্যেক আদম সন্তানকে তার নেক আমল দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা‘আলা

[৭] বুখারী: ১৯০৪; মুসলিম: ১১৫১।

বলেন: তা অবশ্য সিয়ামের প্রতিদান ছাড়া; কারণ সিয়াম আমার জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব। কেননা আমার কারণে সিয়াম পালনকারী তার যৌনকার্য ও আহার বর্জন করে থাকে।”[৪]

- **এ তাৎপর্যপূর্ণ হাদীসটি বিভিন্ন দিক থেকে সাওমের ফযীলতের ওপর প্রমাণ বহন করছে:**

প্রথম দিক: আল্লাহ তা‘আলা সকল ইবাদতের মধ্য থেকে সাওমকে নিজের জন্য খাস করেছেন। কারণ সাওম আল্লাহর কাছে একটি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। সাওমকে আল্লাহ ভালবাসেন। সাওমের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি ইখলাস প্রকাশ পায়। কারণ এটা বান্দা ও তার রবের মাঝে এমন এক গোপন ভেদ যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানতে পারে না। কেননা সিয়াম পালনকারী ইচ্ছা করলে মানবশূন্য জায়গা বা এলাকায় আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু আহার করতে পারেন কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ তিনি জানেন তার একজন রব রয়েছেন, যিনি নির্জনেও তার অবস্থা জানেন। আর তিনিই তার উপর এটা হারাম করেছেন। তাই তিনি

---

[৪] মুসলিম: ১১৫১।

সাওমের সাওয়াব লাভের আশায় এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার ভয়ে আহার বিহার পরিত্যাগ করেন।

এজন্যই আল্লাহ সিয়াম পালনকারী বান্দার এই ইখলাসের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে সাওমকে সকল ইবাদত থেকে নিজের জন্য বিশিষ্ট করে নিয়েছেন। তাই তো তিনি বলেছেন,

«يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».

“আমার বান্দা আমার কারণে যৌনকাজ ও আহার পরিত্যাগ করে থাকে।”

আর এ বিশিষ্টকরণের উপকারিতা দৃশ্যমান হবে কিয়ামত দিবসে। যেমনটি সুফিয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বলেন:

إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبق إلا الصومُ يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم.

‘যখন কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার বান্দার হিসাব নেবেন এবং বান্দার সব আমল থেকে তার পক্ষ থেকে অন্যের উপর করা জুলুমের বিনিময় মিটিয়ে দিবেন। অবশেষে যখন সিয়াম ছাড়া তার অন্য কোনো আমল থাকবে না তখন আল্লাহ তাঁর পক্ষ

হতে সব জুলুমের বিষয়টি নিজের দায়িত্বে নিয়ে বান্দাকে শুধু সিয়ামের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’[৭]

<u>**দ্বিতীয় দিক:**</u> সাওম সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন: «وأنا أجزي به» ‘সাওমের প্রতিদান আমি নিজে দেব।’ সাওমের প্রতিদানকে আল্লাহ তাঁর স্বীয় সত্তার প্রতি সম্পর্কযুক্ত করলেন। কারণ অন্যান্য নেক আমলের প্রতিদান দ্বিগুণ করে দেয়া হবে। প্রতিটি নেক ‘আমল তার দশগুণ থেকে সাতশ গুণ ও তার চেয়েও অধিকহারে দেয়া হবে। আর সাওমের ছাওয়াবের কোনো সংখ্যা গণনা না করে আল্লাহ তা‘আলা আপন সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর আল্লাহই হলেন সবচেয়ে বড় ও মহান ইজ্জতের অধিকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। দান দানশীল অনুপাতেই হয়ে থাকে। তাই সাওমের সাওয়াব এমন বিরাট যার কোনো হিসেব নেই।

আর সাওম হলো: আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য অবলম্বন, আল্লাহ কর্তৃক হারাম বস্তুসমূহ হতে বাঁচার ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন এবং

---

[৭] মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব: ২/৭। অর্থাৎ সিয়াম দ্বারা জুলুমের প্রতিকার করবেন না। সেটাকে ব্যক্তির অক্ষয় আমল হিসেবে হেফাযত করবেন। [সম্পাদক]

দেহ ও মনের দুর্বলতা এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মতো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান পালনে ধৈর্য ধারণ করার নামান্তর।

* সুতরাং সাওমের মধ্যে ধৈর্য্যের প্রকারত্রয়ের সবই একত্র হয়েছে। আর আল্লাহ তা‘আলা সবর সম্পর্কে বলেছেন:

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ [الزمر: ١٠]

‘নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান হিসেব ছাড়া পূর্ণ করে দেয়া হয়।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০}

তৃতীয় দিক: সাওম ঢাল স্বরূপ। অর্থাৎ তা সিয়াম পালনকারীকে অনর্থক কথাবার্তা ও অশ্লীল সংলাপ হতে রক্ষা করে। এ জন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ»

‘তোমাদের কেউ সাওম দিবসে থাকলে সে যেন অশ্লীল ভাষায় কথা না বলে এবং চিৎকার করে বাক্য বিনিময় না করে।’

* আর সিয়াম তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকেও রক্ষা করবে। যেমন ইমাম আহমদ রহ. জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে

হাসান সনদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ، يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ»

‘সিয়াম ঢাল স্বরূপ যার দ্বারা সিয়াম পালনকারী নিজেকে জাহান্নাম হতে বাঁচাতে পারে।’[10]

চতুর্থ দিক: সিয়াম পালনকারীর মুখের না খাওয়া জনিত গন্ধ আল্লাহর কাছে মেসকের সুগন্ধি হতেও প্রিয়। কারণ এ গন্ধ রোযার কারণে হয় তাই তা আল্লাহর কাছে সুগন্ধি ও প্রিয় বলে বিবেচিত হয়। এটা আল্লাহর কাছে সিয়ামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রমাণ। আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে সিয়াম পালিত হয় বলেই রোযাদারের মুখের গন্ধ মানুষের কাছে অপছন্দনীয় হলেও আল্লাহর কাছে তা সুপ্রিয় ও পছন্দনীয় হয়।

পঞ্চম দিক: সিয়াম পালনকারীর জন্য দু’টি আনন্দ রয়েছে। একটি আনন্দ ইফতারের সময়, অন্যটি আল্লাহর দীদার লাভের সময়।

---

[১০] মুসনাদ আহমাদ: ১৫২৬৫। হাসান সূত্রে বর্ণিত।

ইফতারের সময় আনন্দ: ‘সিয়াম পালনকারী সর্বোত্তম নেক আমলের অন্যতম ইবাদত সাওম সম্পন্ন করার কারণে আল্লাহ তার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এ জন্য আনন্দ প্রকাশ করে।

কারণ বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা এ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে; কেননা তারা সাওম পালন করে নি। বরং পানাহার ও স্ত্রী সহবাস যা আল্লাহ তার জন্য অন্য অবস্থায় হালাল করেছেন কিন্তু সাওম অবস্থায় হারাম করেছেন, তা দিয়ে (অবৈধ) আনন্দ-উদযাপনে লিপ্ত।

আল্লাহর দিদার লাভের সময় আনন্দ: ‘যখন একজন সাওম পালনকারী তার অতি দরকারী মুহূর্তে আল্লাহর কাছ থেকে পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবে তখন সাওমের কারণে আনন্দ প্রকাশ করবে। যখন বলা হবে:

«أَيْنَ الصَّائِمُونَ لَيَدْخُلُوا الجنة مِنْ بَاب الريان الذي لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ غَيْرُ هُمْ».

‘সাওম পালনকারীরা কোথায়? তারা রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে যেন জান্নাতে প্রবেশ করে, ওই দরজা দিয়ে সাওম পালনকারীরা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

০ **<u>উপরোক্ত হাদীসে</u>** সাওম পালনকারীর জন্য একটি দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে কিংবা তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায় সে তার অনুরূপ ভূমিকা নেবে না। যাতে না গাল-মন্দ ও সংঘর্ষ বেড়ে যায়, আবার নীরবতা অবলম্বন করে নিজেকে দুর্বল হিসেবেও প্রকাশ করবে না। বরং বলবে 'আমি তো রোযাদার।' যাতে ইঙ্গিত করা হয় যে, প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষমতার জন্য নয়, বরং সাওমের সম্মানার্থে ঐ ব্যক্তির অনুরূপ আচরণে সে লিপ্ত হবে না। আর এভাবে ঝগড়া-বিবাদ ও সংঘাত বন্ধ হয়ে যাবে।

﴿ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ٣٤ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٣٥ ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥]

'তুমি উত্তম পন্থায় প্রত্যুত্তর করো। ফলে তোমার সাথে এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা রয়েছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়। ধৈর্যশীল ব্যতিরেকে কেউ তা করতে সক্ষম হয় না এবং ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা লাভ করতে পারবে না।' {সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৪-৩৫}

৪. সিয়াম পালনকারীর জন্য কিয়ামতের দিন সিয়াম সুপারিশ করবে:

আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، قَالَ: «فَيُشَفَّعَانِ»

‘সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে পানাহার ও যৌনাচার হতে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি রাতের ঘুম থেকে তাকে বিরত রেখেছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।’[11]

- **প্রিয় ভাইয়েরা!** সিয়ামের উল্লেখিত ফযীলত ওই সকল ব্যক্তির জন্য, যারা গুরুত্বসহ এবং আদবের সঙ্গে সিয়াম পালন করে। নিজেদের সিয়ামকে নিখুঁত রাখতে এবং তার বিধিবিধান পালনে চেষ্টা করুন আর আপনারা নিজেদের সাওমে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করুন।

[১১] আহমাদ: ৬৬২৬।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সিয়াম সংরক্ষণ করুন, সিয়ামকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করুন এবং আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা ও মুসলিম উম্মাহকে ক্ষমা করুন।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম প্রদান করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর।

তৃতীয় আসর

সিয়ামের বিধান

সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য যিনি দান করলে আটকানোর কেউ নেই এবং যিনি নিয়ে নিলে দান করার মতো কেউ নেই, শ্রমদাতাদের জন্য তাঁর আনুগত্য শ্রেষ্ঠ কামাই, তাকওয়া অর্জনকারীদের জন্য তাঁর তাকওয়া সর্বোচ্চ বংশপদবী। তিনি নিজ বন্ধুদের অন্তরসমূহকে ঈমানের জন্য প্রস্তুত ও তাতে তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তাদের জন্য তাঁর আনুগত্যের পথে যাবতীয় ক্লান্তিকে সহজ করে দিয়েছেন; ফলে তাঁর সেবার পথে তারা ন্যূনতম শ্রান্তিবোধ করে না। হতভাগারা যখন বক্রপথ অনুসরণ করেছে তখন তিনি তাদের জন্য দুর্ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন, ফলে তারা নিপতিত হয়েছে নিশ্চিত ধ্বংসের চোরাবালিতে। তারা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার সাথে কুফরী করেছে ফলে তিনি তাদের দগ্ধ করেছেন লেলিহান আগুনে। আমি প্রশংসা করি তাঁর, তিনি যা আমাদের দান করেছেন এবং অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য।

আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে একমাত্র তিনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই; তাঁর কোনো অংশীদার নেই, বাহিনীসমূহকে পরাজিত করেছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করি যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন।

দরূদ বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, তাঁর সঙ্গী আবূ বকর সিদ্দীকের ওপর যিনি মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন, উমরের ওপর যাকে দেখে শয়তান ভেগে যায় এবং পলায়ন করে, উসমানের ওপর যিনি দুই নূরের অধিকারী (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেরপর এক দুই মেয়ের জামাতা) শ্রেষ্ঠ আল্লাহভীরু ও উৎকৃষ্ট বংশীয় ব্যক্তি, আলীর ওপর যিনি তাঁর জামাই এবং বংশগত দিক থেকে চাচাতো ভাই এবং তাঁর অবশিষ্ট সব সাহাবীর ওপর যারা দীনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গর্ব ও অর্জন কামাই করেছেন আর সকল তাবেঈ-অনুসারীর ওপর যারা তাঁদের সর্বোত্তম অনুসরণ করে পূর্ব-পশ্চিমকে আলোকিত করেছেন। অনুরূপ যথাযথ সালামও বর্ষণ করুন।

- **আমার ভাইয়েরা!** নিশ্চয় রমযানের সিয়াম ইসলামের অন্যতম রুকন ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٣، ١٨٥]

‘হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-

মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।' {সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত: ১৮৩-১৮৫}

* হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমযানের সিয়াম পালন করা।'[12] বুখারী ও মুসলিম।

---

[১২] বুখারী: ৮; মুসলিম: ১৬।

মুসলিমে ‘রমযানের রোযা রাখা’ এরপর ‘বাইতুল্লায় হজ করা’ এভাবে এসেছে।

- রমযানের সিয়ামের ব্যাপারে সকল **মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন** যে, এটা ফরয। এটা ইসলামে স্পষ্টত অকাট্য ইজমা।

সুতরাং যে ব্যক্তি সিয়াম ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তখন তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে, সিয়ামের ফরযিয়্যাত স্বীকার করে তবে ভালো কথা অন্যথায় কাফির ও মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হবে। তাকে মৃত্যুর পর গোসল দেয়া হবে না এবং কাফন পরানো হবে না, তার নামাযে জানাযা পড়া হবে না এবং তার জন্য রহমতের দো‘আ করা হবে না। তাকে মুসলিমদের করবস্থানে দাফন করা হবে না। কেবল দূরবর্তী কোনো স্থানে তার জন্য কবর খনন করা হবে এবং দাফন করা হবে, যাতে মানুষ তার গলিত লাশের দুর্গন্ধে কষ্ট না পায় এবং তাকে দেখে তার পরিবার পরিজনও যেন দুঃখ না পায়।

○ রমযানের সিয়াম দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর রমযানের সিয়াম পালন করেছেন।

- **সিয়াম ফরয হয়েছে দুটি পর্যায়ে:**

প্রথম পর্যায়: প্রথমে সিয়াম পালন কিংবা খাদ্য গ্রহণ উভয়ের অনুমতি ছিল। তবে সিয়াম পালন উত্তম ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়: পরে সিয়াম পালন বাধ্যতামূলক করা হয়।

* বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে, সালমা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন এ আয়াত নাযিল হল:

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

'আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪} তখন যার ইচ্ছা সে সিয়াম ভঙ্গ করে ফিদয়া প্রদান করত। কিন্তু যখন পরবর্তী আয়াত নাযিল হল, তখন তা রহিত হয়ে গেল[13]।

অর্থাৎ নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেল। আয়াতটি এই:

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة: ١٨٥]

---

[১৩] বুখারী, ৪৫০৭; মুসলিম, ১১৪৫।

‘সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫} এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা সিয়াম পালনকে বাধ্যতামূলক করে অবকাশ রহিত করে দেন।

- আর সিয়াম ততক্ষণ **ফরয হবে না,** যতক্ষণ রমযান মাস প্রমাণিত না হয়। তাই মাস শুরু হওয়ার আগেই সাওম শুরু করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ»

‘তোমাদের কেউ যেন রমযানের আগের এক বা দুই দিন সিয়াম পালন না করে, তবে পূর্ব থেকে কারো সিয়াম পালনের অভ্যাস থাকলে, সে ওই সিয়াম পালন করতে পারবে।’[14]

○ **দু’টি বিষয়ের কোনো একটি ঘটলে রমযানের আগমন বুঝা যাবে:**

প্রথম বিষয়: নতুন চাঁদ দেখা গেলে।

- যেমন আল্লাহর বাণী:

---

[১৪] বুখারী: ১৯১৪; অনুরূপ মুসলিম: ১০৮২।

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

‘সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}

- হাদীসে রয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا»

‘যখন তোমরা রমযানের চাঁদ দেখবে, তখন সিয়াম পালন করবে।’[15]

- তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য চাঁদ দেখা শর্ত নয়; বরং একজন নির্ভরযোগ্য পুরুষ সাক্ষ্য দিলে সকলের ওপর সিয়াম পালন জরুরী হবে।
- **চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হলো:**

সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান, মুসলিম, দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন এবং তার আমানতদারীতার কারণে বিশ্বস্ত হতে হবে তথা তার সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে।

- অতএব, নাবালেগের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ সে বিশ্বস্ত নয়।
- আর পাগলের সাক্ষ্যও নাবালেগের মত গ্রহণযোগ্য নয়।

---

১৫ বুখারী: ১৯০৫; মুসলিম: ১০৮১।

- কাফিরের সাক্ষ্য দ্বারাও মাহে রমযান সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হবে না।

- কারণ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا»

‘ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এসে বলল, নিশ্চয়ই আমি (রমযানের) চাঁদ দেখেছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বেলাল! তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও, লোকেরা যেন আগামীকাল সিয়াম পালন করে।’[16]

- আর যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রসিদ্ধ কিংবা অধিক

[১৬] তিরমিযী: ৬৯১; আবূ দাউদ: ২৩৪০; ইবন মাজাহ: ১৬৫২। তবে শায়খ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন৷ দেখুন: ইরওয়াউল গালীল: ৯০৭৷

তাড়াহুড়া করে এমন কিংবা দৃষ্টিশক্তি এমন দুর্বল ও ক্ষীণ যে তার দ্বারা চাঁদ দেখা অসম্ভব, এ ধরনের ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। তাদের দ্বারা মাহে রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। কারণ তাদের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে অথবা মিথ্যার দিকটাই অধিক প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক।

- **বিশ্বস্ত একজনের সাক্ষ্য দ্বারাই রমযান মাস প্রবেশ করা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হবে।** যেমন আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ «فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ»

"লোকেরা চাঁদ দেখল, পরক্ষণে আমি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে তিনি সিয়াম পালন করলেন এবং লোকদের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন।'[17]

○ আর যে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে চাঁদ দেখে, তার উচিৎ প্রশাসনকে অবহিত করা।

---

[১৭] দারেমী: ১৭৩৩; হাকিম: ১৫৪১। মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

○ এমনিভাবে যে শাওয়াল ও জিলহজের চাঁদ দেখবে, তারও উচিৎ প্রশাসনকে অবহিত করা। কারণ এর সাথে সাওম, ফিতর ও হজ এর ফরয আদায় হওয়া নির্ভরশীল। আর "যা না হলে ফরয আদায় করা সম্ভব হয় না তাও ফরয হিসেবে বিবেচিত"।

○ কোনো ব্যক্তি যদি একা এত দূরে চাঁদ দেখে যে, দূরত্বের কারণে তার পক্ষে প্রশাসনের কাছে সংবাদ পৌঁছানো সম্ভ্রম না হয়। তাহলে সে নিজে সিয়াম পালন করবে এবং প্রশাসনের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

○ যখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে রেডিও বা এ জাতীয় কিছুর মাধ্যমে চাঁদ দেখার ঘোষণা প্রদান করা হয়, রামযান মাস আগমনের জন্য বা রমযান মাস শেষ হওয়ার ব্যাপারে সেটা অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। কারণ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসা শরীয়তের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে যার উপর আমল করা ফরয।

এ জন্যই যখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রমযান মাস প্রবেশ করার বিষয়টি সাব্যস্ত হলো তখন তিনি বেলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে মাস সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন; যাতে তারা সাওম পালন করে। আর তিনি সে ঘোষণাকে তাদের জন্য সাওম পালনের বাধ্যকারী বিধান হিসেবে গণ্য করলেন।

* তাই শরয়ী পদ্ধতি অনুযায়ী চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সেটাই ধর্তব্য হবে, চন্দ্রের বিবিধ উদয়াস্থলের বিষয়টি ধর্তব্য হবে না, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম রাখার বিধানটি চাঁদ দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, চাঁদের বিবিধ উদয়াস্থলের সাথে সম্পৃক্ত করেন নি। তিনি বলেন:

«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا »

'যখন তোমরা (রামযানের) চাঁদ দেখ, তখন সিয়াম পালন কর এবং যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখ, তখন সিয়াম ভঙ্গ কর।'[18]

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

« وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا»

'যদি দু'জন মুসলিম (চাঁদ দেখে) সাক্ষ্য দেয়, তখন সিয়াম পালন কর এবং ভঙ্গ কর।'[19]

দ্বিতীয় বিষয়: রমযান তথা নতুন মাস সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, আগের মাসকে ৩০ দিন পূর্ণ করা।

---

[১৮] বুখারী: ১৯০০; মুসলিম: ১০৮০।

[১৯] আহমদ ৪/৩২১, নং ১৮৮৯৫; নাসাঈ ১/৩০০-৩০১।

কেননা চান্দ্র মাস কখনো ত্রিশদিনের বেশি বা ২৯ দিনের কম হতে পারে না। আরবী মাস কখনো কখনো ধারাবাহিকভাবে দু’মাস, তিনমাস অথবা চারমাস পর্যন্ত ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে। আবার কখনো দু’মাস, তিনমাস অথবা চারমাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ঊনত্রিশ দিনের হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণত এক মাস, দু মাস পূর্ণ ত্রিশ দিন হলেও তৃতীয় মাস কম অর্থাৎ ঊনত্রিশ দিনের হয়ে থাকে।

সুতরাং কোনো মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ হলে, শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী পরবর্তী মাসটি এসে গেছে বলে গণ্য হবে। যদিও চাঁদ দেখা না যায়।

* কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি বলেন:

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»

‘তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করা এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তখন ওই মাস ত্রিশ দিন হিসাবে গণনা কর।’[20]

[২০] মুসলিম: ১০৮১।

* ইমাম বুখারীর শব্দ হচ্ছে,

« فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»

‘চাঁদ যদি অজ্ঞাত থাকে, তাহলে শাবান মাসটি ত্রিশদিন পূর্ণ কর।’[21]

* সহীহ ইবনে খুযাইমা গ্রন্থে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ»

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসকে যত বেশি হিসাব করতেন, অন্য মাসকে তত বেশি হিসাব করতেন না। এরপর তিনি চাঁদ দেখে রমযানের সিয়াম পালন করতেন। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবান মাসকে ত্রিশ দিন হিসাব করে সিয়াম পালন করতেন।’[22]

এসব হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নতুন চাঁদ দেখার পূর্বে সিয়াম পালন শুরু করা যাবে না, অতঃপর যদি চাঁদ দেখা না

---

২১ বুখারী: ১৯০৯।

২২ ইবন খুযাইমা: ১/২০৩; আবূ দাউদ: ২৩২৫; দারা কুতনী ২/১৫৬।

যায় তবে শাবান মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে। অবশ্য শাবানের সে ত্রিশতম দিনটিতে কোনোভাবেই সাওম রাখা যাবে না, চাই রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকুক বা মেঘাচ্ছন্ন। কারণ:

* আম্মার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

'যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন সিয়াম পালন করল, সে আবূল কাসেম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করল।'[23]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়াত অনুসরণের তাওফীক দান করুন এবং ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যের উপকরণ-উপায়াদি থেকে দূরে রাখুন। আমাদের এ রমযান মাসকে আমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতময় করুন। আর এ মাসে আমাদের আপনার আনুগত্য করার তাওফীক দিন এবং আপনার অবাধ্যতার পথ থেকে

---

[২৩] আবূদাউদ: ২৩৩৪; তিরমিযী: ৬৮৬; নাসায়ী: ২১৮৮; আর বুখারী মু'আল্লাকসূত্রে বর্ণনা করেছেন ৪/১১৯ ফাতহুল বারীসহ।

দূরে রাখুন। হে রাহমানুর রাহীম! অনুগ্রহ করে আমাদের, আমাদের মাতা-পিতা ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ! সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁদের সুন্দরভাবে অনুসরণকারীদের ওপর।

চতুর্থ আসর

রমযানে কিয়ামুল লাইলের বিধান

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিজ দয়ায় সামনে অগ্রসরমান পাগুলোকে সাহায্য করেন, আপন করুণায় ধ্বংসপ্রায় জীবনগুলোকে উদ্ধার করেন এবং যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাকে সহজতর পথ জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন, ফলে তাকে আখিরাতের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। আমি তাঁর স্তুতি গাই তাবৎ সুস্বাদ ও বিস্বাদ বিষয়ের জন্য।

আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে একমাত্র তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী; প্রতিটি অন্তরই (তাঁর সামনে) লাঞ্ছিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। আর আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে আপন রবের নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষিত করুন তাঁর ওপর, তাঁর সাথী আবূ বকরের ওপর যাকে ভ্রান্তগোষ্ঠী তাতিয়ে দিয়েছিল, উমরের ওপর যার আত্মা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করত নিজেকে,

উসমানের ওপর অঢেল অর্থ খরচকারী, আলীর ওপর যিনি ঘন সেনাবাহিনীর সাথে লড়াইয়েও প্রকৃত বীর কাকে বলে চিনিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট সব সাহাবীর ওপর আর তাদের সুন্দর অনুসারীদের উপর, সামনে ধাবমান পায়ের পদধ্বনি চলমান থাকা পর্যন্ত।

○ **আমার ভাইয়েরা,** আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইবাদত প্রবর্তন করেছেন, তারা যাতে বিভিন্ন ইবাদত করে সে অনুযায়ী নেকী অর্জন করতে পারে। যাতে করে এক প্রকারের ইবাদতে বিরক্তি বোধ করে অন্য আমল ছেড়ে হতভাগ্য না হয়। এসব ইবাদতের মধ্যে কিছু রয়েছে **ফরয** যাতে কোনো প্রকার কমতি বা ত্রুটি করা যাবে না। আবার কিছু রয়েছে **নফল** যা ফরযে পরিপূর্ণতা ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক।

* **এসব ইবাদতের মধ্যে অন্যতম হলো** সালাত। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যা কার্যত পাঁচ হলেও মীযানের পাল্লায় পঞ্চাশ। আল্লাহ তা'আলা নফল সালাতকে ফরয সালাতের ক্ষতিপূরণ এবং তার নৈকট্য লাভের মাধ্যম স্থির করেছেন।

○ **এসব নফল সালাতের অন্যতম হচ্ছে:**

- **কিছু সুন্নাত সালাত, যা ফরয সালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।** যেমন, ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দু'রাকাত, যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত। মাগরিবের ফরযের পর দু'রাকাত ও এশার ফরযের পর দু'রাকাত।
- আর এসব (ফরয ছাড়া অন্যসব) নফল সালাতের অন্যতম হলো **সালাতুল লাইল (রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ)**

* যা আদায়কারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا ٦٤ ﴾ [الفرقان: 64]

'আর যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দণ্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে।' {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৩}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ١٦ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧ ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧]

'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। অতঃপর কোনো ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস

লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময়স্বরূপ।' {সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৬-১৭}

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»

'ফরয সালাতের পর অধিক ফযীলতপূর্ণ হল রাতের সালাত।'[24]

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»

'হে লোক সকল! সালামের প্রসার ঘটাও, গরীব-দুঃখীদের খাদ্য দান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ, রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন সালাত আদায় কত, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[25]

---

[২৪] মুসলিম: ১১৬৫।

[২৫] আহমাদ ৫/৪১৫; তিরমিযী ২৪৫৮; হাকিম: ৩/১৩, ৪/১৬০; এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন আর যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

- **সালাতুল বিতর;** যা সালাতুল লাইল তা রাত্রির সালাতের একটি অংশ। যার সর্বনিম্ন পরিমাণ এক রাকাত। আর সর্বোচ্চ এগারো রাকাত।

○ অতএব কেবল **এক রাকাত** বিতরও পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

‘যে বিতর সালাত এক রাকাত আদায় করতে যায়, সে যেন এক রাকাত আদায় করে।’[26]

○ বিতর সালাত **তিন রাকাতও** পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ »

‘যে তিন রাকাত বিতর পড়তে চায় সে যেন তিন রাকাত পড়ে।’[27]

তবে কেউ যদি এক সালামে বিতর সালাত শেষ করতে চায়, তাও পারবে। কারণ;

* ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন:

---

[২৬] আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২।

[২৭] আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২।

أَنَّ عُمر بنَ الخطاب رضي الله عنه أوتر بِثَلَاثَ رَكَعَاتٍ , لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

'উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তিন রাকাত বিতর পড়েছেন ও সর্বশেষে সালাম ফিরিয়েছেন।'[28]

অবশ্য কেউ যদি দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাত পড়তে চায়, তবে তাও পারবে। কেননা;

* বুখারী নাফে' থেকে বর্ণনা করেন:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা তিন রাকাত বিতর সালাতের দু'রাকাত আদায়ের পর সালাম ফিরিয়েছেন। এমনকি তিনি প্রয়োজনে কোনো নির্দেশও দিতেন।'[29]

○ তেমনি **পাঁচ রাকাত** বিতর সালাতও আদায় করা যায়, তবে এসব রাকাত একত্রে আদায় করবে, সর্বশেষ বৈঠকেই শুধু বসতে হবে এবং সালাম ফিরানো যাবে।

* কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[২৮] ত্বহাবী: ১৭৪২।

[২৯] বুখারী: ৯৯১।

« فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ»

‘যে বিতর পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায়, সে যেন পাঁচ রাকাত আদায় করে।’[30]

* অনুরূপভাবে ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا»
.

‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তেরো রাকাত সালাত আদায় করতেন; তন্মধ্য হতে পাঁচ রাকাত বিতর আদায় করতেন, যার শেষেই শুধু তিনি বৈঠক করতেন।’[31]

○ তেমনি পাঁচ রাকাতের ন্যায় একত্রে **সাত রাকাত** বিতরও আদায় করা যাবে।

* যেমন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

---

৩০ আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২।

৩১ মুসলিম: ৭৩৭।

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ»

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও সাত রাকাত আবার কখনও পাঁচ রাকাত বিতর সালাত আদায় করতেন। তাতে সালাম-কালামের মাধ্যমে বিরতি দিতেন না।’[32]

○ তেমনি **নয় রাকাত** বিতরও একত্রে আদায় করা যাবে; তন্মধ্যে অষ্টম রাকাতে বসবে, সেখানে তাশাহহুদ ও দো‘আ পড়বে কিন্তু সালাম না ফিরিয়েই নবম রাকাতের জন্য দাঁড়াবে, তারপর নবম রাকাত পড়ার পর বসে তাশাহহুদ ও দো‘আ করে সালাম ফিরাবে।

* যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীসে রয়েছে:

«وَكان يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا»

‘তিনি নয় রাকাত সালাত আদায় করতেন, অষ্টম রাকাতে বসতেন এবং আল্লাহর যিকির, প্রশংসা ও দো‘আ করতেন তথা তাশাহহুদ পড়তেন। অতঃপর উঠতেন এবং সালাম না ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। এরপর নবম রাকাত আদায়

---

৩২ আহমদ: ৬/৩২১, নং ২৬৪৮৬; নাসায়ী: ১৭১৫; ইবনে মাজাহ্ ১১৯২।

করতেন, এরপর বসতেন এবং আল্লাহর যিকির, প্রশংসা ও দো‘আ তথা তাশাহহুদ পড়ে আমাদের শুনিয়ে সালাম ফেরাতেন।’[33]

○ অনুরূপভাবে **এগার রাকাত** সালাতও আদায় করা যাবে। এমতাবস্থায় ইচ্ছা করলে প্রতি দু’রাকাতে সালাম ফিরানো যাবে আর সবশেষে এক রাকাতের মাধ্যমে বিতর আদায় করা যাবে।

* যেমন ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ »

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশা ও ফজরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এগার রাকাত সালাত আদায় করতেন, যার প্রতি দু’রাকাতে সালাম ফিরাতেন। তিনি সর্বশেষে এক রাকাতের মাধ্যমে বিতর আদায় করতেন।’[34]

---

[৩৩] মুসলিম: ৭৪৬; আহমদ: ৬/৯১, ১৬৩।

[৩৪] মুসলিম: ৭৩৬; আবু দাউদ: ১৩৩৬; নাসাঈ ২/৩০; আহমদ: ৬/২১৫, ২৪৮।

অথবা ইচ্ছা করলে প্রথমে চার রাকাত, তারপর চার রাকাত আদায় করতেন এবং শেষে তিন রাকাত সালাত আদায় করতেন। কারণ:

* 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا»

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত সালাত আদায় করতেন, তা কত সুন্দর ও দীর্ঘ করতেন, তা কত সুন্দর ও দীর্ঘ ছিল, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। তারপর পুনরায় চার রাকাত সালাত আদায় করতেন, তা কত সুন্দর ও দীর্ঘ করতেন, তা কত সুন্দর ও দীর্ঘ ছিল, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকাত সালাত আদায় করতেন।'[35]

* হাম্বলী ও শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, এক তাশাহহুদে এগার রাকাত বিতর অথবা দু' তাশাহহুদে বিতর আদায় করা জায়েয,

---

[৩৫] বুখারী: ৩৫৬৯; মুসলিম: ৭৩৮।

যার শেষ তাশাহহুদের পূর্বের রাকাতেও একটি তাশাহহুদ হবে।

○ তবে রমযানে সালাতুল লাইলের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

'যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সঙ্গে ও ছাওয়াবের আশায় রাত জেগে সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[36]

এখানে 'ঈমানের সঙ্গে' অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে এবং তার পক্ষ হতে যে সাওয়াব রাখা হয়েছে তাতে বিশ্বাস রেখে।

আর 'ছাওয়াবের আশায়' অর্থাৎ কেবল নেকীর আশায় করা হবে, লোক দেখানো, সুনাম অর্জন, সম্পদ বা সম্মান লাভের আশায় না হওয়া।

---

[৩৬] বুখারী: ৩৭; মুসলিম: ৭৫৯

বস্তুত ‘কিয়ামে রমযান’ এটি রমযানের রাত্রিতে সালাতে দাঁড়ানোকে বুঝায়; চাই সেটা প্রথম রাতে হোক বা শেষ রাতে। সুতরাং বুঝা গেল যে,

○ তারাবীর সালাতও ক্বিয়ামে রমযানের অন্তর্ভুক্ত। তাই উচিত হলো, তারাবীর সালাতকে গুরুত্ব দেয়া এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা ও আগ্রহ প্রকাশ করা। এ সালাতুত্ তারাবীহ তো হাতেগোনা কয়েকটি রাত্রি মাত্র। সুযোগ চলে যাওয়ার পূর্বেই বুদ্ধিমান ঈমানদার ব্যক্তি এ সুযোগ গ্রহণ করবে।

○ তারাবীহ শব্দের অর্থ বিশ্রাম করা। তারাবীহকে এজন্য তারাবীহ বলা হয়; কারণ লোকেরা এ সালাত বহু দীর্ঘায়িত করে আদায় করত। তাই যখনই চার রাকাত সালাত শেষ করত তখনই তারা একটু আরাম বা বিশ্রাম করে নিত।

○ সর্বপ্রথম আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (নববীতে) তারাবীহর সালাত সুন্নত হিসেবে চালু করেন। তারপর উম্মতের ওপর ফরয হয়ে যাবার আশংকায় তিনি এ সালাত ছেড়ে দেন।

* বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ

الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ»

‘আম্মুল মু’মিনীন ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক রাতে মসজিদে সালাত আদায় করলেন, লোকজনও তার সঙ্গে সালাত আদায় করল। পরবর্তী রাতেও তিনি সালাত আদায় করলেন, তাতে লোকজন আরো বৃদ্ধি পেল। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাতে অনেক লোকের সমাগম হল। কিন্তু সে রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হলেন না। সকালে তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ, তা আমি দেখেছি। কিন্তু তোমাদের ওপর এ সালাত ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি উপস্থিত হইনি। ‘বর্ণনাকারী বলেন, ঘটনাটি রমযান মাসে ঘটেছিল।’[37]

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا، حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الخَامِسَةِ، حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ

---

[৩৭] বুখারী: ১১২৯; মুসলিম: ৭৬১।

اللَّيْلِ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»

'আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সিয়াম পালন করছিলাম। (এর মধ্যে) রমযানের সাতদিন বাকি থাকার পূর্ব পর্যন্ত (প্রথম ২৩ দিন) তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন নি। বাকি সাতদিনের প্রথম রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর ষষ্ঠ রাতে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন না। পঞ্চম রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত পুনরায় আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি রাতে যদি আমাদের নিয়ে নফল সালাত আদায় করতেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সালাত আদায় করবে, তার আমলনামায় সারারাত সালাত আদায়ের সাওয়াব লেখা হবে।'[38]

- **বিতর সালাতসহ তারাবীর সংখ্যা কত হয় তা নিয়ে সালফে সালিহীনের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।**

---

[৩৮] তিরমিযী: ৮০৬; ইবন মাজাহ্: ১৩৭৫; চার সুনান কিতাবেই সহীহ সনদে সংকলিত হয়েছে।

কেউ বলেন ৪১ রাকাত, কেউ ৩৯ রাকাত, কেউ ২৯, কেউ ২৩, আবার কেউ ১৩, এবং কেউ বলেন ১১ রাকাত। **এসব মতামতের মধ্যে ১১ অথবা ১৩ রাকাতের মতামত অগ্রগণ্য।**

* কারণ, 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তাকে প্রশ্ন করা হল, রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত কেমন (কত রাকাত) ছিল? তিনি বললেন,

«مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً »

'রমযান এবং রমযানের বাইরে ১১ রাকাতের বেশি ছিল না।'[39]

* অনুরূপ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» يَعْنِي من اللَّيْلِ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত ১৩ রাকাত ছিল।' অর্থাৎ রাতে[40]।

---

৩৯ বুখারী: ১১৪৭; মুসলিম: ৭৩৮।

৪০ বুখারী: ১১৩৮।

* অনুরূপ মুওয়াত্তায় সায়েব ইবন ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উবাই ইবন কা'আব ও তামীমুদ্দারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে লোকদের **১১** রাকাত সালাত পড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।'[41]

- **সালাফে সালেহীন তথা নেককার পূর্বসুরীরা তারাবীহ খুব লম্বা কেরাতে আদায় করতেন।**

* যেমন সায়েব ইবন ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.

'ক্বারীগণ শত শত আয়াত পড়তেন। এমনকি আমরা দীর্ঘ রাকাতের কারণে লাঠির ওপর ভর দিয়ে সালাত আদায় করতাম।'[42]

---

৪১ মুয়াত্তা মালেক: ১/১৩৬, ১৩৭।

৪২ পূর্ববর্তী হাদীসের অংশ।

কিন্তু আজকের দিনের মানুষ এর বিপরীত করে। তারা অনেক দ্রুতগতিতে তারাবীহ সালাত আদায় করে; যার ফলে শান্তি ও ধীর-স্থিরতার সাথে সালাত আদায় করা যায় না। অথচ ধীর-স্থিরতা ও শান্তির সাথে সালাত আদায় করা সালাতের রোকনসমূহের একটি; যা ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হয় না।

তারা এ গুরুত্বপূর্ণ রোকনটিকে নষ্ট করে এবং তারা তাদের পিছনের দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ বয়সী মুসল্লিদের কষ্ট দেয়। এতে নিজেদের উপর যুলুম করে এবং অন্যদের উপরও যুলুম করে থাকে।

উলামায়ে কেরাম রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, মুকতাদীগণ নামাযের সুন্নত আদায় করতে পারে না এমন দ্রুতগতিতে ইমামের সালাত পড়ানো মাকরূহ। তাহলে ওয়াজিব তরক করতে বাধ্য হয় এমন দ্রুততা অবলম্বন করলে কিরূপ হবে!? আমরা আল্লাহর কাছে এরূপ কাজ থেকে আশ্রয় চাই।

- **পুরুষদের জন্য তারাবীহর সালাতের জামাত উপেক্ষা করা উচিৎ নয়।** যতক্ষণ ইমাম তারাবীহ ও বিতর শেষ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রস্থান করবে না; যাতে সারারাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যায়।

○ যদি মহিলাদের দ্বারা বা মহিলাদের জন্য ফেৎনার আশংকা না থাকে, তাহলে মসজিদে **তারাবীহর জামাতে মহিলাদের উপস্থিত হওয়া জায়েয।**

* কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»

‘তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (নারীদের) মসজিদে আসতে বাধা দিও না।’[43]

* তাছাড়া এটা সালাফে সালিহীনের আমলও বটে। তবে শর্ত হলো: পর্দার সঙ্গে আসতে হবে। খোলামেলা, সুগন্ধি ব্যবহার করে, উচ্চ আওয়াজ করে এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন করে আসা বৈধ নয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاۖ ﴾ [النور: ٣١]

‘আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১}

[৪৩] বুখারী: ৯০০; মুসলিম: ৪৪২। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত।

অর্থাৎ বোরকা, লম্বা চাদর বা এ জাতীয় পোশাক ব্যবহারের পরও যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তা লুকানো বা আবৃত করা সম্ভবও নয়।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের ঈদের সালাতে অনুমতি দিলে উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»

'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারও কারও তো বোরকা নেই। (তাহলে সে কী করবে?) তিনি বললেন, 'তার কোনো বোন তাকে নিজ বোরকাসমূহ থেকে একটি বোরকা পরাবে।'[44]

○ **নারীদের জন্য সুন্নত হলো:** তারা পুরুষদের পেছনে কাতার বাঁধবে এবং তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করবে। সর্বশেষ কাতারগুলোয় দাঁড়াবে। কারণ তাদের বেলায় উত্তম কাতারের বিবেচনা পুরুষদের উল্টো।

---

[88] বুখারী: ৩৫১; মুসলিম: ৮৯০।

* কারণ, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»

‘পুরুষদের জন্য উত্তম হল প্রথম কাতার এবং মন্দ হল পেছনের কাতার। আর নারীদের জন্য উত্তম হল পেছনের কাতার এবং মন্দ হল প্রথম কাতার।’[45]

○ নারীগণ ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই ঘরে ফিরে যাবে। ওযর ছাড়া বিলম্ব করবে না।

* কারণ, উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ» ، قَالَ: نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন, তখন সালাম শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে নারীগণ দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি দাঁড়ানোর পূর্বে সামান্য কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। বর্ণনাকারী ইবন শিহাব যুহরী বলেন, আমার মনে

---

[৪৫] মুসলিম: ৪৪০।

হয় (আল্লাহই ভালো জানেন) সেটা এজন্য করতেন, যাতে নারীরা পুরুষদের বের হওয়ার পূর্বে ফিরে যেতে পারে।’[46]

হে আল্লাহ! ঐ সকল (পূর্ববর্তী) লোকদের যেভাবে আমল করার তাওফীক দিয়েছেন তেমনিভাবে আমাদেরও আমল করার তাওফীক দিন। হে দয়াময় প্রভু! আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন। দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীর ওপর।

---

[৪৬] বুখারী: ৮৭০।

পঞ্চম আসর

কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর দরজার দিকে আহ্বান করেন, যাকে চান তিনি সঠিক পথের দিশা দেন, নিজের কিতাব নাযিলের মধ্য দিয়ে যিনি নেয়ামতধন্য করেন, যে কিতাব 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবিহ' সংবলিত, ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা তারা মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম। আমি তাঁর প্রশংসা করি এ জন্য যে তিনি আমাকে সুপথের সন্ধান দিয়েছেন এবং এর উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করেছেন।

আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, এমন সাক্ষ্য দিচ্ছি যা দ্বারা আমি তাঁর শাস্তি থেকে নাজাত প্রত্যাশা করি, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি পৃথিবীতে আগমন ও পৃথিবী থেকে গমনকালে কার্যক্ষেত্রে ছিলেন সবচে পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

দরূদ বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, গারে হেরায় তার পরম সঙ্গী শ্রেষ্ঠ সাহাবী আবূ বকরের ওপর, উমরের ওপর যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দীনকে সম্মানিত করেছেন এবং দুনিয়াকে তার দ্বারা অবিচল রেখেছেন, উসমানের ওপর যিনি নিজ বাসায় ও নিজ মিহরাবে শহীদ হয়েছেন, আলীর ওপর যিনি ইলমী বিষয়ের জটিলতা নিরসন ও অপ্রকাশ্য গূঢ় বিষয় উন্মোচনকারী, আর নবীর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর যারা তাঁর প্রিয়জন ছিলেন। আর তাঁর উপর যথাযথ সালাম প্রদান করুন।

○ **আমার ভাইয়েরা!**

* আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩ لِيُوَفِّيَهُمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ غَفُورٞ شَكُورٞ ٣٠﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠]

'যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার, যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা, কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ

অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’ {সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ২৯-৩০}

- **আল্লাহর কিতাবের তিলাওয়াত দু’প্রকার।** যথা-

১। প্রথম প্রকার: হুকমী তিলাওয়াত। এটা হলো আল্লাহর কথাকে বিশ্বাস করা, তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়ে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বর্জন করে কিতাব তথা আল কুরআনের সকল হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে অন্য আসরে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

২। দ্বিতীয় প্রকার: শাব্দিক তিলাওয়াত। এটা হলো আল কুরআন পাঠ করা। এর ফযীলতের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ হতে অনেক দলীল প্রমাণ রয়েছে। ফযীলত হয়তো পুরা কুরআনের ব্যাপারে আবার হয়তো নির্দিষ্ট কোনো সূরার ব্যাপারে রয়েছে আবার কখনো হয়তো নির্দিষ্ট কোনো আয়াতের ব্যাপারে রয়েছে।

* যেমন বুখারী ও মুসলিমে উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন এবং অন্যকে শিক্ষা দেন।”[47]

* বুখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ».

“আল-কুরআনে দক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সম্মানিত পুণ্যবান ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন। যে ব্যক্তি কুরআন আটকে আটকে তিলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দু’টি প্রতিদান রয়েছে।”[48]

দুটি প্রতিদানের প্রথমটি হলো: তিলাওয়াতের, দ্বিতীয়টি হলো: পাঠকারীর কষ্টের।

---

[৪৭] বুখারী: ৫০২৭।

[৪৮] বুখারী: ৪৯৩৭; মুসলিম: ৭৯৮।

* অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিমে আবু মূসা আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، »

“যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত কমলালেবুর মত, যা সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায় যার কোনো ঘ্রাণ নেই কিন্তু তার স্বাদ মিষ্টি।”[49]

* তাছাড়া সহীহ মুসলিমে আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» .

“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কুরআন কিয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।”[50]

---

৪৯ বুখারী: ৫৪২৭; মুসলিম: ২৪৩।

৫০ মুসলিম: ৮০৪।

* অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে উকবা ইবন ‘আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ»

“তোমাদের কেউ কি এরূপ করতে পার না যে, সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে দুটো আয়াত জানবে অথবা পড়বে; এটা তার জন্য দু’টো উষ্ট্রীর তুলনায় উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উষ্ট্রী থেকে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উষ্ট্রী থেকে উত্তম। আর (শুধু উষ্ট্রীই নয়, বরং একইসাথে) সমসংখ্যক উট লাভ করা থেকেও তা উত্তম হবে।”[51]

* তদ্রূপ সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[৫১] মুসলিম: ৮০৩।

«مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»

"যখন আল্লাহর কোনো ঘরে (মসজিদে) লোকজন একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মাঝে তা অধ্যয়ণ করে, তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে, ফেরেশতাগণ তাদের বেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ তাঁর কাছে অবস্থিত ফেরেশতাদের কাছে তাদের আলোচনা করেন।"[52]

* তাছাড়া আরো এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا» .

"তোমরা কুরআনের যথাযথ যত্ন নাও, তা হিফাযত ও সংরক্ষণ কর। ওই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, অবশ্যই উট তার রশি থেকে যেমন দ্রুত পালিয়ে যায় তার চেয়েও আরো তীব্র বেগে এ কুরআন চলে যায়। (অর্থাৎ কুরআনের

[৫২] মুসলিম: ২৬৯৯; আবু দাউদ, ১৪৫৫।

প্রতি যত্নবান না হলে কুরআন স্মৃতি থেকে দ্রুত চলে যাবে।)"[53]

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ»

"তোমাদের কেউ যেন না বলে আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।'[54]

হাদীসে نسيت 'আমি ভুলে গেছি' এ কথা বলবে না এজন্য যে, এতে করে কুরআন মুখস্থ করার পর গুরুত্বহীনতার কারণে ভুলে গেছে বুঝা যায়। তাই এভাবে বলা যাবে না।

* অনুরূপ আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ (অক্ষর) পাঠ করবে, তাকে একটি নেকী প্রদান করা হবে। আর প্রতিটি নেকী দশগুণ বৃদ্ধি

---

[৫৩] বুখারী: ৫০৩৩; মুসলিম: ৭৯১। অর্থাৎ একটু গাফেল ও কুরআনের প্রতি অযত্নবান হলে কুরআন মুখস্থ থেকে দ্রুত চলে যাবে।

[৫৪] মুসলিম: ৭৯০।

করা হবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ।”[55]

* আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَاقْبَلُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ، وَالنُّورُ الْمُبِينُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، لَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبَ، وَلَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ كُلَّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» .

‘নিশ্চয়ই এ কুরআন আল্লাহর দস্তরখান। তোমরা যথাসম্ভব তার দস্তরখান থেকে গ্রহণ কর। এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর মজবুত রশি, সুদীপ্ত জ্যোতি, উত্তম নিরাময়কারী, যে তা আঁকড়ে ধরবে তার জন্য কুরআন ত্রাতা, যে অনুসরণ করে তা তার জন্য নাজাত ও মুক্তির মাধ্যম। সে সত্য থেকে এমনভাবে বিচ্যুত হবে না যে তাকে ভর্ৎসনা করা হবে। সে বক্র পথে এমনভাবে যাবে না যে তাকে সোজা করতে হবে।

[৫৫] তিরমিযী: ২৯১০।

কুরআনের বিস্ময়ের শেষ নেই। অধিক পুনরাবৃত্তির কারণে তা পুরাতন হয় না (অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের পুনরাবৃত্তি হলেও তাতে নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ তার আবেদন চিরন্তন।) তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো, কারণ আল্লাহ তোমাদেরকে তিলাওয়াতকৃত প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকী দেবেন। জেনে রাখ, আমি বলি না আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি, লাম একটি, এবং মীম একটি হরফ।”[56]

- **আমার ভাইয়েরা!** এই হলো আল-কুরআন পাঠের ফযীলত। অল্প আমলে অধিক সাওয়াব, তবে তা শুধু সে লোকের জন্যই যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর পক্ষ থেকে সাওয়াব কামনা করে। সুতরাং প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত সেই ব্যক্তি যে কুরআনের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। আর সে লোকই তো ক্ষতিগ্রস্ত যে লাভ এমনভাবে হাতছাড়া হয়ে গেছে যে সে সেটাকে আর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই যে ফযীলতসমূহের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তার গোটা কুরআনকেই শামিল করে।

[৫৬] হাদীসটির সূত্র দুর্বল। যা হাকেম তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন, ১/৫৫৫, হাদীস নং ২০৪০। ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়, সম্ভবত এটি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর উক্তি। [আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়া: ১/১০১]

○ **আর কুরআনের সুনির্দিষ্ট সূরার ফযীলতের ব্যাপারেও অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।**

- **সেসবের মধ্যে সূরা ফাতেহা অন্যতম:**

* সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ ইবনুল মু'আল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন:

«لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ».

'অবশ্যই আমি তোমাকে কুরআনের বড় সূরাটি শেখাবো। সেটা হলো সূরা আল-ফাতেহা "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" এটাই 'সাব'উল মাসানী' (বা বারবার পঠিত ৭টি আয়াত) এবং মহা কুরআন যা আমাকে দেওয়া হয়েছে।"[57]

* সূরা ফাতিহার এ ফযীলতের কারণেই সালাতের মধ্যে এ সূরা পাঠ করা সালাতের রুকন হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে; যা ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

---

[৫৭] বুখারী: ৫০০৬।

‘সূরা ফাতিহা যে ব্যক্তি পড়ল না তার সালাতই পূর্ণ হবে না।’[58]

* আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ» يقولها ثَلَاثًا. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ...

“যে ব্যক্তি এমন কোনো সালাত পড়ল যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নি সেটা অসম্পূর্ণ।” কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তখন আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা ইমামের পেছনে থাকলে কী করবো? তিনি বললেন: তখন তা মনে মনে পাঠ করবে।’[59]

- **অনুরূপ সুনির্দিষ্ট সূরার মধ্যে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান অন্যতম।**

* নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ

---

[৫৮] বুখারী: ৭৫৬; মুসলিম: ৩৯৪।

[৫৯] মুসলিম: ৩৯৫।

طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»

“তোমরা যাহরাওয়াইন তথা পুষ্পদ্বয় পাঠ করো, তা হলো সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান। কারণ এ দুটো সূরা কিয়ামতের দিন দু’টি মেঘমালার ন্যায় অথবা দু’দল পাখির ঝাঁকের মতো সারিবদ্ধভাবে উড়বে এমতাবস্থায় যে, তারা তাদের পাঠকদের পক্ষ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করবে। (জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য অথবা জাহান্নামের ফিরিশতা যাবানিয়াদের সাথে)। তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো। কারণ তা গ্রহণ (করা বা মুখস্থ) করায় রয়েছে বরকত আর তা পরিত্যাগ করায় রয়েছে পরিতাপ। আর কোনো ‘বাতালা’ অর্থাৎ জাদুকর এটা অর্জন করতে পারে না।’[60]

* আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِنَّ البَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ البَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ»

---

[৬০] মুসলিম: ৮০৪।

‘যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সেখানে শয়তান প্রবেশ করে না।’[61]

আর শয়তান এজন্য ঘরে প্রবেশ করে না; কারণ তাতে আয়াতুল কুরসী রয়েছে।

* আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে,

«أَنَّ من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح».

“যে ব্যক্তি এ আয়াতুল কুরসী রাত্রি বেলায় পাঠ করল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য একজন সংরক্ষণকারী সার্বক্ষণিকভাবে থাকবে এবং শয়তান সকাল হওয়া পর্যন্ত তার কাছে আসতে পারবে না।”[62]

* অনুরূপভাবে ‘আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত,

---

৬১ তিরমিযী: ২৮৭৭। যদিও গ্রন্থকার বলেছেন যে এটা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। বস্তুত ইমাম মুসলিমের শব্দ হচ্ছে, (৭৮০)

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»

৬২ বুখারী: ২৩১১।

«أن جبرئيل قال وهو عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا بَابٌ قد فتح من السماء ما فتح قط، قال: فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ».

"জিব্রাঈল আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকা অবস্থায় বললেন, এই দেখুন এটা একটা দরজা আকাশ থেকে খোলা হয়েছে- ইতোপূর্বে কখনো তা খোলা হয়নি। রাবী বললেন, এরপর ওই দরজা থেকে একজন ফেরেশতা নাযিল হয়ে আল্লাহর নবীর সম্মুখে হাযির হয়ে বললেন: আপনি দু'টো নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনার পূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি, সেটা হলো (১) সূরা ফাতিহা। (২) সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো, আপনি এ দুটো তিলাওয়াত করে যে কোনো হরফ দ্বারা যা চাইবেন তা আপনাকে দেয়া হবে।"[63]

- **যে সমস্ত সূরা বিশেষ ফযীলতের জন্য সুনির্দিষ্ট সূরা ইখলাস (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) তাদের অন্যতম।**

---

[৬৩] মুসলিম: ৮০৬।

* সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরার ব্যাপারে বলেছেন:

«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إنها تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

‘সেই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার জীবন নিহিত, নিশ্চয়ই এ সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।’[64]

অবশ্য ফযীলতের ক্ষেত্রে এটা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এ কথাটির অর্থ এই নয় যে তা পুরো কুরআনের বিকল্প। এজন্য যদি কেউ এ সূরা সালাতে তিনবার পড়ে তা তার জন্য সূরা ফাতেহার বিকল্প হিসেবে গ্রহণীয় হবে না। বস্তুত কোনো কিছু ফযীলতের ক্ষেত্রে অন্য কিছুর সমপর্যায়ের হলেই এটা আবশ্যক নয় যে তা অপরটার বিকল্প হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আবূ আইয়ুব আল আনছারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[৬৪] বুখারী: ৫০১৩।

من قال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَشَرَ مَرَّات كَانَ كَمَنْ أعتق أربعة أنفسٍ من ولد إسماعيل.

"যে ব্যক্তি বলল,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ.

'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, সকল রাজত্ব তাঁর, তাঁর জন্য সকল প্রশংসা।' এ দো'আ বা যিকরটি ১০ বার পড়ে, সে যেন ইসমাইল 'আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্যে চারজন গোলামকে আযাদ করে দিল।"[65]

তাবরানীর বর্ণনায় বলা হয়েছে,

« كُنَّ لَهُ كَعِدْلِ عَشَرِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

'তা তার জন্য ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্য হতে চারজনকে আযাদ করার সমতুল্য হবে।'[66]

এ দো'আর এ ফযীলত সত্ত্বেও যদি কারো উপর ৪ জন গোলাম আযাদ করার কাফফারা ধার্য হয় তখন সে এ যিকরটি করলে

---

৬৫ বুখারী: ৬৪০৪; মুসলিম: ২৬৯৩।

৬৬ তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৪/১৬৫, নং ২০৪০।

গোলাম আযাদের জন্য যথেষ্ট হবে না; যদিও ফযীলত বা সওয়াবের দিক থেকে মান সমান হয়।

- **ফযীলত সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট সূরার মধ্যে সূরা মুয়াওয়াযাতাইন তথা (কুল 'আউযু বিরাব্বিল ফালাক) ও (কুল 'আউযু বিরাব্বিন নাস) উল্লেখযোগ্য।**

* 'উকবা ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»

"তুমি কি দেখনি? আজ রাত্রিতে নাযিল হওয়া সেই আয়াতসমূহ! এরূপ আয়াত আর লক্ষ্য করা যায় না। সেগুলো হলো সূরা ফালাক ও সূরা নাস। তথা কুল 'আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল 'আউযু বিরাব্বিন নাস।"[67]

* নাসাঈতে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ عقبة أن يقرأ بهما» ثم قال النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَااسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا».

---

[৬৭] মুসলিম: ৮১৪।

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন এ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করার জন্য।” তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “কোনো প্রার্থনাকারী এ দুটো সূরায় বর্ণিত প্রার্থনার মত প্রার্থনা করে না। আর কোন আশ্রয়কারীও এ সূরায় বর্ণিত বিষয়ের মত আশ্রয় চায় না।”[68]

- **সুতরাং হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ!** বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতে রত থাকুন। বিশেষ করে এ মাসে যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। কারণ এ মাসে অধিক কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের কাছে প্রত্যেক বছর রমযান মাসে একবার পুরো কুরআন পেশ করতেন, পুনরাবৃত্তি করতেন। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর বছর তিনি সেটা দু’বার পেশ করেন; যাতে তা রাসূলের হৃদয়ে স্থায়ী ও স্থির হয়ে যায় এবং পাশাপাশি বিষয়টি জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমনটি করেছেন।[69]

---

[৬৮] নাসাঈ ৮/২৫৩, ২৫৪।

[৬৯] বুখারী: ৪৯৯৮।

- অনুরূপভাবে সালাফে সালেহীন তথা আমাদের নেককার পূর্বসুরীগণ রমযান মাসে সালাতে ও সালাতের বাইরে কুরআন বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন।

* ইমাম যুহরী (রহ.) রমযান মাস আগমন করলে বলতেন, এটা তো শুধু কুরআন তিলাওয়াত ও মানুষকে খাবার খাওয়ানোর মাস।

* এ মাহে রমযান আগমন করলে ইমাম মালেক (রহ.) হাদীস পাঠ, ইলমী মজলিস পরিত্যাগ করতেন এবং মুসহাফ থেকে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি মনোনিবেশ করতেন।

* কাতাদা (রহ.) সর্বদা প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন। আর রমযানে প্রতি তিন দিনে একবার খতম করতেন এবং রমযানের শেষ দশ দিন প্রতিদিন এক খতম করে পড়তেন।

* ইব্রাহীম নাখ‘য়ী (রহ.) রমযানে প্রতি তিন রাত্রিতে কুরআন খতম করতেন এবং শেষ দশ রাত্রিতে প্রতি দুই রাত্রিতে খতম করতেন।

* আসওয়াদ (রহ.) প্রতি মাসেই দুই রাত্রিতে পুরা কুরআন পাঠ করতেন।

- ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। অতএব আপনারা এসব পুণ্যবান মনীষীদের অনুসরণ করুন, তাঁদের পথে অনুগামী হয়ে পূতঃহৃদয় পুণ্যবান ফেরেশতাদের সঙ্গী হোন। আর রাত ও দিনের সময়গুলো এমন কিছুতে কাজে লাগান যা আপনাদেরকে প্রতাপশালী ক্ষমাশীল রবের নৈকট্যশীল করবে; কেননা বয়স দ্রুতই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, এ যেন দিনের এক মুহূর্তকাল মাত্র!

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সেভাবে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফীক দিন যেভাবে করলে আপনি খুশি হবেন এবং এর মাধ্যমে আপনি আমাদের শান্তির পথ দেখান, এর দ্বারা আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় বের করে আনুন, আর একে আমাদের বিপক্ষে নয় আমাদের পক্ষে প্রমাণ বানিয়ে দিন হে সৃষ্টিকুলের পালনকর্তা।

হে আল্লাহ আপনার আপন করুণায় এ কুরআনের মাধ্যমে জান্নাতে আমাদের উঁচু স্তর প্রদান করুন এবং জাহান্নামের স্তরসমূহ থেকে নাজাত দিন। আর আমাদের যাবতীয় গুনাহের ক্ষতিপূরণ করে দিন। আমাদেরকে এবং পিতা-মাতা ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন হে পরম করুনাময়! আর সালাত ও

সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীর ওপর।

ষষ্ঠ আসর

সিয়ামের বিধানের দিক থেকে মানুষের প্রকারভেদ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ী যা সৃষ্টি ও নির্মাণ করেছেন তা করেছেন সুনিপুণ। পথ ও পদ্ধতি হিসেবে প্রবর্তন করেছেন শরীয়তকে, যাতে রয়েছে দয়া ও প্রজ্ঞার সমন্বয়। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আনুগত্য করার, তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয় বরং আমাদেরই প্রয়োজনে। ক্ষমা করেন তাকে যে তার রবের কাছে ফিরে আসে এবং তাঁর কাছে যায় আর বিপুল পরিমান দান করেন তাকে যে সৎকর্মশীল হয়।

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

“আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথে পরিচালিত করব।’ {সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৯} আমি তাঁর নে‘আমতসমূহের ওপর তাঁর স্তুতি গাই ও প্রশংসা করি।

আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, এমন সাক্ষ্য যা দ্বারা আমি দারুন নাঈম তথা নে'আমত ও আনন্দপূর্ণ বাড়ী জান্নাত লাভ ধন্য হতে পারি। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে তিনি সব আসমান ছাড়িয়ে উপরে নিজের কাছে নিয়েছিলেন ফলে তিনি তাঁর নৈকট্য লাভ করেছিলেন।

আল্লাহ সালাত পেশ করুন তাঁর ওপর, তাঁর সাথী আবূ বকরের ওপর যিনি ইবাদতের কষ্টের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন সন্তুষ্টচিত্তে, যাকে আল্লাহ তার বাণী,

﴿إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ﴾ [التوبة: ٤٠]

"যখন তিনি তার সাথীকে বলছিলেন, পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন"। [সূরা আত-তাওবাহ: ৪০] দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অনুরূপভাবে উমরের ওপর, যিনি ইসলামের বিজয়গৌরব ছিনিয়ে এনেছেন ফলে তা আর দুর্বল অসহায় থাকেনি, উসমানের ওপর যিনি তাকদীরে সন্তুষ্ট থেকেছেন অথচ তার দুয়ারে মৃত্যু হাতছানি দিয়েছে। তদ্রূপ আলীর ওপর, যিনি বংশগত দিক থেকে রাসূলের নিকটজন

এবং যিনি লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। তাছাড়া রাসূলের সকল পরিবার-পরিজন এবং বিশ্বস্ত ও সম্মানিত সাহাবীর ওপর। আর আল্লাহ তাদের উপর যথাযথ সালামও বর্ষণ করুন।

০ **ভাইয়েরা আমার,** তৃতীয় আসরে উল্লেখিত হয়েছে যে, সাওমের ফরয হওয়া প্রথমত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এরপর সাওমের বিধান স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[70]

○ কিন্তু এ সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে মানুষের দশটি প্রকার রয়েছে:

প্রথম প্রকার: ঐ সব মানুষ যারা মুসলিম, বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন, মুকীম, সামর্থ্যবান ও বাধামুক্ত।

এ প্রকার মানুষদের উপর রমযানের সাওম যথাসময়ে আদায় করা ওয়াজিব। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দলীলসমূহ এর উপর প্রমাণবহ।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

---

৭০ দেখুন, পৃ.

‘রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا »

‘যখন তোমরা রমযানের চাঁদ দেখবে, তখন সিয়াম পালন করবে।’[71]

* আর পৃথিবীর সব মুসলিম রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

- কাফিরের ওপর সিয়াম ফরয নয় এবং কাফিরের সিয়াম বিশুদ্ধও হবে না। কারণ সে ইবাদত করার যোগ্য নয়। তাই যদি সে মাহে রমযানের মাঝখানে মুসলিম হয়, তাহলে বিগত দিনগুলোর সিয়াম কাযা করা তার উপর আবশ্যক নয়।

* কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

---

৭১ বুখারী: ১৯০৫; মুসলিম: ১০৮১।

﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾ [الانفال: ٣٨]

‘যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে বল, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে।’ {সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৮}

তবে যদি কাফির রমযানের কোনো দিনের মধ্যভাগে মুসলিম হয়, তাহলে এই দিনের বাকী সময় সিয়াম পালন করা তার জন্য আবশ্যক। কারণ বিরত থাকার সময় পাওয়ার পর থেকে বিরত থাকার বিধান মানতে সে বাধ্য।

দ্বিতীয় প্রকার: নাবালেগ শিশু।

তার ওপর সিয়াম ফরয হবে না; যতক্ষণ না সে বালেগ হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

“তিন ব্যক্তির জন্য কলমের লিখন বন্ধ রাখা হয়েছে। (শর‘ঈ বিধানের বাধ্য-বাধকতার আওতামুক্ত রাখা হয়েছে) (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হবে, (২) নাবালেগ যতক্ষণ না সে

বালেগ হবে এবং (৩) পাগল যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসবে।”[72]

কিন্তু সালাফে সালেহীনের অনুকরণ ও অনুসরণে অভিভাবগণ নিজ নিজ নাবালেগ সন্তানকে সিয়ামের চর্চা করাবে, যাতে বালেগ হওয়ার পর ইবাদত সহজ হয়।

কারণ, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের ছোট ছোট নাবালেগ সন্তানদের রোযা রাখাতেন এবং মসজিদে নিয়ে যেতেন এবং তাদের জন্য তুলা, পশম ইত্যাদির খেলনা বানিয়ে দিতেন। খাবার না পেয়ে কাঁদলে তারা ওই ছোট সন্তানদের খেলনা দিতেন, ওরা খেলনা পেয়ে খেলত এবং খাবারের কথা ভুলে যেত[73]।

আজকের দিনে অনেক অভিভাবককে এ বিষয়ে গাফেল ও উদাসীন দেখা যায়। তারা নাবালেগ শিশু-সন্তানদের সিয়াম

---

[৭২] মুসনাদে আহমাদ ৬/১০০, ১০৪; আবূ দাউদ: ৪৩৯৮; নাসাঈ: ৬/১৫৬ নং ৩৪৩২; মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৫৯।

[৭৩] দেখুন, বুখারী: ১৯৬০; মুসলিম: ১১৩৬। হাদীসটি আশুরার সাওমের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও ফরয সাওমের সাথে তা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ, তখন আশুরার সাওম ফরয ছিল, পরে সেটা সুন্নাত করে দিয়ে রমযানের সাওম ফরয করা হয়েছে। [সম্পাদক]

পালনের নির্দেশ দেন না। বরং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি অনুচিত মায়া দেখিয়ে সিয়াম পালনে নিষেধ করেন।

অথচ বাস্তবতা হলো, ইসলামের মৌলিক নিদর্শনাবলী ও তার মূল্যবান শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়াই সন্তানের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার দাবী। সুতরাং যে অভিভাবক নাবালেগ শিশুসন্তানদের সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেন অথবা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন, তিনি তাদের জন্য যালেম হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং নিজের উপরও। হ্যাঁ! যদি তারা সাওম পালন শুরু করে দেওয়ার পর তিনি দেখতে পান যে সিয়াম পালনে তাদের ক্ষতি হয়ে যাবে তখন তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করায় কোনো অসুবিধা নেই।

○ **উল্লেখ্য, তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটির মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া প্রমাণিত হবে:**

এক: স্বপ্নদোষ বা অন্য কোনোভাবে বীর্যপাত হওয়া।

* কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ﴾ [النور: ٥٩]

‘আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমনিভাবে তাদের অগ্রজরা অনুমতি প্রার্থনা করত।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৯}

* অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

‘প্রতিটি বালেগের জন্য জুম‘আর দিন গোসল করা ওয়াজিব।’[74]

দুই: নাভীর নিচের পশম গজানো। এ ব্যাপারে আতিয়া আল-কুরাযী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ

‘যুদ্ধের দিন আমাদের বন্দি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। অতঃপর যাদের নাভীর নিচে পশম গজিয়েছিল, তাদের হত্যা করা হয়েছিল। যাদের পশম গজায়নি তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।’[75]

---

[৭৪] বুখারী: ৮৭৯; মুসালিম: ৮৪৬।

[৭৫] আহমদ: ৪/৩৪১, ৫/৩৭২; নাসাঈ: ৬/১৫৫, নং ৮৫৬৭।

তিন: ১৫ বছর বয়সে উপনীত হওয়া।

* এ ব্যপারে আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

«عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي »

‘‘আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধের জন্য পেশ করা হলো। আমার বয়স তখন ১৪ বছর ছিল। তিনি তখন আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেন নি (আমি নাবালেগ বলে আমাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেন নি)’।’[76]

ইমাম বায়হাকী ও ইবনে হিব্বান সহীহ গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ثُمَّ عُرِضتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي»

‘তিনি মনে করেন নি যে আমি বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি। অতঃপর খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

৭৬ ইবন মাজাহ: ২৫৪৩।

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যুদ্ধের জন্য পেশ করা হলো, তখন আমার বয়স ১৫ বছর। সে সময় তিনি আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন।’[77]

তাছাড়া বাইহাকী ও ইবন হিব্বান এর সহীহ গ্রন্থে সহীহ সনদে আরও এসেছে, «ورآني بلغتُ» “আর তিনি মনে করলেন যে, আমি বালেগ হয়েছি।”

قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا (يعني من العطاء) لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ»

‘নাফে‘ (রহ.) বলেন, তারপর আমি উমর ইবনে আব্দুল আযীয (খলীফাতুল মুসলিমীন)-এর কাছে গমন করে এ হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, “এটিই হলো ছোট ও বড়র মধ্যে সীমারেখা।” তারপর তিনি কর্মচারীদের উদ্দেশে লিখলেন, “যারাই ১৫ বছর বয়সে উপনীত হবে তাদের জন্যই রাজকোষ থেকে ভাতা নির্ধারণ করা হবে।’[78]

---

[৭৭] বাইহাকী: ৩/৮৩, ৬/-৫৫, ৮/২৬৪, ৯/২১,২২। ইবনে হিব্বান: ৪৭২৮।

[৭৮] বুখারী: ২৬৬৪ ও ৪০৯৭।

*** আর মেয়েরা বালেগা (প্রাপ্ত বয়স্কা) হবে পুরুষদের বালেগ হওয়ার মতই তবে তাদের উপরোক্ত তিনটির সাথে চতুর্থ একটি আলমতও রয়েছে। আর সে চতুর্থটি হলো: <u>হায়েয বা ঋতুবতী হওয়া।</u>**

সুতরাং যখন মেয়েদের হায়েয হয়, তখন তার ওপর শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশ পালন করা আবশ্যক। যদিও বয়স ১০ বছর না হয়।

আর যদি কেউ রমযান মাসে দিনের বেলায় বালেগ-বালেগা হয়, তাহলে যদি সে দিন সাওম পালনরত অবস্থায় বালেগ-বালেগা হয় তাহলে সে তার সাওম পূর্ণ করবে। আর যদি সে দিন সাওম ভঙ্গকারী হিসেবে থাকে তবে দিনের বাকি সময় পানাহার থেকে বিরত থাকবে; কারণ সিয়াম পালন যাদের ওপর ওয়াজিব এক্ষনে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে তাকে এ দিনের সাওম কাযা করতে হবে না; কারণ সাওমের জন্য পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার সময় (সুবহে সাদিকের সময়) যাদের উপর পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হয় সে তখন তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

<u>তৃতীয় প্রকার: পাগল তথা সুস্থজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি</u>

সুতরাং পাগল, অচেতন ও মাতালের ওপর সিয়াম ফরয নয়। যেমন পূর্বোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল: রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

‘তিন ব্যক্তির জন্য কলমের লিখন বন্ধ রাখা হয়েছে। (শর‘ঈ বিধানের বাধ্য-বাধকতার আওতামুক্ত রাখা হয়েছে) (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হবে, (২) নাবালেগ যতক্ষণ না সে বালেগ হবে এবং (৩) পাগল যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসবে।’[79]

পাগল যদি সিয়াম পালন করে তাহলে তা সহীহ হবে না। কারণ পাগলের কাছে এমন বিবেক নেই যা দ্বারা সে ইবাদত বুঝবে ও তার নিয়ত বুঝবে। আর নিয়ত ছাড়া ইবাদত বিশুদ্ধ হয় না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

[৭৯] আবূ দাউদ: ৪৩৯৯; নাসাঈ: ৩৪৩২।

‘সকল আমল বা কাজে ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তা-ই রয়েছে যা সে নিয়ত করল।’[৪০]

যদি কখনও পাগলামী করে আবার কখনো সুস্থ হয়, তাহলে পাগলামী অবস্থা বাদে সুস্থ অবস্থায় সিয়াম পালন করা আবশ্যক। যদি দিনের মধ্য ভাগে পাগল হয়ে যায়, তাহলে তার সিয়াম বাতিল হবে না। যেমনিভাবে কেউ অসুস্থ বা অন্য কোনো কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো তার সিয়াম ভঙ্গ বা বতিল হয় না। কারণ সে সিয়ামের নিয়ত করেছে সুস্থ ও জ্ঞান থাকা অবস্থায়। বাতিল বলার সপক্ষে কোনো দলীল নেই; বিশেষ করে যখন এটা জানা যাবে যে, তার পাগলামী সুনির্দিষ্ট কিছু সময় সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং তার সিয়াম বাতিল হবে না।

তাই যেদিন পাগলামী করেছে ওই দিনের সিয়াম কাযা করাও আবশ্যক নয়।

আর যদি পাগল রমযান মাসে দিনের বেলায় সুস্থ হয়, তাহলে সেদিনের বাকি অংশ তার জন্য সিয়াম পালন আবশ্যক; কারণ

---

[৮০] বুখারী: ৬৬৮৯; মুসলিম: ১৯০৭।

সে তখন যাদের উপর সিয়াম পালন করা ফরয তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে তার ওপর এ সাওমটি কাযা করা আবশ্যক নয়। যেমনটি শিশু বালেগ হলে এবং কাফের মুসলিম হলে কাযা আবশ্যক হয় না।

চতুর্থ প্রকার: স্মৃতি হারানো ও ভালো-মন্দের তারতম্য বোধশূন্য বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি।

এ ধরণের ব্যক্তিদের ওপর সিয়াম পালন কিংবা মিসকীন খাওয়ানো কোনোটাই আবশ্যক নয়। কারণ ভালো-মন্দ নির্ণয় করার জ্ঞান না থাকার কারণে তিনি শরয়ী মুকাল্লাফ (বাধ্য-বাধকতা) অবস্থায় থাকেন না। এ ধরনের লোককে ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না এমন শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে।

যদি তাঁর কখনো পার্থক্য করার জ্ঞান থাকে আবার কখনো পার্থক্য করার জ্ঞান থাকে না এমন অবস্থা হয়, তাহলে পার্থক্য করার জ্ঞান থাকা অবস্থায় সাওম ফরয হবে। জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ফরয হবে না। আর সালাত সিয়ামের মতোই। জ্ঞানহীন অবস্থায় সালাত পড়া আবশ্যক নয়, জ্ঞান থাকা অবস্থায় সালাত পড়া অবশ্যক।

পঞ্চম প্রকার: সাওম পালনে এমন ধারাবাহিক অক্ষম ব্যক্তি যার অক্ষমতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা নেই:

যেমন অতিশয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বা এমন রোগী যার রোগ আরোগ্য হওয়া আশা করা যায় না। এর উদাহরণ হচ্ছে, ক্যানসার বা অনুরূপ রোগ। অতএব এমন ব্যক্তির জন্য সিয়াম পালন ফরয নয়। কারণ সে এতে অক্ষম।

* আর আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾ [التغابن: ١٦]

‘যতটুকু পার তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো।’ {সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

‘আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কাউকে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।’ {সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত: ২৮৬}

তবে ওই অক্ষম ব্যক্তির জন্য প্রতি সাওমের বদলে রোজ একজন মিসকীনকে খাওয়ানো আবশ্যক। কারণ আল্লাহ

তা‘আলা সাওম ফরয হবার প্রাথমিক সময়ে খাবার খাওয়ানোকে সাওম পালনের সমান বলে গণ্য করেছিলেন, যখন এতদোভয়ের যে কোনো একটি করার অনুমতি ছিল। সুতরাং সাওম পালনে অক্ষম ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক সাওমের বদল হিসেবে খাবার খাওয়ানো সুনির্ধারিত হয়ে গেল; কারণ খাবার খাওয়ানো সাওম পালনের বিকল্প।

- আর খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে দু’টির যে কোনোটি গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে,

- প্রত্যেক মিসকীনকে আলাদাভাবে খাদ্য ভাগ করে দেয়া যায়। প্রত্যেকের জন্য এক মুদ্দ উন্নত গম, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা‘ এর চারভাগের একভাগ। আর এক মুদ্দ এর পরিমান হচ্ছে, “আধা কিলো ও ১০ গ্রাম” ভারী ভালো গম।

- আবার খাবারের আয়োজন চূড়ান্ত করে সব মিসকীনকে দাওয়াত দিয়ে নির্ধারিত দিনের হিসেব অনুযায়ী খাওয়ানো যেতে পারে।

ইমাম বুখারী বলেন:

وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ

‘বয়স্ক বৃদ্ধ লোক যখন সিয়াম পালনে অক্ষম হবেন, তখন তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পদাংক অনুসরণ করবেন। আনাস বয়স্ক হবার পর এক বছর কিংবা দু’বছর প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে রুটি ও গোশত খাওয়াতেন এবং সাওম ভাঙ্গতেন।[81]’

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বৃদ্ধ পুরুষ, বৃদ্ধা নারীর ব্যাপারে বলেছেন, তারা যদি সাওম পালনে অক্ষম হন, তাহলে প্রতি সাওমের স্থলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।’[82]

○ **আমার ভাইয়েরা!** শরীয়ত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হিকমত ও রহমতস্বরূপ। আল্লাহ এর দ্বারা বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কারণ এ শরীয়তের মূল ভিত্তিই হচ্ছে সহজতা ও প্রজ্ঞা এবং সুচারুরূপ ও প্রজ্ঞার উপর। আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থানুযায়ী সিয়াম ফরয করেছেন, যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য আঞ্জাম দিতে পারে এবং এর দ্বারা তার অন্তরে লাভ করে প্রশান্তি এবং মনে আসে তৃপ্তি। যাতে প্রত্যেকেই রব হিসেবে আল্লাহ, দীন হিসেবে ইসলাম ও নবী হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারে।

---

[৮১] বুখারী (ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীসহ) : ৮/১৭৯

[৮২] বুখারী: ৪৫০৫।

○ সুতরাং হে মুমিনগণ, আপনারা আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করুন, এ মূল্যবান দীনের ওপর আর আপনাদের হেদায়েতের মাধ্যমে যে অফুরন্ত নেয়ামত আপনাদের দিয়েছেন তার ওপর। কারণ পৃথিবীতে বহু মানুষ পথভ্রষ্ট ও পথহারা হয়ে গেছে। আর আল্লাহর নিকট আপনারা প্রার্থনা করুন যাতে তিনি আপনাদেরকে আমৃত্যু দীনের ওপর অটল ও অবিচল রাখেন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি; কারণ আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনি একক অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, যার কোনো সন্তান নেই, যিনি কারও সন্তান নন এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ নন, হে মহিমান্বিত, সম্মানিত ও অনুগ্রহপ্রদর্শনকারী, হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর! আমরা আপনার কাছে চাই যেন আপনি আমাদেরকে সেটার তাওফীক দিন যা আপনি আপনি পছন্দ করে এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট এবং আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন তাদের মধ্যে যারা আপনাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। আপনার কাছে আরও প্রার্থনা করি, আপনি আমাদের আমৃত্যু এর ওপর স্থির ও অবিচল রাখুন। আর আপনি আমাদের

জীবনের সমুদয় পাপরাশি ক্ষমা করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য করুণা বর্ষণ করুন। নিশ্চয় আপনি মহান দাতা।

আর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব অনুসারীর ওপর।

সপ্তম আসর

সিয়ামের বিধানের দিক থেকে মানুষের প্রকারভেদের অবশিষ্ট আলোচনা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সমকক্ষের উর্ধ্বে, সব ধরনের ত্রুটি ও বৈপরিত্ব থেকে মুক্ত, স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পবিত্র, দৃঢ় সপ্তক (সাত আসমান) উত্তোলনকারী, খুঁটিবিহীন ওপরে স্থাপনকারী, ভূমণ্ডলকে সমতলকারী, মজবুত পেরেকসমূহ (পর্বতমালা) দ্বারা সুস্থিরকারী, মনের গোপনীয়তা ও অন্তরের ভেদ সম্পর্কে অবগত, সঠিক-ভ্রান্ত পথিক যা হয়েছে ও হবে তার নির্ধারণকারী, তাঁর স্নেহসমুদ্রে বান্দাদের বাহনগুলো চলাচল করে এবং তাঁর ভালোবাসার ময়দানে সংসারবিরাগী বান্দাদের ঘোড়াগুলো বিচরণ করে। তিনিই তালাশকারীদের তালাশস্থল এবং পথিকদের গন্তব্যস্থল। বহনকারীরা তাঁর জন্যই বহন করে এবং প্রচেষ্টাকারীরা তাঁর জন্যই চেষ্টা করে। অন্ধকারে কালো পিঁপড়ের পদবিক্ষেপও তিনি দেখেন। গোপন চেতনা থেকে নফসে যে কুমন্ত্রণার জন্ম তিনি তারও খবর রাখেন। প্রার্থনাকারীদের প্রতি তিনি

বদান্যতা দেখান এবং তাদের পাথেয় আরও বাড়িয়ে দেন। আর লক্ষ্য পানে নিষ্ঠকর্মীদের তিনি অধিক দান করেন। আমি তাঁর স্তুতি গাই সকল সংখ্যা ছাড়িয়ে এবং তাঁর নেয়ামতের উপর শুকরিয়া জানাই, আর যখনই তার শোকর আদায় করা হয় তখনই তা যায় বেড়ে।

আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনিই মালিক ও বান্দাদের প্রতি দয়ালু, আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি সব দেশের সব মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

আল্লাহ সালাত পাঠ করুন তাঁর ওপর, তাঁর সাথী আবূ বকরের ওপর যিনি নিজের জান, মাল যথেষ্ট পরিমাণ ব্যয় করেছেন, উমরের ওপর যিনি ইসলামের বিজয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, উসমানের ওপর যিনি কঠোর সময়ে সৈন্যবাহিনীকে রসদ সরবরাহ করেছেন, কিয়ামতের দিন তার কতই না গৌরব হবে! অনুরূপভাবে আলীর ওপর যিনি বীরত্ব ও নির্ভীকতায় সুবিদিত, আল্লাহ আরও সালাত পেশ করুন নবীর সকল পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী ও কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সব সুন্দর অনুসারীর

ওপর। আর আল্লাহ তাদের উপর যথাযথ সালামও পেশ করুন।

- **প্রিয় ভাইয়েরা!** সিয়াম পালনের হুকুম আহকামের ব্যাপারে মানুষের পাঁচটি শ্রেণীর আলোচনা পূর্বে পেশ করেছি। এ আসরে এসব প্রকারের মধ্য থেকে আরেকটি দলের আলোচনা করবো:

ষষ্ঠ প্রকার: মুসাফির ব্যক্তি যিনি সাওম ভাঙ্গার কৌশল হিসেবে সফরের সংকল্প করেন নি।

- যদি মুসাফির সাওম ভাঙ্গার কৌশল হিসেবে সংকল্প সফর শুরু করে তাহলে সাওম ভাঙ্গা তার জন্য হারাম হবে। তখন সাওম পালনই তার জন্য ফরয হয়ে যাবে।
- পক্ষান্তরে সে যদি সফরকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ না করে তবে সে সাওম পালন বা সাওম ভঙ্গ করার এখতিয়ার পাবে। তার সফরের সময়সীমা দীর্ঘ হোক কিংবা সংক্ষিপ্ত। হোক তার সফর কোনো উদ্দেশ্যে আকস্মিক কিংবা ধারাবাহিক। যেমন পাইলট বা ভাড়া গাড়ির ড্রাইভার। কারণ,

* আল্লাহর বাণীতে সফরের কথা ব্যাপকার্থেই এসেছে:

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

‘আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ বা মুসাফির, সে তার সিয়াম অন্য সময় আদায় করে নেবে। তোমাদের পক্ষে যা সহজ আল্লাহ তাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা তিনি চান না।’ {সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত: ১৮৫}

* বুখারী ও মুসলিমে আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»

“আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফর করতাম, তখন সিয়াম পালনকারী ভঙ্গকারীকে দোষ দিত না এবং সিয়াম ভঙ্গকারীও পালনকারীকে দোষারোপ করত না।’[83]

* সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ‘আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ»

“তারা (সাহাবীগণ) মনে করতেন, যে নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করে ও সিয়াম পালন করে সেটা তার জন্য উত্তম।

[৮৩] বুখারী: ১৯৪৭; মুসলিম: ১১১৮।

পক্ষান্তরে যে নিজের মধ্যে দুর্বলতা অনুভব করে ও সাওম ভঙ্গ করে সেটা তার জন্য উত্তম।’[84]

* সুনানে আবূ দাউদে হামযা ইবন আমর আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأُكْرِيهِ وَإِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي رَمَضَانَ وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ وَأَجِدُبِأَنْ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَخِّرَهُ فَيَكُونُ دَيْنًا أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ قَالَ أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ»

“হে আল্লাহর রাসূল! আমি মালামাল বহনকারী পশুর মালিক, আমি তা সফরের জন্য পরিচর্যা করে থাকি এবং তা ভাড়া দেই। কখনো এ মাস রমযানও আমাকে সফরের মধ্যে পেয়ে বসে। আর আমি যুবক মানুষ, সাওম পালনের শক্তিও আছে। হে আল্লাহর রাসূল সাওম পালন আমার জন্য পরে পিছিয়ে রাখার চেয়ে অধিকতর সহজ। পরে সাওম পালন করলে এটা আমার কাছে ঋণের বোঝার মতো হয়ে যায়। তাহলে কি আমি বড় ধরনের সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করবো নাকি ভেঙ্গে ফেলবো? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

---

[৮৪] মুসলিম: ১১১৬।

ওয়াসাল্লাম বললেন, হে হামযা! যেটা ইচ্ছা তোমার সেটাই করতে পারো।”[85] অর্থাৎ ইচ্ছা করলে সাওম পালন করতে পারো আবার ভাঙ্গতেও পার।

○ অতএব গাড়ির ড্রাইভার যিনি ভাড়ায় গাড়ী চালান এবং তাকে তা সর্বক্ষণই করতে হয়, রমযান মাসে সফর অবস্থায় তীব্র গরমের কারণে যদি তাঁর সাওম পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে তিনি যখন আবহাওয়া ঠান্ডা হবে এবং তার জন্য সাওম পালন করা সহজ হবে এমন সময়ে সে সাওম (কাযা হিসেবে) পালন করতে পারবেন।

তবে মুসাফিরের জন্য সর্বোত্তম হলো সাওম পালন বা ভাঙ্গার মধ্যে যেটা তুলনামূলক সহজ হয় তাই করা।

যদি দু’টোই সমান হয় তাহলে সাওম পালনই শ্রেয়। কারণ এটা তাড়াতাড়ি জিম্মামুক্ত হতে সহায়ক এবং অন্যদের সঙ্গে হবার কারণে উৎসাহব্যঞ্জকও বটে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলও এমন।

* যেমন সহীহ মুসলিমে আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

---

[৮৫] আবূ দাউদ: ২৪০৩। দুর্বল সনদে।

«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»

'আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসে প্রচণ্ড গরমের দিনে বের হলাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ প্রচণ্ড গরমের কারণে তার হাত মাথার ওপর রাখে। আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া আর কেউ রোযাদার ছিল না।'[86]

আবার কখনও কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন এ খবর পৌঁছল যে, সাওম হেতু সাহাবীগণের কষ্ট হচ্ছে, তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে সাওম ভেঙ্গে ফেললেন।

* যেমন জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ

[৮৬] মুসলিম: ১১২২।

النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ».

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর মক্কার উদ্দেশে বের হলেন। এরপর তিনি সাওম পালন শুরু করে কুরায়ে গামীম (নামক স্থানে) পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে লোকজনও সাওম রাখলেন। অতঃপর তাঁর উদ্দেশে বলা হলো, লোকজনের সাওম রাখতে কষ্ট হচ্ছে। আপনি কী করছেন তারা তা লক্ষ্য করছে। তখন তিনি বাদ আসর পানির পেয়ালা আনতে বললেন। এরপর সবাইকে দেখিয়ে তিনি পানি পান করলেন।'[87]

* আর আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى نَهَرٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ مُشَاةً وَنَبِيُّ اللَّهِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ فَقَالَ اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَالَ فَأَبَوْا قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَيْسَرُكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ فَأَبَوْا قَالَ فَثَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخِذَهُ فَنَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه أحمد

---

৮৭ মুসলিম: ১১১৩, ১১১৪।

‘নবী সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির পানিসৃষ্ট এক নালার সম্মুখে গমন করলেন। তখন লোকজন গরমের দিনে পায়ে হেঁটে সাওম পালন করছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন তাঁর একটি খচ্চরের পিঠে। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা পানি পান করো। তারা পান করতে ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, দেখ আমি তোমাদের মত নই। আমি তোমাদের চেয়ে বেশ আরামে আছি। আমি তো আরোহী (আর তোমরা পদব্রজে)। তারপরও তাদের ইতস্ততভাব কাটলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিজ উরু মোবারক সরিয়ে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পড়লেন। এরপর (সবার সামনে) পানি পান করলেন। আর (তাঁর দেখাদেখি) লোকজনও পানি পান করলো। আসলে তিনি পানি পান করতে চাইছিলেন না।’[৪৪]

- আর যখন মুসাফির ব্যক্তির জন্য সাওম পালন কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে সাওম ভেঙ্গে ফেলবে; সফরে সাওম পালন করবে না। যেমন,

---

[৪৪] আহমদ: ৩/৪৬; ইবন খুযাইমা : ১৯৬৬।

* পূর্বোল্লিখিত জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে:

«أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما افطر حين شق الصوم على الناس قيل له: أن بعض الناس قد صام، فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» رواه مسلم

‘নবী সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যখন লোকজনের রোযা রাখা কষ্টকর হলো তখন নিজে সাওম ভেঙ্গে ফেললেন। তাঁকে বলা হলো, কোনো কোনো লোক সাওম রেখেছে। তিনি বললেন, ওরাই অবাধ্য, ওরাই পাপী।’[89]

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আরও বর্ণিত হয়েছে:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

‘নবী সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন, তিনি একস্থানে মানুষের জটলা দেখলেন, সেখানে তারা এক লোককে ছায়া দিচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হচ্ছে

---

[৮৯] মুসলিম: ১১১৪।

এখানে? তারা বললো, সাওম পালনকারী। উত্তরে তিনি বললেন, সফর অবস্থায় সাওম পালনে কোনো পুণ্য নেই।’[90]

○ যদি সিয়াম পালনকারী দিনের মধ্যভাগে সফর করে এবং সিয়াম পূর্ণ করা তার জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে নিজ শহর থেকে বের হবার পর তার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালন করেছেন এবং লোকেরাও তার সঙ্গে সিয়াম পালন করেছেন। অবশেষে ‘কুরা‘উল গামীম’ নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, লোকদের জন্য সিয়াম পালন খুব কষ্টকর হচ্ছে। তখন তিনি সাওম ভঙ্গ করলেন এবং তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও সিয়াম ভঙ্গ করল।’[91]

আর **কুরা‘উল গামীম** হলো হাররা বা কালো পাথরগুলোর পার্শ্বস্থিত একটি কালো পাহাড়; যা মাররূয-যাহরান ও ‘উসফান নামক স্থানের মধ্যভাগে অবস্থিত ‘গামীম’ নামক উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত।

○ আর যদি মুসাফির রমযান মাসে স্বীয় শহরে দিনের বেলায় সিয়াম পরিত্যাগ অবস্থায় আগমন করে, ওই দিন তার জন্য বাকী সময়ের সিয়াম রাখা সহীহ হবে না। কেননা সে

---

[৯০] বুখারী: ১৯৪৬; মুসলিম: ১১১৫।

[৯১] মুসলিম: ১১১৪।

দিনের প্রথম ভাগে সিয়াম ভঙ্গকারী ছিল। আর ফরয সিয়াম সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার সময় থেকেই কেবল সহীহ হয়।

তবে দিনের অবশিষ্টাংশ কি তার জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকা জরুরী?

এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একাধিক মত প্রকাশ করেছেন:

* কেউ বলেছেন, তার জন্য সময়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দিনের অবশিষ্টাংশ পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। আর তাকে এর কাযাও করতে হবে ওই দিনের সাওম শুদ্ধ না হবার কারণে। এটাই ইমাম আহমাদ রহ.-এর মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত।

* আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন, দিনের বাকি অংশের সাওম পালন আবশ্যক নয়; কারণ যেহেতু তাকে সাওম কাযা করতে হবে। তাই বাকি দিন সাওম পালনে কোনো ফায়দা নেই। আর রমযান মাসের মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি তো দিনের প্রারম্ভে প্রকাশ্য বা গোপনে তার বৈধভাবে রোযা ভাঙ্গার দ্বারাই শেষ হয়ে গেছে।

* আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন:

«من أكل أول النهار فليأكل آخره».

‘যে রমযানের দিনের প্রথম ভাগে খেল সে যেন শেষ ভাগেও খায়।’

অর্থাৎ শরয়ী ওযরের কারণে যার জন্য দিনের প্রথম ভাগে ভক্ষণ করা বৈধ হলো, তার জন্য দিনের শেষভাগে ভক্ষণ করাও বৈধ। এটা ইমাম মালেক রহ. শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব এবং ইমাম আহমদ রহ.-এরও একটি রেওয়ায়েত।

তবে তার রোযা ভাঙ্গার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য পানাহারের কথা প্রকাশ করবে না। কারণ তার সম্পর্কে এতে ধারণা খারাপ হবে কিংবা তার অনুসরণ করা হবে।

সপ্তম প্রকার: এমন রোগী যার রোগমুক্তির আশা করা যায়।

এর তিনটি অবস্থা:

প্রথমত: যদি এমন হয় যে, সাওম তার জন্য কষ্টকর নয় আবার তার ক্ষতিও করবে না, তাহলে তার জন্য সাওম ফরয হবে। কারণ তার কোনো শর‘ঈ ওযর নেই যা সাওম ভাঙ্গাকে বৈধ করবে।

দ্বিতীয়ত: যদি এমন হয় যে, সাওম তার জন্য কষ্টকর, তবে তার ক্ষতি করবে না। এমতাবস্থায় সে সাওম ভঙ্গ করবে।

* যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة: ١٨٥]

‘যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা সফর অবস্থায় থাকবে যে অন্যসময় গণনা করে সাওম পূর্ণ করে নেবে।’ {সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত: ১৮৫}

এমতাবস্থায় তার জন্য কষ্টকর হলে সাওম পালন মাকরূহ হবে। কারণ সে আল্লাহর দেওয়া সুযোগ থেকে বের হয়ে নিজেকে শাস্তি দিল।

* হাদীসে এসেছে:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ»

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দেওয়া সুযোগ গ্রহণকে ভালোবাসেন যেমনিভাবে তার নাফরমানী করাকে অপছন্দ করেন।’[92]

তৃতীয়ত: যদি এমন হয় যে, সাওম তার ক্ষতি করবে। তাহলে তার জন্য সাওম ভাঙ্গা ওয়াজিব এবং সাওম পালন বৈধ নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

---

[৯২] আহমদ: ৫৮৬৬; সহীহ ইবনে হিব্বান: ২৭৪২; সহীহ খুযাইমা: ৯৫০।

﴿ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ ﴾ [النساء: ٢٩]

‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।’ [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯}

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]

‘তোমরা তোমাদের নিজেদের হাতকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫}

* অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا »

‘নিশ্চয় তোমার নিজের ওপর নিজের কিছু হক রয়েছে।’[93]

আর আত্মার হক হলো, আল্লাহ ছাড় দেয়া সত্ত্বেও সাওম পালন করে নিজ আত্মার ক্ষতি না করা।

---

[৯৩] বুখারী: ১৯৬৮।

* কেননা আরেক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»

‘নিজের ও অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।’[94]

ইমাম নাওয়াওয়ী বলেন, হাদীসটির বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যেগুলো পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে।

- রমযান মাসে সাওম পালনকালে যদি তার অসুস্থতা দেখা দেয় আর সাওম পূর্ণ করা তার জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে তার জন্য বৈধ কারণ থাকায় তার সাওম ভঙ্গ করা জায়েয।
- পক্ষান্তরে রোযা ভঙ্গকারী অসুস্থ ব্যক্তি যদি রমযানে দিনের বেলা সুস্থ হয় তাহলে সেদিনের সাওম তার জন্য সহীহ হবে না। কারণ দিনের শুরুতেই সে সাওম ভঙ্গ করেছে। আর সাওম পালন সুবহে সাদিকের সময় থেকে করা ব্যতীত সহীহ হয় না।

কিন্তু ঐ দিনের বাকী অংশ কি তার সাওম পালন করতে হবে?

---

[৯৪] ইবনে মাজাহ্: ২৩৪০; অনুরূপ মুসনাদে আহমাদ ৫/৩২৬, ৩২৭।

এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে, যা ইতোপূর্বে মুসাফির কর্তৃক সফর অবস্থায় নিজে দেশে সাওম ভঙ্গ করা অবস্থায় ফেরা সম্পর্কিত আলোচনায় গত হয়েছে।

- যদি চিকিৎসা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, সাওম রোগ বৃদ্ধি করবে, তাহলে রোগ থেকে বাঁচার জন্য শারীরিক সুস্থতার দিকে লক্ষ্য রেখে সাওম ভাঙ্গা জায়েয।

যদি এ ঝুঁকি দূর হয়ে যাওয়ার আশা করা যায় তাহলে দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপর যেসব সাওম ভেঙ্গেছে তা কাযা করে নেবে। আর যদি তার রোগমুক্তির আশা করা না যায়, তাহলে তার হুকুম হবে পঞ্চম প্রকারের হুকুম; সাওম ভাঙ্গবে এবং প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন করে মিসকীন খাওয়াবে।

হে আল্লাহ! আমাদের এমন আমল করার তাওফীক দিন যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে। আর আমাদেরকে আপনার অসন্তুষ্টি ও নাফরমানির কারণ থেকে দূরে রাখুন। আর আপনার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতাকে এবং সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দিন। আর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

অষ্টম আসর

সিয়াম পালন এবং এর কাযার বিধানের দিক থেকে মানুষের প্রকারভেদের অবশিষ্ট আলোচনা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি অনন্য, মহান, প্রবল, ক্ষমতাবান, শক্তিশালী, মহাপ্রতাপশালী; কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে আয়ত্ব করার উর্ধ্বে; প্রত্যেক সৃষ্টিকে তিনি মুখাপেক্ষিতার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন; আপন শক্তিমত্তা প্রকাশ করেছেন দিবারাত্রির আবর্তনের মধ্য দিয়ে; দুরারোগ্য রোগীর ক্রন্দন শোনেন, যে নিজ অসুবিধার অনুযোগ-অভিযোগ করে; গুহাভ্যন্তরে আঁধার রাতে কৃষ্ণকায় পিঁপড়ের পদচিহ্ন তিনি দেখেন; অন্তরের অব্যক্ত এবং মনের লুকানো বিষয়ও তিনি জানেন; তাঁর গুণাবলিও তাঁর সত্তার মতোই (যেমনিভাবে তাঁর সত্তার প্রকৃত ধরণ কেউ জানে না তেমনিভাবে তাঁর গুণাগুণের প্রকৃত রূপ কেউ জানে না), যারা তার সাদৃশ্য নির্ধারণ করে (মুশাব্বিহা) তারা কাফের; কুরআন ও সুন্নায় তিনি নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন আমরা তা স্বীকার করি:

﴿أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٍ خَيۡرٌ أَم مَّنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾ [التوبة: ١٠٩]

‘যে তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠা করল সে কি উত্তম নাকি ঐ ব্যক্তি যে তার গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায়?’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৯} আমি পবিত্র ও মহান সে সত্তার প্রশংসা করি, আনন্দ ও বেদনা সর্বাবস্থায়।

আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সৃষ্টি ও পরিচালনায় তিনি এক-অদ্বিতীয়:

﴿ وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُۗ ﴾ [القصص: ٦٨]

‘আর আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং মনোনীত করেন।’ {সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৮} আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি শ্রেষ্ঠতম পুণ্যাত্মা নবী।

আল্লাহ সালাত তথা উত্তম প্রশংসা বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর হেরা গুহার সাথী আবূ বকরের ওপর, কাফেরদের মূলোৎপানকারী উমরের ওপর, স্বগৃহদ্বারে শহীদ উসমানের

ওপর, শেষ রাতে সালাত আদায়কারী আলীর ওপর এবং তার সকল পরিবারবর্গ, সকল সাহাবী মুহাজির ও আনসারীগণের ওপর। আর আল্লাহ তাদের উপর যথাযথ সালাম পেশ করুন।

○ **আমার ভাইয়েরা!** ইতোপূর্বে সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে সাত প্রকার মানুষের কথা আলোচনা করেছি। আর এই হলো অবশিষ্ট প্রকারের মানুষের আলোচনা।

অষ্টম প্রকার: ঋতুবতী মহিলা।

সুতরাং ঋতুবতী মহিলার জন্য সিয়াম পালন করা হারাম; তার দ্বারা সিয়াম পালন সহীহ হবে না।

* কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

'তোমাদের মতো দীন ও জ্ঞানগত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আর কাউকে বিচক্ষণ লোকের বুদ্ধি হরণে এমন পারঙ্গম দেখিনি। তারা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দীন ও

জ্ঞানগত অসম্পূর্ণতা কী? তিনি বললেন, নারীর সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা বলল, নিশ্চয়। তিনি বললেন, এটাই হলো তোমাদের জ্ঞানগত কমতি। আর ঋতু অবস্থায় তার সালাত ও সিয়াম পালন করতে হয় না, এমন নয় কি? তারা বলল হ্যাঁ, তিনি বললেন, এটাই হলো দীনী কমতি।'[95]

হায়েয হলো: প্রকৃতিগত রক্তক্ষরণ নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য যা নারীদের নিয়মিত হয়ে থাকে।

○ সিয়াম পালনকারী নারীর যদি সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বেও ঋতুস্রাব দেখা দেয়, তাহলে তার ওই দিনের সিয়াম বাতিল হয়ে যাবে। তবে তা কাযা করতে হবে। তবে নফল সিয়াম হলে এর কাযা করাও নফল হবে।

○ আর যদি কোনো নারী রমযানের দিনের মধ্যভাগে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়, তবে দিনের শুরুতে সিয়াম পালনের প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে ওই দিনের বাকী অংশেও সিয়াম পালন সহীহ হবে না।

প্রশ্ন হলো, **দিনের অবশিষ্টাংশ সে পানাহার থেকে বিরত থাকবে কি না?**

---

[৯৫] বুখারী: ৪০৩; মুসলিম: ১৩২।

এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুসাফিরের সিয়াম সম্পর্কিত মাসআলায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

○ আর যদি রমযানের রাতে সুবহে সাদিক উদয়ের সামান্য পূর্বেও কোনো নারী ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়, তবে তার ওপর সিয়াম পালন আবশ্যক। কেননা সে সিয়াম পালনে সক্ষমদের অন্তর্ভুক্ত, সিয়াম পালনে তার তো এখন কোনো বাধা নেই। তাই তার ওপর সিয়াম পালন ওয়াজিব। যদি সে সুবহে সাদিকের পর গোসল করে তবুও সিয়াম শুদ্ধ হবে। যেমন অপবিত্র ব্যক্তি সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর গোসল করলেও তার সিয়াম শুদ্ধ হবে।

* কারণ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ»

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নদোষ ছাড়া সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় সুবহে সাদিকের পর পবিত্রতা অর্জন করতেন এবং রমযানের সিয়াম পালন করতেন।'[96]

---

[৯৬] বুখারী: ১৯৩১; মুসলিম: ১১০৯।

○ আর নিফাসওয়ালী মহিলাদের বিধান পূর্বোক্ত হায়েযওয়ালী মহিলাদের বিধানের মতোই।

○ হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারীর যে কয়দিন সিয়াম বাদ পড়বে, সে দিনগুলোর কাযা তার ওপর ওয়াজিব।

* কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

'তবে অন্য দিনে এগুলো গণনা (কাযা) করে নেবে।' {সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত: ১৮৪}

* অনুরূপ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

'ঋতুবতীর কী হলো যে, সে সিয়াম কাযা করে অথচ সালাত কাযা করে না? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি হারূরী? (অর্থাৎ খারেজি সম্প্রদায়ভুক্ত?) সে বলল, আমি হারূরী নই, বরং জানার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, আমাদেরও এ

অবস্থা হয়েছিল। তখন আমরা সিয়াম কাযা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সালাতের জন্য নয়।’[97]

নবম প্রকার: যে দুগ্ধবতী কিংবা গর্ভবতী নারী সাওম পালনের কারণে নিজের বা সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন

এমতাবস্থায় তিনি সিয়াম পালন করবেন না; সাওম ভঙ্গ করবেন।

* কারণ, আনাস ইবন মালেক আল-কা‘বী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ»

‘আল্লাহ তা‘আলা মুসাফিরদের সালাত অর্ধেক করেছেন। আর গর্ভবতী, স্তন্যদানকারিনী ও মুসাফির থেকে সিয়াম শিথিল করেছেন।’[98]

যে কদিন তারা সিয়াম ত্যাগ করেছেন শুধুমাত্র ওই সিয়ামগুলো কাযা করা আবশ্যক। যখন তাদের জন্য কাযা করা সহজ হয়

---

৯৭ বুখারী: ৩২১; মুসলিম: ৩৩৫।

৯৮ আবূ দাউদ: ২৪০৮; নাসাঈ: ২২৭৫; তিরমিযী: ৭১৫; ইবন মাজাহ: ১৬৬৭।

এবং শঙ্কা দূর হয়ে যায় তখনই তা কাযা করবে। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি যখন সুস্থ হবে তখনই কেবল তার কাযা করবে।

দশম প্রকার: অন্যের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে যার সাওম ভাঙ্গা প্রয়োজন।

যেমন: কোনো নিরপরাধ মানুষকে ডুবে যাওয়া কিংবা আগুনে পোড়া অথবা ধসে পড়া ইত্যাদি থেকে বাঁচানো।

অতএব যদি খাবার ও পানীয় পান না করে তাকে বাঁচানো সম্ভব না হয় তাহলে তার জন্য সাওম ভাঙ্গা জায়েয হবে। বরং তখন সাওম ভাঙ্গা ওয়াজিব হবে। কারণ নিরপরাধ মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচানো ওয়াজিব। আর "যা ব্যতিরেকে ওয়াজিব সম্পন্ন করা যায় না, তাও ওয়াজিব।" তবে পরবর্তীতে ভাঙ্গা সাওমগুলো কাযা করা তার উপর আবশ্যক।

আর তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আল্লাহর পথে জিহাদে শত্রু নিধনের লক্ষ্যে শক্তি অর্জনের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করে। সে সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং পরে তার কাযা করবে। চাই সে জিহাদের সফরে হোক কিংবা নিজ শহরে, শত্রু যদি সামনে এসে যায়, সর্বাবস্থায় সাওম ভঙ্গ করে শক্তি সঞ্চয় করার বৈধতার মধ্যে কোনো হেরফের নেই। কেননা এ সময় সিয়াম

ভঙ্গ করা মুসলিমদের থেকে প্রতিরোধ ও মহান আল্লাহর কালেমা উঁচু করার জন্য।

* সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا»

'আমরা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কায় সফরে বের হলাম, তখন আমরা সাওম পালনকারী ছিলাম। এরপর আমরা একটি স্থানে অবতরণ করলাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের শত্রু পক্ষের নিকটবর্তী হয়ে গেছ। আর সাওম ভেঙ্গে ফেলে তোমাদের জন্য শক্তি সঞ্চয়ে সহায়ক হবে। ফলে সাওম ভাঙ্গা বৈধ ছিল। এরপর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সাওম রাখলো আর কেউ কেউ ভেঙ্গে ফেলল। তারপর আমরা আরেকটি স্থানে নামলাম তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা খুব শীঘ্রই শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করবে। আর সাওম ভেঙ্গে ফেলা শক্তি

সঞ্চয়ের জন্য অধিক সহায়ক হবে। সুতরাং তোমরা সবাই সাওম ভেঙ্গে ফেল। আর এটা বাধ্যকারী নির্দেশ ছিল, তাই আমরা সবাই সাওম ভেঙ্গে ফেলেছিলাম।’[99]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, সফর ছাড়াও যুদ্ধের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা একটি কারণ; যার নিমিত্তে সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করাকে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলার জন্য স্বতন্ত্র একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সফর স্বতন্ত্র আরেকটি কারণ। এ জন্য তিনি প্রথম স্থানে সিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ দেন নি।

- উল্লেখিত কারণসমূহে যাদের সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ, তাদের সিয়াম ভঙ্গের বিষয়টি প্রকাশ করায় কোনো বাধা নেই। যদি তার স্পষ্ট কারণ থাকে। যেমন অসুস্থ বা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি সিয়ামে অক্ষম।

  পক্ষান্তরে যদি সিয়াম ভঙ্গের কারণ অপ্রকাশ্য বা অস্পষ্ট হয়, যেমন ঋতুবতী মহিলা এবং ওই ব্যক্তি যে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করতে গিয়ে সিয়াম ভঙ্গ করেছে- সে আড়ালে পানাহার করবে। যাতে তার প্রতি কোনো

---

[৯৯] মুসলিম: ১১২০।

অপবাদ না আসে কিংবা কোনো অবুঝ ধোঁকায় পড়ে এ ধারণা না করে যে কোনো কারণ ছাড়াই সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ।

○ আর উপরোক্ত প্রকারসমূহের মধ্য থেকে যার সাওম কাযা করা আবশ্যক, সে যে কদিন সাওম ভাঙ্গবে হিসেব করে তার সাওম কাযা করে নেবে।

* কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ فَعِدَّةٌ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

‘তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪}

* হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পুরো মাসই সাওম ভাঙ্গে তার জন্য পুরো মাসের সবকটা সাওমই রাখতে হবে। যদি ৩০ দিনে মাস হয় তাহলে ৩০টা সাওম রাখবে এবং ২৯ দিনে মাস হলে ২৯টা সাওম রাখবে।

- **আর উত্তম হলো,** উযর শেষ হওয়ামাত্র দ্রুততম সময়ে তার সাওমগুলো কাযা করে নেওয়া। কেননা এতে দ্রুত কল্যাণের দিকে যাওয়া যায় ও যিম্মাদারী থেকে তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়া যায়।

- তবে ছুটে যাওয়া সিয়াম জরুরী উযরসাপেক্ষে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করাও **বৈধ**। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

‘তবে সে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}

সিয়াম কাযার ক্ষেত্রে বিলম্বের বৈধতাই হলো চরম সহজীকরণ। তাই যদি কারও ওপর রমযানের ১০ দিনের সিয়ামের কাযা ফরয হয় তাহলে পরবর্তী রমযান আসার ১০ দিন পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা তার জন্য জায়েয।

- তবে কোনো উযর ছাড়াই দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব **বৈধ নয়**।

* কারণ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন:

«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ »

‘আমার ওপর রমযানের সিয়াম কাযা হয়ে যেতো; কিন্তু আমি শাবান মাস আসার আগ পর্যন্ত কাযা করতে সক্ষম হতাম না।’[100]

* তাছাড়া দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করলে তার দায়িত্বে অনেক সাওম জমা হয়ে যাবে। ফলে কখনো সে তা পালনে অপারগ কিংবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। আর সাওম যেহেতু এমন ইবাদত যা বারবার আসে তাই প্রথমটিকে বিলম্ব করে দ্বিতীয়টির সময় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া জায়েয নয়, যেমন সালাত।

- আর যদি কারও ওযর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকে এবং সে সিয়াম কাযা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার ওপর কিছুই আবশ্যক হবে না। কেননা আল্লাহ তা‘আলা অন্য সময়ে কাযা করাকে আবশ্যক করেছেন যা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই তার থেকে সিয়াম ওই ব্যক্তির মত রহিত হয়ে যাবে যে রমযান মাস আগমনের পূর্বেই মারা গেছে ফলে তার ওপর সিয়াম আবশ্যক হয় নি।
- তবে সে যদি কাযা করতে সক্ষম হয় কিন্তু অলসতা হেতু কাযা না করে মারা যায়, তাহলে যে সকল সিয়ামের কাযা

[১০০] বুখারী: ১৯৫০; মুসলিম: ১১৪৬।

করা মৃত ব্যক্তির সুযোগ ছিল তার উত্তরাধিকারীগণ সে সকল সিয়ামের কাযা করবে।

* কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»

‘যে ব্যক্তি সিয়াম আদায় না করে মারা যাবে তার অলী তথা উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ থেকে সিয়াম আদায় করে নেবে।’[101]

অলী হলো, তার ওয়ারিশগণ অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়বর্গ। আর তাই দিন অনুপাতে (তার অলী বা আত্মীয়বর্গের মধ্য থেকে) একদল লোক একই দিন তার পক্ষ থেকে সিয়াম আদায় করে, তবে তাও বৈধ হবে।

* ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

قَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ

‘হাসান বছরী রহ. বলেছেন, যদি তার পক্ষে থেকে ৩০ জন লোক একদিনেই সিয়াম পালন করে তাহলে তা জায়েয হবে।’[102]

---

১০১ বুখারী: ১৯৫২; মুসলিম: ১১৪৭।

১০২. ফাতহুল বারী: ৪/১৯২। [তবে হানাফী মাযহাবে অলী সিয়াম কাযা করবে না বরং প্রতিদিনের জন্য

যদি তার কোন অলী বা অভিভাবক না থাকে কিংবা অভিভাবক থাকে কিন্তু তারা তার পক্ষ থেকে সাওম রাখতে চায় না, তাহলে ওই ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে কাযা করা সম্ভব ছিল এমন দিনগুলোর সংখ্যা হিসেব করে প্রত্যেক দিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ ভালো গম দেবে, যার ওজন বর্তমানে 'আধা কিলো ও ১০ গ্রাম।'

○ **প্রিয় ভাইয়েরা!** এই হলো সিয়ামের বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। আল্লাহ তা'আলা স্থান ও অবস্থানুযায়ী প্রত্যেক প্রকারের মানুষের সাওমের বিধান কী হবে তা বলে দিয়েছেন। অতএব এ শরীয়তে আপনাদের প্রতিপালকের হিকমত ও প্রজ্ঞা-রহস্য জেনে নিন। আল্লাহ তাঁর শরীয়তকে সহজ করার মাধ্যমে যে নেয়ামত দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় করুন এবং তাঁর কাছে আমরণ এ দীনের ওপর অটল থাকার তাওফীক প্রার্থনা করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের যাবতীয় পাপ, যা আমাদের ও আপনার যিকরের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল তা মোচন করুন, আর আপনার আনুগত্য ও শুকরিয়ায় আমাদের ঘাটতি মার্জনা

কাফফারা হিসেবে মিসকীনকে একদিনের খাবার দেবে। অনুবাদক]

করুন, আপনার পথে অবিরাম অবিচল রাখুন এবং আমাদের সে নূর দান করুন যা দিয়ে আমরা আপনার পথ খুঁজে পাব।

হে আল্লাহ! আপনার মুনাজাতের স্বাদ আমাদের আস্বাদন করান আর আমাদের পরিচালিত করুন আপনাকে সন্তুষ্টকারীদের পথে। হে আল্লাহ! নিজেদের অধঃগমন থেকে আমাদের রক্ষা করুন, নিজেদের অলসতা থেকে জাগিয়ে দিন, আমাদের কল্যাণের পথের সন্ধান দিন এবং আপন কৃপায় আমাদের পথচলাকে সুন্দর করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের শামিল করুন আপনি মুত্তাকীদের কাতারে আর অন্তর্ভুক্ত করুন আপনার নেককার বান্দাদের দলে।

আর আল্লাহ দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর। আমীন।

নবম আসর

সিয়াম পালনের হিকমত বা তাৎপর্যসমূহ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি রাত ও দিনের বিবর্তন ঘটান, মাস ও বছরের আবর্তন ঘটান; যিনি বাদশা, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত; বড়ত্ব, স্থায়ীত্ব ও অমরত্বে অনন্য; যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মানবিক তুলনা থেকে পবিত্র; শিরার ভেতরস্থ ও অস্থির অভ্যন্তরস্থ জিনিসও দেখেন; ক্ষীণস্বর ও সূক্ষ্ম বিষয়াদিও শোনেন; অধিক দাতা দয়ালু ইলাহ্, ক্ষমতাবান ও কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণকারী রব; তিনি সকল বিষয় নির্ধারণ করেন অতঃপর তাকে সর্বোত্তম নিয়মে পরিচালনা করেন; তিনি শরীয়তের বিধানাবলি প্রবর্তন করেছেন অতঃপর তাকে সুপ্রষ্ঠিত ও নিখুঁত করেছেন; তাঁর ক্ষমতায় বাতাস প্রবাহিত হয় এবং মেঘমালা পরিভ্রমণ করে; তারই দয়া ও প্রজ্ঞানুসারে দিন ও রাতের আবর্তন ঘটে। আমি গুণকীর্তন করি তাঁর মহান গুণাবলির ও চমৎকার নেয়ামতরাজির ওপর, আর শুকরিয়া আদায় করি অধিক নেয়ামত প্রার্থনাকারী ও তা লাভ করার ইচ্ছাপোষণকারী ব্যক্তির শুকরিয়া।

আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তাঁকে জ্ঞান বা কল্পনায় বেষ্টন করা সম্ভব নয়। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি শ্রেষ্ঠতম মানব।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর সাথী আবূ বকরের ওপর যিনি ইসলাম গ্রহণে ছিলেন অগ্রগামী, উমরের ওপর যাকে দেখে শয়তান পলায়ন করত, উসমানের ওপর যিনি কঠিন যুদ্ধে (তাবুকের যুদ্ধে) রসদ সরবরাহ করেছেন, আলীর ওপর যিনি বিশাল সাগর ও দুর্বার সিংহের মতো এবং তাঁর সকল পরিবারসদস্য, সাহাবী ও অনাগতকালের সুন্দর আনুসারীদের ওপর।

○ **আল্লাহর বান্দাগণ!** জেনে রাখুন নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ যা সৃজন করেছেন আর যে বিধান প্রবর্তন করেছেন সব কিছুতেই তাঁর পরিপূর্ণ হুকুম ও হিকমত বিদ্যমান। তিনি সৃজন ও বিধান প্রবর্তনে প্রজ্ঞাময়। তিনি তার বান্দাদের খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি, তিনি তাদের অনর্থক ছেড়ে দেন নি এবং শরীয়তকে বেহুদা প্রবর্তন করেন নি। বরং আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বিরাট কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দেবার নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বড় ধরনের কিছু করার জন্য প্রস্তুত করেছেন। তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে সরল-সঠিক পথ

বাৎলে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ইবাদত পূর্ণতা লাভ করে। বান্দাদের জন্য প্রবর্তিত এমন কোনো ইবাদত নেই যার পেছনে পরিপূর্ণ হিকমত নেই। যারা এ হিকমত জানার প্রচেষ্টা করেছে তারা তা জেনেছে আর যারা অজ্ঞ থাকার ইচ্ছা করেছে তারা অজ্ঞ থেকেছে। আমাদের কোনো ইবাদতের হিকমত না জানা তার হিকমত না থাকার প্রমাণ নয়। বরং তা আল্লাহর হিকমতজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতার দলীল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٥ ﴾ [الاسراء: ٨٥]

‘তোমাদেরকে ইলমের সামান্য কিছু দেয়া হয়েছে।’ {সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮৫}

○ আল্লাহ তা‘আলা ইবাদতসমূহ প্রবর্তন করেছেন আর লেনদেন ব্যবস্থাপনা চালু করেছেন তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিপ্রায়ে। যাতে পরিষ্কার হয়ে যায় কে আসল রবের দাসত্ব করে আর কে প্রবৃত্তির।

অতএব যে ব্যক্তি এই শরীয়ত ও বিধিবিধানকে প্রশস্ত বক্ষে ও প্রশান্ত মনে গ্রহণ করেছে সেই তো আসল প্রভুর গোলাম। সে তাঁর শরীয়তে সন্তুষ্ট আর নিজ রবের আনুগত্যকে সে প্রাধান্য দেয় আপন প্রবৃত্তির ওপর।

আর যে নিজ আগ্রহ ও অভিরুচির বাইরে কোনো ইবাদত গ্রহণ করে না এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বা রীতিনীতির অনুসরণ করে না, সে হলো প্রবৃত্তির গোলাম। সে আল্লাহর শরীয়তে অসন্তুষ্ট এবং তার রবের আনুগত্যবিমুখ। সে তার প্রবৃত্তির আনুগত হয়েছে তাকে বানায়নি অনুগত। সে চায় আল্লাহর শরীয়ত তার রুচির অনুকূল হবে, অথচ তার জ্ঞান কতই না অপূর্ণ এবং তার প্রজ্ঞা কতই না স্বল্প। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ بَلۡ أَتَيۡنَٰهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ ٧١﴾ [المؤمنون: ٧١]

'আর যদি হক তাদের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করতো তাহলে অবশ্যই বিশাল আকাশ ও যমীন ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে যেত। বরং আমরা তাদের কাছে তাদের উপদেশ নিয়ে এসেছি, কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' {সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ৭১}

- **আর আল্লাহর হিকমত হলো,** তিনি ইবাদতকে বিভিন্ন ধরনের বানিয়েছেন যাতে ইবাদত (মনেপ্রাণে) গ্রহণ ও এর প্রতি সন্তোষ হওয়া স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [ال عمران: ١٤١]

‘যাতে তিনি ঈমানদারকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করতে পারেন।’ {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪১}

কেননা মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছেন যিনি এ প্রকার ইবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তা পালন করেন অথচ অন্য প্রকার ইবাদতের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন এবং তাতে উদাসীনতা দেখান। তাই আল্লাহ তা‘আলা ইবাদতের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য রেখেছেন:

- কোনো কোনো ইবাদতকে সম্পৃক্ত করেছেন দেহের সঙ্গে, যেমন সালাত।
- কোনো কোনো ইবাদতের সম্পর্ক নফসের প্রিয় সম্পদ ব্যয়ের সঙ্গে, যেমন যাকাত।
- কোনো কোনো ইবাদতে শরীর ও সম্পদ উভয়ই সম্পৃক্ত, যেমন হজ ও জিহাদ।
- কোনো কোনো ইবাদত সম্পৃক্ত লোভনীয় ও প্রিয়বস্তু থেকে নফসকে বিরত রাখার সঙ্গে, যেমন সিয়াম।

সুতরাং আল্লাহর বান্দা যখন বিচিত্র ইবাদত কোনো ধরনের অসন্তুষ্টি ও সীমালংঘন ছাড়াই পরিপূর্ণভাবে পালন করে, এতে করে সে তার রবের আনুগত্যে, তাঁর নির্দেশ পালনার্থে এবং

তাঁর শরীয়তে সন্তুষ্ট হয়ে কষ্ট সহ্য করে, আমল করে, প্রিয় বস্তু ব্যয় করে এবং তার প্রবৃত্তি যা কামনা করে তা থেকে বিরত থাকে। এটা বান্দার পক্ষ থেকে তার রবের প্রতি পরিপূর্ণ দাসত্ব, পূর্ণ আনুগত্য ও ভালোবাসা ও সম্মান করার প্রমাণ বহন করে। এর মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর দাসত্বের গুণ পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়।

উল্লেখিত বিষয়গুলো স্পষ্ট হবার পর জানবার বিষয় হলো, সাওমেরও অনেক হিকমত ও তাৎপর্য রয়েছে যা একে ইসলামের একটি রুকন ও ফরয হওয়া দাবী করে।

সিয়াম ফরয হওয়ার হিকমত ও তাৎপর্য:

সিয়াম পালনের রয়েছে অসংখ্য উপকারিতা ও হিকমত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

○ **প্রথম হিকমত: ঈমানে নিষ্ঠা ও দাসত্বের পূর্ণতা লাভ**

সিয়াম আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম ইবাদত। বান্দা পানাহার, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি লোভনীয় ও প্রিয় বস্তু ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নিকটবর্তী হয়। এর দ্বারা তার ঈমানের সততা, দাসত্বের পূর্ণতা, আল্লাহ তা‘আলাকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসা ও তাঁর কাছে যা কিছু আছে এগুলোর ব্যাপারে

তাঁর ওপর অত্যাধিক নির্ভরতা প্রকাশ পায়। কেননা মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বস্তু ত্যাগ করেনা, যতক্ষণ তার কাছে এর চেয়েও বড় বস্তু না থাকে। যখন মুমিন এটা জানল যে, আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও লোভনীয় কামবৃত্তি ত্যাগ করে সিয়াম পালন করার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত, তখন সে তার প্রবৃত্তির ওপর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়। ফলে অধিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে তা ত্যাগ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্য তা ছেড়ে দেয়ার মাঝে সে আত্মপ্রশান্তি ও স্বাদ অনুভব করে। এজন্যই এমন অনেক মুমিন রয়েছে যদি তাদেরকে বিনা ওজরে রমযানের একটি সিয়াম ভাঙ্গার জন্য প্রহার করা হয় বা বন্দি করা হয়, তবুও সে সিয়াম ত্যাগ করবে না। এটাই হলো সিয়ামের বড় হিকমত।

○ দ্বিতীয় হিকমত: তাকওয়া অর্জন

সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করা যায় এটা সিয়ামের অন্যতম হিকমত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমনি ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের

ওপর, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩}

কারণ, সিয়াম পালনকারীকে ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

* যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ والجهلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

'যে সিয়াম অবস্থায় মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী আমল করা এবং মূর্খতা ত্যাগ করতে পারলো না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'[103]

যখন কোনো ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায় কোনো পাপাচারের ইচ্ছা করে তৎক্ষণাৎ সে যেন স্মরণ করে যে, সে সিয়াম পালনকারী। তাহলে তার জন্য পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ হবে।

* এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়ামরত ব্যক্তিকে এ কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি

[১০৩] বুখারী: ১৯০৩।

কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় তাহলে সে বলে “আমি সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি।” এটা সাওম পালনকারীকে সাবধান করার জন্য যে, তাকে গালি-গালাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, সে সাওম পালনরত অবস্থায় আছে সুতরাং তাকে কটূক্তি ও গালাগালির জবাব প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

○ **তৃতীয় হিকমত: আল্লাহর স্মরণ ও তার সৃষ্টিতে চিন্তার জন্য একান্ত হওয়া।**

এটাও সিয়ামের হিকমত যে, সিয়াম পালনকারীর হৃদয় আল্লাহ তা‘আলার স্মরণ ও ধ্যানে মগ্ন থাকে। কেননা প্রবৃত্তির দাসত্ব ও অধিক ভোজন উদাসীনতাকে অবধারিত করে। আর ক্ষেত্রবিশেষ অন্তরকে কঠোর করে ও চোখকে সত্য দর্শনে অন্ধ বানিয়ে দেয়।

* এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহার কমানোর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন:

«مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ طَعَامٍ، وَثُلُثٌ شَرَابٍ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ»

'আদম সন্তান পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। অথচ আদম সন্তানের জন্য মেরুদণ্ড সোজা থাকে এমন কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট। অগত্যা যদি খেতেই হয়, তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, অপর তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং বাকী তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।'[104]

* সহীহ মুসলিমে এসেছে, হানযালাহ্ আল-উসাইদী রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি ছিলেন ওহী লিখকদের একজন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন বললেন, হানযালাহ মুনাফেকী করেছে। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন:

«وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ «نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّة حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فنَسِينَا كَثِيرًا» ... الحديث

অর্থাৎ হে হানযালা! সেটা কী রকম? তিনি উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার নিকট থাকি আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণ করিয়ে দেন যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখি। অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে

---

[১০৪] আহমাদ ৪/১৩২; নাসাঈ, আল-কুবরা, ৮/৫০৯; তিরমিযী ২৩৮০; ইবন মাজাহ: ৩৩৪৯। মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/১২১। আর যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

বের হয়ে চলে যাই তখন স্ত্রী-সন্তানাদি ও জমি-জমা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি; তখন অনেক কিছু-ই (আখেরাতের কথা) ভুলে যাই।'

এ হাদীসে রয়েছে, "হে হানযালা! এক ঘণ্টা, এক ঘণ্টা ও এক ঘণ্টা।" তিন বার বললেন।"[105]

* আবূ সুলাইমান আদ-দারানী রহ. বলেন-

أن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق وإذا شبعت عمي القلب

"যখন নফস ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকে তখন অন্তর স্বচ্ছ এবং কোমল থাকে। আর যখন খাবারে পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত থাকে তখন অন্তর অন্ধ থাকে।"

○ চতুর্থ হিকমত: ধনী ব্যক্তি কর্তৃক নেয়ামত উপলব্ধি

সিয়ামের অন্যতম একটি হিকমত হলো, এর মাধ্যমে ধনী ব্যক্তি তার প্রতি আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদের মর্যাদা বুঝতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাকে খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রীর মত নেয়ামত প্রদান করেছেন, যা থেকে সৃষ্টি জগতের

---

[১০৫] মুসলিম: ২৭৫০। (অর্থাৎ কিছু সময় আল্লাহর জন্য অবশ্যই থাকবে, হ্যাঁ কিছু সময় তোমার দুনিয়ার জন্যও ব্যয় হবে।) [অনুবাদক]

অনেকেই বঞ্চিত রয়েছে। ফলে সে এসব নেয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে, সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য শুকরিয়া আদায় করে এবং এর মাধ্যমে সে তার ওই সকল ভাইদের কথা স্মরণ করে যারা ক্ষুধার্ত ও অসহায় অবস্থায় রাত যাপন করে। ফলে সে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, যদ্বারা তারা নিজেদের লজ্জা নিবারণ করবে ও ক্ষুধা মিটাবে।

* এজন্যই "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানব সমাজের বড় দানশীল। তিনি আরও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন যখন রমযান আসত আর জিব্রাইল 'আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন ও তাঁর সাথে কুরআন পাঠ করতেন।"[106]

○ **পঞ্চম হিকমত: আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ লাভ**

সিয়ামের অন্যতম হিকমত হলো এর মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুশীলন, তার ওপর কর্তৃত্ব অর্জন এবং তা দমনের মাধ্যম; যাতে করে নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাসহ তাকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করতে পারে। এটা নিশ্চিত যে, নফস মন্দ কাজেরই পথ নির্দেশ করে। তবে আল্লাহ যাকে দয়া করেন সে ব্যতিত। সুতরাং মানুষ যখন আত্মাকে

---

[১০৬] বুখারী: ৬; মুসলিম: ২৩০৮।

লাগামমুক্ত করে দেয়, তখন তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। পক্ষান্তরে যখন সে তার ওপর কর্তৃত্ববান হয় ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন সুউচ্চ স্থানে ও অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।

○ **ষষ্ঠ হিকমত: কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও অহংকার থেকে মুক্তি**

সিয়ামের অন্যতম হিকমত হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় ও অহংকার থেকে মুক্ত করা; যাতে সে সত্যের প্রতি বিনয়ী ও সৃষ্টির প্রতি কোমল হয়। কেননা পরিতৃপ্ত হওয়া, আনন্দ উল্লাস করা ও নারীর সঙ্গে অধিক মেলামেশা করা, এর প্রত্যেকটিই মানুষদেরকে মন্দ, গর্ব, অহংকার, সৃষ্টির উপর দাম্ভিকতা ও হক গ্রহণ না করার দিকে ধাবিত করে। কেননা নফস যখন মনে করে যে তার এগুলো প্রয়োজন তখন সে এগুলো অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর সে যখন সেটা অর্জনে সমর্থ হয় তখন সে মনে করে যে সে কাঙ্খিত বস্তু পেয়ে গেছে, ফলে সে গর্হিত আনন্দ পায় ও তা নিয়ে অহংকার করে, যা পরবর্তীতে তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থা থেকে সে-ই নিরাপদ থাকতে পারে, আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন।

○ **সপ্তম হিকমত: রক্ত চলাচলের পথ সংকুচিত হওয়া**

সিয়ামের আরও হিকমত হলো, ক্ষুধা তৃষ্ণার কারণে মানুষের রক্ত চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে দেহের অভ্যন্তরে শয়তানের চলাচলের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়।

* কেননা "শয়তান আদম সন্তানের রক্তের সঙ্গে শিরা উপশিরা দিয়ে চলাচল করে।" যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ »

'নিশ্চয় শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় বিচরণ করে।'[107]

মূলত সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকে এবং ক্রোধ ও কামপ্রবৃত্তির উন্মত্ততা হ্রাস পায়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

«يا مَعْشَرَ الشَّبَاب! مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে, ব্যক্তি বিবাহ করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি অবনত রাখে

---

১০৭ বুখারী: ২০২৩; মুসলিম: ২১৭৫।

ও লজ্জাস্থান হেফাজত করে। আর যে বিবাহ করতে সক্ষম নয়, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা সিয়াম তাকে কামভাব থেকে বিরত রাখবে।'[108]

○ **অষ্টম হিকমত: বহুবিধ স্বাস্থ্যগত উপকার**

সিয়ামের আরও একটি হিকমত হলো এর দ্বারা বহুবিধ স্বাস্থ্যগত উপকার হয়, যা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিপাকতন্ত্রের বিশ্রাম দানের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং শরীরের অন্যান্য বাড়তি ক্ষতিকর বস্তু ও জলীয় পদার্থ হ্রাস করে।

আহ সিয়াম সাধনার মাঝে আল্লাহ তা'আলার কত মহান ও চমৎকার হিকমত বিদ্যমান! আর তাঁর বিধি-বিধান সৃষ্টিকূলের জন্য কতই না উপযোগী, উপকারী এবং বাস্তবসম্মত।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দীনের গভীর প্রজ্ঞা ও শরীয়তের রহস্যাবলির জ্ঞান দান করুন। দ্বীন- দুনিয়ার যাবতীয় কাজ বিশুদ্ধ করে দিন। হে দয়াময়! স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতাকে ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন।

---

[১০৮] বুখারী: ১৯০৫, ৪০৬৬; মুসলিম: ১৪০০।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

দশম আসর

সিয়াম পালনের ফরয আদবসমূহ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টি তথা মানুষকে পূর্ণতর শিষ্টাচারের দিয়েছেন দিক-নির্দেশনা, তাদের জন্য নিজ দয়া ও দানের সর্বপ্রকার ভাণ্ডার করেছেন উন্মুক্ত, মুমিনদের দৃষ্টিকে করেছেন আলোকিত ফলে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে গূঢ় বাস্তবতা এবং তালাশ করেছে সাওয়াব, তাঁর আনুগত্য উপেক্ষাকারীদের দৃষ্টিকে করে দিয়েছেন অন্ধ ফলে তাদের ও তাঁর নূরের মাঝে পড়ে গেছে পর্দা। তিনি নিজ হিকমত ও ইনসাফ অনুযায়ী তাদের দিয়েছেন হেদায়াত, আর অন্যদের করেছেন পথভ্রষ্ট। নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ।

আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, তিনি প্রবল-পরাক্রমশালী ও মহাদাতা। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি উৎকৃষ্টতম ইবাদত ও পূর্ণতর শিষ্টাচার নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ সালাত বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর সকল পরিবার-পরিজন ও সাহাবীর ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উত্তমরূপে অনুসরণকারীদের ওপর। আর তিনি যথার্থ সালামও পেশ করুন।

○ **আমার ভাইয়েরা!** জেনে রাখুন, সিয়ামের অনেক আদব বা পালনীয় বিষয় রয়েছে যা ছাড়া সিয়াম পূর্ণতা পায় না এবং যা যথাযথভাবে সম্পন্ন না করা হলে সিয়ামের উৎকর্ষ সাধন হয় না।

আর তা দুই প্রকার:

১- প্রথম প্রকার: ফরয করণীয়সমূহ, যা প্রতিটি সাওম পালনকারীকেই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয় এবং সেগুলোর প্রতি যথাযথ যত্নবান থাকতেই হয়।

২- দ্বিতীয় প্রকার: মুস্তাহাব করণীয়সমূহ, আর তা এমন কিছু মুস্তাহাব আদব; সাওম পালনকারীকে সেগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া ও লক্ষ্য রাখা উচিত।

- **ওয়াজিব আদবসমূহের মধ্যে রয়েছে:** আল্লাহ তা‘আলা সিয়াম পালনকারীর ওপর যেসব মৌখিক ও কায়িক ইবাদত আবশ্যক করেছেন তা বাস্তবায়ন করা।

○ **এসব ইবাদতের মধ্যে ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ফরয সালাত।** সালাত ইসলামের অন্যতম রুকন। সালাতের শর্ত, রুকন ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করে নিয়মিত সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার যত্ন নেয়া এবং সময়মত জামাতের সঙ্গে মসজিদে গিয়ে আদায় করা। কেননা এটা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা অর্জনের জন্য সিয়ামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে এবং উম্মতের জন্য ফরয করা হয়েছে। আর সালাত পরিত্যাগ করা তাকওয়ার পরিপন্থী এবং শাস্তির আবশ্যককারী।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿۞فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا ٦٠﴾ [مريم: ٥٩، ٦٠]

'তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলম করা হবে না।' {সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯-৬০}

- সাওম পালনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ তার উপর জামায়াতে সালাত আদায় ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও তাতে

অবহেলা করে। অথচ আল্লাহ তাঁর কিতাবে জামাতে সালাতের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

* তিনি বলেছেন:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ ﴾ [النساء: ١٠٢]

'(হে রাসূল) যখন আপনি তাদের মাঝে (যুদ্ধক্ষেত্রে) থাকেন তারপর তাদের নিয়ে সালাত কায়েম করেন তাহলে তাদের একটি দল যেন আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের যুদ্ধের অস্ত্রাদি সঙ্গে রাখে। আর যখন তারা সিজদা করে - তাদের সালাতের প্রথম রাকাত সম্পন্ন করে- তখন যেন পিছনে চলে যায় এবং যেন আবার ২য় দলটি আগমন করে যারা সালাত আদায় করে নি। অতঃপর তারা যেন আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করে এবং তাদের সতর্কতা অবলম্বন করে এবং যুদ্ধের অস্ত্রাদি সঙ্গে রাখে।' {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৬}

দেখুন, যুদ্ধ চলাকালে এবং ভীতিকর মুহূর্তেও আল্লাহ জামাতের সঙ্গে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন! তাহলে নিরাপদ ও শান্ত অবস্থায় এর গুরুত্ব কত বেশি!

* জামা‘আতে সালাত আদায় করা সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

«أن رَجُلاً أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ»

‘একজন অন্ধলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মসজিদে নিয়ে আসার মত কোনো লোক নেই। এ কথা শুনে তিনি তাকে জামা‘আতে না আসার অনুমতি প্রদান করলেন। অতঃপর লোকটি যখন পিছন ফিরে চলে যাচ্ছিল তখন তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি কি আজান শুনতে পাও? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমাকে আযানের ডাকে সাড়া দিতে হবে অর্থাৎ জামায়াতে আসতে হবে।’[109]

---

১০৯ মুসলিম: ৬৫৩।

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে জামাত পরিত্যাগ করার অনুমতি দেন নি, যদিও লোকটি ছিল অন্ধ আর তার কোনো পরিচালক ছিল না।

আর জামাত ত্যাগকারী শুধু ওয়াজিবই বাদ দেন না, বহুগুণ সাওয়াবসহ অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হন। কারণ জামাতে সালাতের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

* যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلي صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

'জামাতে সালাত আদায় করা একাকী সালাতের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে।'[110]

আর সে নানা সামাজিক কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হয়, যা মুসলিমগণ একসঙ্গে হবার মাধ্যমে অর্জন করে থাকেন। যেমন সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন, অজ্ঞকে শিক্ষা দেয়া এবং অভাবীকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

---

[১১০] বুখারী: ৬৪৫; মুসলিম: ৬৫০।

তেমনি সালাতের জামাত ত্যাগের কারণে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয় এবং মুনাফিকদের সঙ্গেও সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। যেমন,

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَثْقَلَ صَلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»

‘মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন সালাত হলো ফজর ও এশার সালাত। তারা যদি জানতো এ দু’ সালাতের মধ্যে কী ফযীলত রয়েছে তাহলে অবশ্যই হামাগুড়ি দিয়ে উপস্থিত হতো। আর আমার মনে চায় যে, আমি সালাতের জন্য নির্দেশ দেই। তারপর সালাতের ইকামত দেয়া হবে। অতঃপর আমি একজন লোককে নির্দেশ দেই সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আর আমি লাকড়ি হাতে কিছু লোক নিয়ে ওইসব লোকের কাছে যাবো যারা সালাতের জামাতে হাযির

হয় না। এরপর আমি তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।’[111]

* সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ»

‘যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, আগামীকাল তথা মৃত্যুর পর আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হিসেবে সাক্ষাত করবে তার উচিত সে যেন এ সালাতসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হয়; যখনই এগুলোর জন্য ডাকা হয়। কারণ, আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য হেদায়াতের রীতিনীতি প্রবর্তন করেছেন। আর এ সালাতগুলো সে হেদায়াতের নীতিসমূহের মধ্যে অন্যতম।’ বর্ণনাকারী বলেন, ‘আমরা আমাদেরকে দেখেছি এরকম যে, স্পষ্ট কপটতা আছে এমন মুনাফিক ছাড়া কেউ সালাতের জামাত থেকে পিছপা হতো না। এমনকি তখনকার সময় কোনো

[১১১] বুখারী: ৬৫৭; মুসলিম: ৬৫১।

কোনো মানুষকে দু'জনের কাঁধে ভর করে জামাতে উপস্থিত করা হতো এবং তাকে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো।'[112]

- কোনো কোনো সাওম পালনকারী আছে যারা আরও সীমালঙ্ঘন করে থাকে, তারা সময়মত সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে। এটা সবচে নিন্দিত কাজ এবং সালাত বিনষ্টের সবচে ঘৃণিত রূপ।

  এমনকি বহু আলেম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি শরয়ী কোনো ওযর ব্যতিরেকে সালাতকে তার সময় থেকে বিলম্ব করবে তার সালাত ১০০ বার পড়লেও গ্রহণযোগ্য হবে না।'[113]

* কেননা নবী সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যে আমল আমাদের আমল নয় (যে আমলের সঙ্গে আমাদের আমলের কোনো মিল নেই), সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে।'[114]

---

[১১২] মুসলিম: ৬৫৪।

[১১৩] ইবনুল কাইয়িম, আস-সালাত ওয়া হুকমু তারিকিহা, পৃ. ৭৩/৭৬।

[১১৪] মুসলিম: ১৭১৮।

আর সময়মত সালাত আদায় না করে দেরী করে আদায় করা নবী সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এমনটি করবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে, গ্রহণযোগ্য হবে না।

- **সিয়ামের অন্যতম ওয়াজিব আদব হচ্ছে:** আল্লাহ যে সকল কথা ও কাজ হারাম করেছেন সাওম পালনকারী তা থেকে বেঁচে থাকবে। যেমন:

○ **মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবে:**

আর মিথ্যা হলো বাস্তবতার বিপরীত কথা বলা। সবচেয়ে নিকৃষ্টতম মিথ্যা হলো আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা বলা যেমন, কোনো হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বলার বিষয়টিকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলা।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ١١٦ مَتَٰعٞ قَلِيلٞ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١١٧﴾ [النحل: ١١٦، ١١٧]

‘আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তোমাদের জিহ্বা যেন এ কথা না বলে এটা হালাল এবং এটা হারাম। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তারা সফলকাম হবে না। তাদের

সুখ সম্ভোগ ক্ষণিকের জন্য। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত: **১১৬-১১৭**}

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আবূ হুরাইরা ও অন্যান্য রাবী থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»

“যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা বললো সে যেন তার স্থানকে জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল।”[115]

* তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা থেকে সতর্ক করে বলেছেন:

«وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا»

‘তোমরা মিথ্যা পরিহার কর। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। কোনো লোক সর্বদা মিথ্যা কথা বলতে থাকলে ও এতে প্রচেষ্টা

[১১৫] বুখারী: ১০৭।

চালাতে থাকলে তার নাম আল্লাহ তা‘আলার কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।’[116]

○ **গীবত থেকে বেঁচে থাকবে:**

গীবত হচ্ছে, কোনো মুসলিম ভাইয়ের অগোচরে তার ব্যাপারে এমন আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। চাই এটা তার শারীরিক ত্রুটি-বিচ্যুতিই হোক না কেন। যেমন কাউকে নিন্দা ও দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে ল্যাংড়া, ট্যারা বা অন্ধ বলা। তেমনি কারো চারিত্রিক ত্রুটি তুলে ধরা যা সে অপছন্দ করে, যেমন বোকা, নির্বোধ, ফাসেক ইত্যাদি। বাস্তবে ওই লোকের মধ্যে এ সকল দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।

* কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

«ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

‘এটা হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের

---

[১১৬] বুখারী: ৬০৯৪; মুসলিম: ২৬০৭।

মধ্যে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি গীবত করলে, আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।’[117]

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে গীবত করতে নিষেধ করেছেন ও একে নিকৃষ্ট বস্তু তথা আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ﴾ [الحجرات: ١٢]

‘আর তোমরা কারো গীবত করো না, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা এটাকে ঘৃণাই কর।’ {সূরা আল-হুজুরাত: ১২}

* অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে,

---

১১৭ মুসলিম: ২৫৮৯।

«أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

'তিনি মেরাজের রাত্রে কোনো এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের পিতলের নখ রয়েছে তারা এগুলো দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষে আঘাত করছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিব্রাইল এরা কারা? জিব্রাঈল উত্তরে বললেন, এরা ওই সমস্ত লোক যারা পৃথিবীতে মানুষের গোশত খেতো এবং মানুষের সম্মানহানি ঘটাতো।'[118]

○ **নামীমা বা চুগলখোরী থেকে বেঁচে থাকবে:**
নামীমা বা চুগলখোরী হচ্ছে, পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো কথা বললে অপর ব্যক্তির কাছে তা ফেরি করে বেড়ানো। এটি অন্যতম কবিরা গুনাহ।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেন:

---

১১৮ আবু দাউদ: ৪৮৭৮; মুসনাদে আহমাদ ৩/২২৪।

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ»

‘চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’[119]

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنزه مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»

‘নবী সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা দুটি কবরের পাশে দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারপর বললেন, দুটো কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। অবশ্য বিরাট কোনো কঠিন কাজের জন্য তাদের শাস্তি হচ্ছে না। (অর্থাৎ যা থেকে বেঁচে থাকা কোনো কঠিন বিষয় ছিল না) তাদের একজন প্রস্রাব করে পবিত্রতা অর্জন করতো না। অপরজন মানুষের মধ্যে চুগলখোরি করে বেড়াত।’[120]

---

[১১৯] মুসলিম: ১০৫।

[১২০] বুখারী: ১৩৭৮; মুসলিম: ২৯২।

বস্তুত: নামীমা বা চুগলখোরি ব্যক্তি, সমাজ ও মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে শত্রুতার আগুন লাগিয়ে দেওয়া।

﴿ وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۢ بِنَمِيمٖ ١١ ﴾ [القلم: ١٠، ١١]

‘আর তুমি আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক কসমকারী, লাঞ্ছিত। পিছনে নিন্দাকারী ও যে চুগলখোরী করে বেড়ায়।’ {সূরা আল-কালাম, আয়াত: ১০-১১}

সুতরাং যে আপনার কাছে অপরের নিন্দা ও চুগলখোরি করে সে আপনার ব্যাপারেও চুগলখোরি করে বেড়ায়। সুতরাং তার থেকে সতর্ক থাকুন।

○ **সকল প্রকার প্রতারণা ও ধোঁকা প্রদান থেকে বেঁচে থাকতে হবে:**

সিয়ামপালনকারী ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, শিল্প, বন্ধক ও অন্যান্য যাবতীয় লেনদেনের মধ্যে প্রতারণা থেকে বিরত থাকবে। অনুরূপভাবে সব ধরনের উপদেশ ও পরামর্শের ক্ষেত্রেও প্রতারণা পরিহার করবে। কেননা ‘প্রতারণা একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ».

‘যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’[121]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

« مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى ».

‘যে প্রতারণা করে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।’[122]

হাদীসে উল্লেখিত ‘আল-গিশ’ শব্দের অর্থ ধোঁকা দেয়া, খেয়ানত, আমানত বিনষ্ট করা, মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলা। আর প্রতারণার মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তা নিকৃষ্ট, হারাম ও ঘৃণ্য। প্রতারণা দ্বারা প্রতারক ও আল্লাহর মাঝে কেবলমাত্র দূরত্বই বৃদ্ধি পায়।

○ **সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র থেকে বেঁচে থাকা:**

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র থেকে দূরে থাকা উচিত। যেমন- বীণা, একতারা, বেহালা, হারমোনিয়াম, গিটার, পিয়ানো, ঢোল-তবলা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। কেননা এসব হারাম। এগুলোর হারাম ও

---

[১২১] মুসলিম: ১০১।

[১২২] মুসলিম: ১০২।

গুনাহ আরও বৃদ্ধি পায় যখন এর সাথে মিলিত হয় উত্তেজনামূলক গান ও মিষ্টি আওয়াজ।

* আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦ ﴾ [لقمان: ٦]

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য গান বাদ্যের উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় করে এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর কঠোর শাস্তি।' {সূরা লুকমান, আয়াত: ৬}

* আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহুকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

«والله الذي لا إله غيرهُ هو الغناء»

'যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটা হচ্ছে গান'[123]।

[১২৩] ইবন জারীর তাবারী ২১/৬২; মুস্তাদরাকে হাকিম ২/৪১১; হাসান সনদে।

* অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস, ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এ তাফসীর সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া 'আল্লামা ইবন কাসীর এ তাফসীরটি জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইকরিমা, সা'ঈদ ইবন জুবাইর ও মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ থেকেও উল্লেখ করেছেন[124]।

* হাসান বসরী রহ. বলেন, 'এ আয়াতটি গান ও বাদ্যের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।'[125]

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদ্যযন্ত্র থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি এসবকে যেনা-ব্যভিচারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

« لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » .

'আমার উম্মতে এমন একদল লোক হবে যারা যেনা-ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।'[126]

---

[১২৪] আব্দুল্লাহ ইউসুফ আল-জুদাই' এর 'আহাদীস যাম্মিল গিনা ওয়াল মা'আযিফ ফিল মীযান' গ্রন্থখানিতে এ সব বাণী ও সেগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পৃ. ১৪৮-১৫৪।

[১২৫] এ আয়াতের উপর আরও ব্যাখ্যা দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম এর 'ইগাসাতুল লাহফান' গ্রন্থে (১/৩৩৮-৩৪১)।

[১২৬] বুখারী: ৫৫৯০।

হাদীসে বর্ণিত ‘الْحِرَ’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, লজ্জাস্থান, যার দ্বারা যেনা-ব্যভিচার বুঝানো হয়েছে। আর ‘يَسْتَحِلُّونَ’ এর অর্থ হচ্ছে এমনভাবে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে করা যেমন হালাল মনে কেউ কোনো কাজ করে থাকে।

বর্তমান সময়ে এমন মানুষ রয়েছে যারা এসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে অথবা সেগুলো এমনভাবে শ্রবণ করে থাকে যেন এগুলো হালাল জিনিস।

এটা এমন এক ষড়যন্ত্র যা দ্বারা ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদেরকে ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করতে সফলতা লাভ করেছে। এতে করে তারা মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা‘আলার যিকর-স্মরণ, তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মুসলিমদের অনেকেই কুরআন ও হাদীসের পাঠ, ধর্মবেত্তাগণের শরীয়ত ও হিকমত সমৃদ্ধ বয়ানের চেয়েও এগুলোর প্রতি বেশী এসব গান ও বাদ্যযন্ত্রে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

হে মুসলিমগণ! আপনারা সিয়াম বিনষ্টকারী ও তাতে ত্রুটি সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং মিথ্যা

বলা ও তদানুযায়ী কাজ ত্যাগ করে সিয়ামের হক আদায় করুন।

* নবী সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والجهلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যার মাধ্যমে আমল করা ও মূর্খতা পরিত্যাগ করতে পারেনি, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'[127]

জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«إِذَا صُمتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة ولايكن يوم صومك ويوم فطرك سواء»

'যখন তুমি সাওম রাখবে তোমার কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বাও যেন মিথ্যা কথা ও সব হারাম বর্জনের মাধ্যমে সাওম পালন করে। তুমি প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকো। অবশ্যই

[১২৭] বুখারী: ১৯০৩।

তুমি আত্মসম্মান ও প্রশান্তভাব বজায় রাখবে। আর তোমার সাওমের দিন ও সাওমবিহীন দিন যেন সমান না হয়।'[128]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আমাদের দীন রক্ষা করুন, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে আপনাকে অসন্তুষ্টকারী বিষয়াদি থেকে বিরত রাখুন, আমাদেরকে এবং আমাদের বাবা-মা ও সকল মুসলিমকে আপনার দয়ায় ক্ষমা করুন হে জগতের শ্রেষ্ঠ করুণাময়। আর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

---

[১২৮] ইবন রজব, লাতায়েফুল মা'আরিফ, পৃ. ২৯২।

একাদশ আসর

সিয়ামের মুস্তাহাব আদবসমূহ

সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি প্রত্যাশাকারীকে প্রত্যাশার ওপরে পৌঁছান এবং প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনার বেশি দেন। আমি তাঁর গুণকীর্তন করি হেদায়াত দান ও তা অর্জনের জন্য। আর আমি প্রমাণ ও মূলনীতিসহ জেনে তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি দেই।

সালাত ও সালাম বর্ষণ হতে থাক যতদিন পুব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে বাতাসের প্রবাহ অব্যাহত থাকবে তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মদের ওপর; তাঁর সাথী আবূ বকরের ওপর যিনি সফর ও স্থায়ী সর্বাবস্থায় ছিলেন তাঁর পাশে; উমরের ওপর যিনি এমন নির্ভীকতার সঙ্গে ইসলামের সাহায্য করেছেন যে কোনো খানাখন্দ বা পতনকে ভয় পাননি; উসমানের ওপর যিনি ছিলেন বিপদে অনঢ় ধৈর্যশীল; আলী ইবন আবী তালিবের ওপর যিনি আপন বীরত্ব দিয়ে শত্রুদের সন্ত্রস্ত করেছেন হামলার আগেই এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজন ও সাহাবীর

ওপর যারা দীনের মূল ও শাখাগত বিষয়াদিতে প্রতিযোগিতায় অন্যদের হাত থেকে বিজয়টোপর ছিনিয়ে নিয়েছেন।

○ **প্রিয় ভাইয়েরা আমার!** এ আসরটি সিয়ামের আদবের দ্বিতীয় প্রকার তথা মুস্তাহাব আদব প্রসঙ্গে। সিয়ামের মুস্তাহাব আদবসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- **সাহরী খাওয়া:**

সাহরী বলা হয়, রাতের শেষাংশের খাওয়াকে। একে সাহরী বলার কারণ হচ্ছে এ খাবারটি 'সাহর' তথা রাতের শেষাংশে অনুষ্ঠিত হয়।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»

'তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীতে বরকত নিহিত রয়েছে।'[129]

* সহীহ মুসলিমে 'আমর ইবন 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[১২৯] বুখারী: ১৯২৩; মুসলিম: ১০৯৫।

«فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ»

‘আমাদের ও আহলে কিতাবদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।’[130]

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর দিয়ে সাহরী গ্রহণের প্রশংসা করে বলেছেন:

«نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ»

‘মুমিনদের খেজুর দিয়ে সাহরী গ্রহণ কতই না উত্তম।’[131]

* রাসূল সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

«السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ»

‘সাহরী খাওয়া বরকতপূর্ণ। সুতরাং সাহরী পরিত্যাগ করো না, যদিও এক ঢোক পানি পান করে হয়। কারণ আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ সাহরী ভক্ষণকারীর ওপর সালাত পেশ করেন।’[132]

---

১৩০ মুসলিম: ১০৯৬।

১৩১ আবু দাঊদ: ২৩৪৫।

১৩২ আহমদ: ৩/১২।

* **সাহরী ভক্ষণকারী ব্যক্তির উচিত,** সাহরী খাওয়ার ব্যাপারে নিয়ত করে যে, নবী সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালন এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণে তা গ্রহণ করছে; যাতে তার সাহরী হয় ইবাদত। তাছাড়া আরও নিয়ত করবে যে, সাহরী খাওয়ার মাধ্যমে সে সাওম পালনে সামর্থ্য হবে; যাতে করে এর দ্বারা সাওয়াব অর্জিত হয়।

* **সুন্নাত হচ্ছে** সুবহে সাদিক উদয়ের আগ পর্যন্ত বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন।

* কাতাদা রহ. আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: «تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى»، قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً»

‘আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যায়েদ ইবন সাবেত সাহরী গ্রহণ করলেন। যখন সাহরী গ্রহণ করা শেষ করার পর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, ‘সালাতের দিকে’ (চল)। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। আমরা আনাসকে বললাম, তাঁদের সাহরী শেষ করা ও সালাতে প্রবেশ করার মধ্যে কত সময় ছিল? তিনি বললেন, ‘একজন লোক পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মত সময়’।[133]

* ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাত থাকতেই আযান দিতেন; তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»

‘আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা সে সুবহে সাদিক উদয়ের পরই আযান দেয়।’[134]

* **বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া** সিয়াম পালনকারীর জন্য অধিক উপকারী ও ফজরের সালাত আদায় করার পূর্বে ঘুমিয়ে যাওয়া থেকে অধিক নিরাপদ। সাহরী খাওয়া ও সাওমের নিয়ত

---

[১৩৩] বুখারী: ১৩৩৪।

[১৩৪] বুখারী: ১৯১৮।

করার পরও দৃঢ়ভাবে সুবহে সাদিকের সময় প্রবেশ করা পর্যন্ত সাওম পালনকারীর জন্য পানাহার করার অধিকার রয়েছে।

* কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة: ١٨٧]

"আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কালোরেখা থেকে ঊষার সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়"। [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৭]

* **আর সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হবে:** সরাসরি আকাশের প্রান্তদেশ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে অথবা নির্ভরযোগ্য সংবাদের মাধ্যমে যেমন আযান ইত্যাদি দ্বারা। অতঃপর যখন সুবহে সাদিক উদিত হবে তখনই (পানাহার ইত্যাদি থেকে) বিরত থাকবে, আর মনে মনে নিয়ত করবে, তবে কোনোভাবেই মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা যাবে না; কারণ নিয়ত উচ্চারণ করা বিদ'আত।

- **সিয়ামের মুস্তাহাব আদবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ইফতার করা:**

প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অথবা আযান বা অনুরূপ নির্ভরযোগ্য সংবাদের মাধ্যমে সূর্যাস্তের বিষয়ে প্রবল ধারণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার করা।

* সাহ্ল ইবন সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»

'মানুষ যতক্ষণ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে।'[135]

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

«إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا».

'তারা আমার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা, যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে।'[136]

* **আর সুন্নাত হচ্ছে, কাঁচা খেজুর দ্বারা ইফতার করা। কাঁচা খেজুর না পাওয়া গেলে শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করবে।**

---

১৩৫ বুখারী: ১৯৫৭; মুসলিম: ১০৯৮।

১৩৬ আহমদ:২/৩২৯; নং ৮৩৬০; তিরমিযি: ৭০০। (হাসান হাদীস)

আর যদি তাও না পাওয়া যায় তাহলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কারণ, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন -

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ تمرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»

"নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব নামায আদায়ের পূর্বে কিছু কাঁচা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না থাকতো তাহলে শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি শুকনো খেজুর না থাকতো তাহলে কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।"[137]

যদি কোনো কাঁচা খেজুর, শুকনো খেজুর ও পানি না পাওয়া যায় তাহলে হালাল খাদ্য ও পানীয় যা সহজে মিলে তা দ্বারা-ই ইফতার করবে। যদি কোনো কিছুই না পাওয়া যায় তাহলে অন্তরে ইফতারের নিয়ত করবে।

তবে তার আঙ্গুল চুষবে না এবং মুখে লালা জমা করে গিলে ফেলবে না। যেমনটি কোনো কোনো সাধারণ লোকেরা করে থাকে!!

---

[১৩৭] আহমাদ ৩/১৬৪; আবু দাউদ: ২৩৫৬; তিরমিযী: ৬৯৬।

*** ইফতারের সময় পছন্দনীয় দো‘আ করা উচিত:**

* কেননা সুনান ইবন মাজায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

«إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مَا تُرَدُّ»

‘নিশ্চয়ই ইফতারের সময় সিয়াম পালনকারীর একটি দো‘আ রয়েছে যা ফেরত দেওয়া হয় না।’[138]

* অনুরূপ আবু দাউদ মু‘আয ইবন যাহরা থেকে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করার সময় এই দো‘আ পড়তেন:

«اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ»

‘হে আল্লাহ! আমি আপনারই জন্য সিয়াম পালন করলাম ও আপনার দেয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করলাম।’[139]

* আবু দাউদ অনুরূপভাবে ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করার সময় বলতেন:

---

[১৩৮] ইবন মাজাহ: ১৭৫৩। যদিও যাওয়ায়েদে হাদীসের সূত্রকে সহীহ বলা হয়েছে। তবুও সনদটি দুর্বল।

[১৩৯] আবু দাউদ: ২৩৫৮। তবে এর সনদ দুর্বল।

«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

‘পিপাসা দূর হলো, শিরা-উপশিরা সতেজ হলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিদান প্রতিষ্ঠিত হলো।’[140]

- **সিয়ামের মুস্তাহাব আদবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,** বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির করা, দো‘আ করা, সালাত আদায় করা ও দান-সাদকা করা।

* হাদীসে এসেছে,

«ذَاكِرُ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ مَغْفُورٌ لَهُ»

“রমযানে যে আল্লাহর যিকির করবে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।”[141]

* অনুরূপভাবে সহীহ ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান গ্রন্থে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»

“তিন ব্যক্তির দো‘আ ফেরত দেওয়া হয় না। (১) রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করা পর্যন্ত, (২) ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা রাষ্ট্রপতি,

---

[১৪০] আবু দাউদ: ২৩৫৭।

[১৪১] হাদীসটি মু‘জামুল আওসাত্ব লিত তাবারানীতে সংকলিত হয়েছে। এর সনদ দুর্বল। দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৩/১৪৩।

(৩) মযলুম ব্যক্তির দো‘আ। তার দো‘আ আল্লাহ আকাশে মেঘমালার উপরে তুলে নেন এবং এর জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং মহান রব বলেন, আমার ইয্যত ও মাহাত্ম্যের কসম করে বলছি, অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করবো, কিছু সময় পর হলেও।”[142]

* **তাছাড়া বুখারী ও মুসলিমে** ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে বেশি দানশীল ছিলেন। আর রমযান মাসে তিনি আরো বেশি দানশীল হয়ে যেতেন; যখন জিব্রাইল (‘আলাইহিস সালাম) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। জিব্রাইল রমযানের প্রতি রাতে তার সাথে সাক্ষাত করে পরস্পরে কুরআন পড়তেন, তখন তিনি প্রবাহিত বায়ুর চেয়েও অধিক হারে দান করতেন।’[143]

---

[১৪২] আহমাদ ২/৩০৫; তিরমিযী: ৩৫৯৮। (হাসান সনদে)

[১৪৩] বুখারী: ৬; মুসলিম: ৫০।

* আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান ছিল সার্বিক ও সবধরণের। যেমন আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করা ও আল্লাহর বান্দাদের পথপ্রদর্শনের জন্য জ্ঞান, জান ও মাল ব্যয় করা। অনুরূপভাবে আল্লাহর বান্দাদের কাছে সব রকমের কল্যাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য যত পথ ও পদ্ধতি রয়েছে সবই তিনি অবলম্বন করতেন, যেমন মূর্খদের জ্ঞানদান, তাদের অভাব-অভিযোগ পূরণ, তাদের মধ্যকার ক্ষুধার্তদের আহার প্রদান। আর তাঁর দান রমযানে বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, সময়ের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা, সওয়াবের পরিমানে বর্ধিত হওয়া। তাছাড়া ইবাদতকারীদের ইবাদতে সহযোগিতা করাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এভাবে তিনি সাওম ও খাবার খাওয়ানো এ দু’টি কাজকে একসাথে করতেন, এ দুটো কাজই জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম।[144]

* অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেনঃ

---

[১৪৪] দেখুন, ইবন রাজাব, লাতায়েফুল মা‘আরিফ পৃ. ৩০৬।

«مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"তোমাদের মধ্যে কে আজ সাওম অবস্থায় প্রত্যুষে উপনীত হয়েছ? আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি। রাসূল বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযার সালাতে শরীক হয়ে জানাযার পিছু নিয়েছো? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, আমি। রাসূল বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ একজন মিসকীনকে খাইয়েছ? আবু বকর বললেন, আমি। রাসূল বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ একজন রোগীর সেবা করেছ? আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ্ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণ গুলো মিলিত হয়েছে সে অবশ্য-ই জান্নাতে যাবে।"[145]

১৪৫ মুসলিম: ১০২৮।

- **সিয়ামের মুস্তাহাব আদবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা অন্তরে সদা জাগরুক রাখা।**

সিয়ামের মুস্তাহাব আদবসমূহের অন্যতম হলো, সিয়াম পালনকারী সিয়াম পালনের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের কথা সর্বদা স্মরণ করবে; যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাকে সিয়াম পালনের তাওফীক দিয়েছেন, তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন, ফলে সে এ দিনের সিয়াম পূর্ণ করতে পেরেছে, এ মাসের সিয়াম পুরোপুরিভাবে আদয় করতে পেরেছে। কারণ, এমন অনেক লোক রয়েছে যারা সিয়াম পালনের নে'আমত থেকে মাহরূম হয়েছে, তাদের কেউ কেউ প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পূর্বে মারা গেছে, আবার কেউ ছিল সিয়াম পালনে অক্ষম, আবার তাদের কেউ পথভ্রষ্টতা ও দ্বীন বিমুখিতার ফলে সিয়াম পালন করতে পারেনি।

তাই সিয়াম পালনকারীর উচিত হলো এ নেয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা; যা গোনাহের ক্ষমা, মন্দ-পাপাচার থেকে মুক্তি, স্থায়ী নে'আমতপূর্ণ দারুন না'ঈম জান্নাতে মহান সম্মানিত রবের পাশে থাকার মত সুউচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম।

○ **ভাইয়েরা আমার!** সিয়ামের আদবগুলো রক্ষা করুন। আর (আল্লাহর) গযব (ক্রোধ) ও শাস্তির কারণগুলো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখুন। সালাফে সালেহীন তথা সৎকর্মশীল পূর্বসুরীদের গুণে গুণান্বিত হোন, কেননা পূর্ববর্তীরা যেভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং পাপাচার থেকে বিরত থেকে সংশোধিত হয়েছিলেন, শেষ যামানার উম্মতদেরও সে একই পদ্ধতিতে সংশোধিত হতে হবে।

*** ইবন রজব রহ. বলেন, সিয়াম পালনকারীরা দুস্তরে বিভক্ত:**

প্রথম স্তর: ওই সকল লোক, যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় পানাহার ও কামপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে এবং জান্নাতে তার বিনিময় আশা করে। তিনি তো আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে ব্যবসা করেছেন ও লেন-দেন করেছেন। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনও নষ্ট করেন না, যে তাঁর সাথে লেনদেন করবে সে কখনও আশাহত হবে না বরং সবচেয়ে বড় ধরনের লাভে ধন্য হবে।

* একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে উদ্দেশ করে বললেন:

«إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءً لِلَّهِ، إِلَّا آتَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ»

‘নিশ্চয় তুমি যা কিছুই আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের কারণে পরিত্যাগ করবে, তার চেয়েও উত্তম বস্তু তিনি তোমাকে প্রদান করবেন।’[146]

এ ধরনের সিয়াম পালনকারীর চাহিদা মত আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে তাকে শ্রেষ্ঠতম খাদ্য-পানীয় ও স্ত্রী দান করবেন।

* আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَآ أَسۡلَفۡتُمۡ فِي ٱلۡأَيَّامِ ٱلۡخَالِيَةِ ٢٤ ﴾ [الحاقة: ٢٤]

‘(বলা হবে) ‘বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর।’ {সূরা আল-হাক্কাহ্, আয়াত: ২৪}

* মুজাহিদ রহ. সহ আরো অনেকে বলেন, এ আয়াত সিয়াম পালনকারীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

---

১৪৬ আহমাদ ৫/৭৯।

* আব্দুর রহমান ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন:

« وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ عَطَشًا كُلَّمَا دَنَا مِن حَوْضٍ مُنِعَ وطُرِدَ، فَجَاءَهُ صِيَامُ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ وَأَرْوَاهُ»

‘আর আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখতে পেলাম সে পিপাসায় জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। যখন সে পানি পানের জন্য হাউজের কাছে যায়, তখন তাকে সেখানে বাধা দেয়া হয় এবং সে ওখান থেকে বিতাড়িত হয়। অতঃপর তার কাছে রমযানের সিয়াম এসে উপস্থিত হলো এবং তাকে পানি পান করিয়ে তৃপ্ত করালো।’[147]

○ হে আমার জাতি! এ রমযানে আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে (কুরআন তিলাওয়াত ও নফল সালাতের মাধ্যমে) কথা বলার কি কেউ নেই?
তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য জান্নাতে সংরক্ষিত নেয়ামতরাজির প্রতি আগ্রহী কি কেউ নেই?
কবির ভাষায় বলতে হয়:

[১৪৭] তাবারানী তাঁর মু‘জামুল কাবীর গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেন, দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১৭৯। তবে হাদীসটি দুর্বল।

مَنْ يُرِدْ مُلْكَ الْجِنَانِ فلْيَدعْ عنه التواني

ولْيَقُمْ في ظُلمةِ اللي لِ إلى نورِ القُرآنِ

ولْيَصِلْ صوماًبصومٍ إن هذا العَيشَ فَانِ

إنَّما العيشُ جِوارُ الله في دارِ الأمانِ

যে হতে চায় জান্নাতের মালিক সে যেন ছাড়ে অবহেলা

সে যেন দাঁড়ায় রাতের আঁধারে কুরআনের আলো নিয়ে

সে যেন পর্যায়ক্রমে পালন করে সিয়াম নিশ্চয় এ জীবন নশ্বর

প্রকৃত জীবন হলো আল্লাহর প্রতিবেশীত্বে জান্নাতের বাড়ীতে।

সিয়াম পালনকারীদের দ্বিতীয় স্তর: এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত পার্থিব সব কিছু ছেড়ে বিরত থাকার সাওম পালন করে। তারা মস্তিষ্ককে মন্দ চিন্তা থেকে এবং উদরকে পূর্ণ খাবার মুক্ত রাখে। মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পঁচে-গলে যাবার কথা স্মরণ করে এবং আখিরাতের উদ্দেশে দুনিয়ার সৌন্দর্য ত্যাগ করে। এমন লোকের জন্যই তো তার রবের সাথে সাক্ষাত ও তাঁর দর্শন লাভ হবে প্রকৃত ‘ঈদুল ফিতর’।

কবি বলেন,

‘বিশেষ (প্রকৃত) সিয়াম পালনকারীদের সিয়াম হলো, জিহ্বাকে মিথ্যা বলা ও অপবাদ দেয়া থেকে বিরত রাখা।

আল্লাহর সাধক ও সান্নিধ্যে ধন্য ব্যক্তিদের সিয়াম হলো, অন্তরকে অন্য কারো অনুপ্রবেশ ও তাঁর পর্দা থেকে হেফাযত করা।

○ আল্লাহর পরিচয় প্রাপ্তগণকে পার্থিব জগতের সুরম্য অট্টালিকা স্বীয় রবের দর্শনের বিপরীতে প্রশান্তি দিতে পারে না। তাঁর দর্শন ছাড়া কোনো ঝর্ণাধারা তাদের পরিতৃপ্ত করতে পারে না। তাদের চিন্তা-চেতনা চাওয়া-পাওয়া এগুলো থেকে অনেক মহৎ।

○ যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালনার্থে আজ দুনিয়াতে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বিরত রাখার সাওম পালন করবে, আগামীকাল জান্নাতে সে ঐসব চাহিদা লাভ করবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর সব কিছু থেকে নিজেকে বিরত রাখার সাওম পালন করবে, তার ঈদ বা খুশী তো সেদিন হবে যে দিন সে আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে।

﴿مَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأٓتٖۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٥﴾ [العنكبوت: ٥]

‘যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।’ {সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৫}

○ তাই হে তাওবাকারীগণ! আজ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সিয়াম পালন করুন, তাহলে প্রতিপালকের সাক্ষাতের দিন ঈদুল ফিতরের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।[148]

হে আল্লাহ! আপনার প্রতি নিষ্ঠা সৃষ্টি করে আমাদের অন্তরলোককে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন এবং আমাদের আমলগুলোকে আপনার রাসূলের আনুগত্য আর তাঁর আদব অনুকরণের মাধ্যমে সুষমামণ্ডিত করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের আলস্যের নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিন, অধঃপতন থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের অপরাধ ও পাপরাশি ক্ষমা করুন। হে শ্রেষ্ঠ দয়াময়! আপনার দয়ায় আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতা ও জীবিত-মৃত সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দিন। আর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

---

[১৪৮] ইবন রাজাব, লাতায়েফুল মা‘আরিফ পৃ. ২৯৫, ৩০০।

দ্বাদশ আসর

কুরআন তিলাওয়াতের দ্বিতীয় প্রকার

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি অজস্র দানকারী তার জন্য যে তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর কাছে প্রত্যাশা করে; যিনি কঠোর শাস্তি প্রদানকারী যে তার যিকর থেকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ করে। নিজ দয়ায় তিনি যাকে চান নির্বাচিত করে কাছে টেনে নেন এবং নৈকট্য দান করেন আবার নিজ ইনসাফের ভিত্তিতেই তিনি যাকে চান দূরে ঠেলে দেন ফলে তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেন যেদিকে সে ফিরতে চায়। তিনি নাযিল করেছেন কুরআন সৃষ্টিকুলের জন্য রহমতস্বরূপ এবং পথিকদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে, সুতরাং যে একে আঁকড়ে ধরবে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছবে, আর যে এর সীমারেখা অতিক্রম করে এবং অধিকার বিনষ্ট করে, সে তার দুনিয়া ও আখিরাত সবই হারায়।

আমি তাঁর প্রশংসা করি তিনি যত অনুগ্রহ ও দান করেছেন তার ওপর। তাঁর শুকরিয়া আদায় করি দীনী ও দুনিয়াবী সব

নেয়ামতের ওপর। আর শুকরিয়াকারী কত অধিক লাভের যোগ্য হয় ও কত অধিকপ্রাপ্ত হয়!

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই; তিনি তাঁর গুণাবলিতে পরিপূর্ণ, সমকক্ষতা ও সাদৃশ্যতা থেকে বহু উর্ধ্বে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে তিনি সকল সৃষ্টির মধ্য নির্বাচিত ও মনোনীত করেছেন।

আল্লাহ সালাত পেশ করুন তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিনজন, সাহাবী ও অনাগত সকল সুন্দর অনুসারীর ওপর- যতদিন প্রভাত ফুটে বের হবে এবং তার কিরণ আলোকিত করবে। আর যথাযথ সালামও তাদের প্রতি বর্ষণ করুন।

○ **আমার ভাইয়েরা!**

পঞ্চম আসরে আলোচিত হয়েছে যে, কুরআন তিলাওয়াত দুই প্রকার:

প্রথমত: কুরআনের শাব্দিক পঠন, যার আলোচনা ইতোপূর্বে[149] করা হয়েছে।

---

[১৪৯] দেখুন, পৃষ্ঠা নং

দ্বিতীয়ত: হুকমী বা প্রায়োগিক পঠন অর্থাৎ কুরআনের বিধানকে তেলাওয়াত করা। আর তার অর্থ হচ্ছে, কুরআনপ্রদত্ত যাবতীয় সংবাদকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা, সকল আদিষ্ট বিষয় পালন ও নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তার বিধানাবলিকে মেনে নেওয়া।

বস্তুত এ প্রকারই হচ্ছে কুরআন নাযিলের বৃহত্তম লক্ষ্য। যেমন,

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩﴾ [ص: ٢٩]

‘আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।’ {সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯}

এ জন্য সালাফে সালেহীন রহ. কুরআন তিলাওয়াতের এ পদ্ধতির উপর চলে কুরআন শিক্ষা করেছেন, এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং মজবুত আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি

করে এর যাবতীয় বিধানাবলিকে ইতিবাচক ধারায় বাস্তবায়িত করেছেন। আবূ আব্দুর রহমান আসসুলামী রহ. বলেন:

حدَّثَنا الذين كانوا يُقرِؤوننا القرآن، عثمان بنُ عفانَ وعبدُالله بنُ مسعودٍ، وغيرهما، أنَّهم كانَوا إذا تعلَّمُوا منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم عَشرَ آياتٍ لم يتجاوزوها حتى يتعلَّموها وما فِيها من الْعلْم والْعَمَل، قالوا: فَتعلَّمنَا القرآنَ والعلمَ والعملَ جميعاً.

'উসমান ইবন আফফান, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ প্রমুখ যারা আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন তারা বলেছেন, তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশটি আয়াত শিখতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভালোভাবে না শিখতেন ও তাতে যে সকল জ্ঞান ও আমল করার কথা রয়েছে তা বাস্তবায়ণ না করতেন ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতেন না। তারা বলেন, আমরা এভাবেই কুরআন, জ্ঞান ও আমল সবই শিখেছি।"[150]

আর এটাই হলো কুরআন তিলাওয়াতের ওই প্রকার যার ওপর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ভর করে।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[১৫০] তাফসীর ইবন জারীর আত-ত্বাবারী: ১/৮০; ইবন তাইমিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া: ৭/১৬৮।

﴿فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ ١٢٣ وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرۡتَنِيٓ أَعۡمَىٰ وَقَدۡ كُنتُ بَصِيرٗا ١٢٥ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتۡكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَاۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمَ تُنسَىٰ ١٢٦ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي مَنۡ أَسۡرَفَ وَلَمۡ يُؤۡمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦۚ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبۡقَىٰٓ ١٢٧﴾ [طه: ١٢٣، ١٢٧]

‘অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, ‘হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? তিনি বলবেন, ‘এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলি এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল। আর এভাবেই আমি প্রতিফল দান করি তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনাবলিতে ঈমান আনে না। আর আখিরাতের আযাব তো অবশ্যই কঠোরতর ও অধিকতর স্থায়ী।’ {সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১২৩-১২৭}

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা যা যা বর্ণনা করেছেন তা হলো:

- রাসূলগণের নিকট পাঠানো হেদায়াত অনুসরণকারীদের প্রতিদান। আর সে মহান হেদায়াত হলো, আল-কুরআন। সঙ্গে সঙ্গে হেদায়াত বিমুখদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করেছেন। হেদায়াত অনুসারীদের বড় প্রাপ্তি হল তারা পথভ্রষ্ট হবে না ও দুর্ভাগা হবে না। তাদের থেকে ভ্রষ্টতা ও দুর্ভাগ্য দূর করার অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য ও পূর্ণ হেদায়াত সাব্যস্ত করা।
- পক্ষান্তরে অহংকারবশত কুরআন নির্দেশিত আমল বিমুখদের শাস্তি হল, দুনিয়া ও আখেরাতে তারা দুর্ভাগা ও হতভাগা হওয়া। তাদের জীবন হবে খুবই সংকীর্ণ।

সে দুনিয়াতে: দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা তথা সমস্যা সঙ্কুল অবস্থায় থাকবে। তার কোনো বিশুদ্ধ আকীদা নেই, নেই কোনো সৎ আমল।

﴿أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ﴾ [الاعراف: ١٧٩]

‘তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।’ {সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত: ১৭৯}

আর সে কবরে: থাকবে সংকীর্ণ অবস্থায়। তার কবর হবে সংকুচিত। এমনকি তার এক পাঁজরের হাড় অন্য পাঁজরে মিলে যাবে। আর সে হাশরের দিন হবে অন্ধ, ফলে কিছুই দেখতে পাবে না।

﴿وَنَحۡشُرُهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيٗا وَبُكۡمٗا وَصُمّٗاۖ مَّأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَٰهُمۡ سَعِيرٗا ٩٧﴾ [الاسراء: ٩٧]

'আর আমি কিয়ামতের দিনে তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব।' {সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৯৭}

তারা যেহেতু দুনিয়াতে সত্যের ব্যাপারে অন্ধ, সত্য শ্রবণ থেকে বধির ও সত্য বলা থেকে বিরত ছিল, আর তারা বলত:

﴿قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٖ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٞ وَمِنۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٞ﴾ [فصلت: ٥]

'আপনি আমাদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছেন সে বিষয়ে আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত, আমাদের কানের মধ্যে রয়েছে বধিরতা আর আপনার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে অন্তরায়।' {সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৫} সেহেতু আল্লাহ

তা‘আলা আখিরাতে তাদেরকে সেরূপ প্রতিদানই দেবেন যেরূপ তারা দুনিয়াতে করেছিল। আর আল্লাহ তাদেরকে ওইভাবে ধ্বংস করবেন, যেভাবে তারা আল্লাহর শরীয়তকে ধ্বংস করেছে।

﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرۡتَنِيٓ أَعۡمَىٰ وَقَدۡ كُنتُ بَصِيرٗا ١٢٥ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتۡكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَاۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمَ تُنسَىٰ ١٢٦﴾ [طه: ١٢٥، ١٢٦]

‘সে বলবে, ‘হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? তিনি বলবেন, ‘এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল।’ {সূরা ত্ব হা, আয়াত: ১২৫-১২৬}

﴿ جَزَآءٗ وِفَاقًا ٢٦ ﴾ [النبا: ٢٦]

‘উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপ।’ {সূরা আন-নাবা’, আয়াত: ২৬}

﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ [القصص: ٨٤]

‘আর কেউ পাপ নিয়ে আসলে তবে যারা মন্দকর্ম করেছে তাদের শুধু তারই প্রতিদান দেওয়া হবে যা তারা করেছে।’ {সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৮৪}

* সহীহ বুখারীতে সামুরা ইবন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সালাত আদায় করতেন (অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন) তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন,

«مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟» قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُولُ: «مَا شَاءَ اللَّهُ» فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟» قُلْنَا: لاَ، قَالَ: «لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي (فساق الحديث وفيه) فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " (فذكر الحديث وفيه) أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ،....»

'তোমাদের কেউ কি আজ রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ? বর্ণনাকারী বলেন, যদি কেউ দেখত তাহলে বর্ণনা করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, মাশাআল্লাহ। এরূপ তিনি একদিন আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন,

তোমাদের মধ্যে কেউ কি আজ রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ? আমরা বললাম না। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, দু’জন লোক আমার নিকট এল (তারপর তিনি দুই ব্যক্তির বিবরণ দিলেন অতঃপর হাদীসে এসেছে), আমরা চলতে চলতে একজন শায়িত ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম, সেখানে এক ব্যক্তিকে পাথর হাতে তার শিয়রে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। যখন সে ওই পাথরটি শায়িত ব্যক্তির মাথায় নিক্ষেপ করে, তখন পাথরটি তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দূরে ছিটকে যায়। পুনরায় পাথরটি নিয়ে আসার পূর্বেই তার মাথাটি আবার পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়। অতঃপর সে তার নিকট ফিরে এসে পূর্বের ন্যায় একই আচরণ করে। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? তারা দু’জন বলল, সামনে অগ্রসর হোন। (তিনি হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তাতে রয়েছে) যে লোকটির নিকট আমি এসেছিলাম এং যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে কুরআন শিক্ষা করেছে, অথচ সে অনুযায়ী আমল করে নি। আর সে ফরয সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে যেতো।’[151]

---

[১৫১] বুখারী: ১৩৮৬ ও ৭০৪৭। উপরোক্ত বর্ণনাটিতে দু’টি হাদীসের সমন্বয় রয়েছে। [সম্পাদক]

* অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে জনতার উদ্দেশে বলেন:

«قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»

‘নিশ্চয় শয়তান তোমাদের ভূখণ্ডে (মক্কা-মদীনায়) তার ইবাদত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে। তবে সে এটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবে যে তোমরা তুচ্ছ মনে করে তার ইবাদত ছাড়াও এমন কিছু কাজ করবে যাতে তার অনুসরণ হয়ে যাবে। সুতরাং শয়তানের ব্যাপারে তোমরা সাবধান হও। হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তা আঁকড়ে ধর, তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো: আল্লাহর কিতাব এব তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ।”[152]

---

[১৫২] হাকিম: ৩/১০৯, ১৪৮। ৩১৮, সহীহ সূত্রে বর্ণিত।

* ‘আমর ইবন শু‘আইব তার বাবা থেকে, তার বাবা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يُمَثَّلُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلًا، فَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ حَمَلَهُ فَخَالَفَ أَمْرَهُ، فَيَتَمَثَّلُ خَصْمًا لَهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَمَّلْتَهُ إِيَّايَ فَشَرُّ حَامِلٍ تَعَدَّى حُدُودِي، وَضَيَّعَ فَرَائِضِي، وَرَكِبَ مَعْصِيَتِي، وَتَرَكَ طَاعَتِي، فَمَا يَزَالُ يَقْذِفُ عَلَيْهِ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ: فَشَأْنُكَ بِهِ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكُبَّهُ عَلَى مَنْخِرِهِ فِي النَّارِ»

‘কিয়ামতের দিন কুরআনকে এক ব্যক্তির আকার দেয়া হবে। অতঃপর একজন লোকের সামনে তাকে উপস্থিত করা হবে। সে কুরআন বহণ করেছিল ও তার নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল। তখন কুরআনকে তার বিরুদ্ধে বাদী হিসেবে দাঁড় করানো হবে। তখন কুরআন বলবে, হে আমার প্রভু! আপনি তাকে আমার বহনকারী বনিয়েছিলেন, অথচ সে কতইনা নিকৃষ্ট বহনকারী ছিল। সে আমার সীমালঙ্ঘন করেছে, আমার ফরযসমূহ নষ্ট করেছে ও আমার নাফরমানি করেছে এবং আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে। কুরআন অনবরত তার রিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে তাকে লাঞ্ছিত করতেই থাকবে। পরিশেষে তাকে বলা হবে, তোমার ব্যাপারে কুরআনের এ অভিযোগ।

তখন কুরআন তাকে আপন হাতে ধরে নিয়ে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।’[153]

* সহীহ মুসলিমে আবূ মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ».

‘কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল হবে।’[154]

* অনুরূপ ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন,

«الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ قَادَهُ إِلَى النَّارِ»

‘কুরআন এমন সুপারিশকারী যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি কুরআনকে সম্মুখে রাখবে, কুরআন তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। আর যে কুরআনকে পেছনে রাখবে, কুরআন তাকে তাড়িয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।’[155]

---

[১৫৩] ইবন আবী শায়বা: ৬/১২৯, নং ৩০০৪৪। অনুরূপ আবু নু‘আইম তার হিলইয়া গ্রন্থে ২/২২০। আর হাইসামী তার মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ৭/১৬১ গ্রন্থে সেটা উল্লেখ করেছেন।

[১৫৪] মুসলিম: ২২৩।

[১৫৫] ইবন আবী শায়বা: ৬/১৩১, নং ৩০০৫৪। তবে এ মওকুফ হাদীসটি সহীহ সনদে সহীহ ইবন হিব্বান ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। [সম্পাদক]

সুতরাং হে ব্যক্তি! কুরআন যার বিপক্ষে বাদী হিসাবে দাঁড়াবে, কিভাবে তুমি তোমার পক্ষে তার সুপারিশের আশা কর? ওই লোকের জন্য আফসোস! যার সুপারিশকারী বিচার দিবসে তার বিপক্ষে বাদী হয়ে যাবে।

- **আল্লাহর বান্দাগণ!** এটা আল্লাহর কিতাব, যা আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করে শোনানো হচ্ছে। এটা ওই কুরআন, যদি তা কোনো পাহাড়ের উপর নাযিল হত তাহলে দেখতেন তা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তদ্যপি কোনো কান শুনছে না, কোনো চোখ কাঁদছে না, কোনো অন্তর ভীত হচ্ছে না। কুরআনের নির্দেশকেও তো পালন করা হচ্ছে না যে সেটার বিনিময়ে তার সুপারিশের আশা করা যাবে। হৃদয়সমূহ তাকওয়াশূন্য জনমানবহীন মরুভূমিতুল্য, যাতে পাপের কালিমা স্তুপাকারে জড়িয়ে আছে। ফলে সে না পায় দেখতে আর না শুনতে।
- আমাদের সামনে কত আয়াত পড়া হচ্ছে, অথচ আমাদের হৃদয় পাথরের মত কিংবা এর চেয়েও বেশি কঠিন। আর আমাদের সামনে কত রমযান মাস এসে চলে গেছে, অথচ আমাদের অবস্থা হতভাগ্যদের মতই রয়েই গেছে। না কোনো যুবক অশোভন কামনা থেকে বিরত হচ্ছে। না কোনো বৃদ্ধ মন্দ কাজ পরিহার করে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ওই সম্প্রদায়ের তুলনায় আমরা কোথায়

আছি, যারা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাক শোনা মাত্রই সাড়া দিত? আর যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াত পাঠ করা হতো, তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত? তারাই ওই লোক যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন, তারা আল্লাহর হক চিনতে পেরেছে। ফলে তারা স্বচ্ছতা অবলম্বন করতে সক্ষম হয়েছে।

* আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন:

«يَنْبَغِي لِقَارِئِ الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ نَائِمُونَ، وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، وَبِوَرَعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ، وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ، وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ وبحزنه إذا الناسُ يفرحون»

'কুরআন তিলাওয়াতকারীর উচিৎ **তাকে যেন চেনা যায়** তার রাতে (সালাতে) যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। তার দিনে (সাওমে) যখন মানুষ খাওয়া-দাওয়া করে। তার ক্রন্দনে, যখন মানুষ হাসে। তার তাকওয়ায়, যখন মানুষ ভালো-মন্দ মিশিয়ে ফেলে। তার নীরবতায়, যখন মানুষ খারাপ কিছু কিংবা পরনিন্দায় লিপ্ত থাকে। তার বিনয় ও নম্রতায়, যখন মানুষ অহংকার করে। তার চিন্তা ও পেরেশানীতে, যখন মানুষ হইহুল্লোড় করে।[156]

---

[১৫৬] ইবন রাজাব, লাতায়েফুল মা'আরিফ পৃ. ৩২১।

কবির ভাষায়:

১। হে আত্মা! নেককার লোকজন সফলকাম হয়েছে তাকওয়ার মাধ্যমে। তারা সত্য দেখেছে অথচ আমার হৃদয় অন্ধ।

২। তাদের সৌন্দর্য কতই না বেশি যে, রাত তাদের ঢেকে ফেলেছে অথচ তরকারাজির আলোর ওপর তাদের আলো প্রধান্য পেয়েছে।

৩। তারা রাতে মধুর সুরে যিকির করেছে। মূলত তাদের জীবন যিকিরের মাধ্যমে ধন্য হয়েছে।

৪। যিকিরের জন্য তাদের অন্তর সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের চোখের পানি যেন সুসজ্জিত মনি-মুক্তা।

৫। স্বীয় আলোয় তাদের রাতের শেষাংশ আলোকিত হয়েছে, আর ক্ষমা লাভই হলো উত্তম সৌভাগ্য।

৬। তারা অনর্থক কাজ থেকে নিজেদের সিয়ামকে মুক্ত রেখেছে এবং বিনয়ী হয়ে রাতে যিকিরে মগ্ন থেকেছে।

৭। ধিক হে আত্মা! পা ফসকে যাবার পূর্বে তুমি কি তা লাভের জন্য জাগ্রত হবে না?

৮। কামনা বাসনায় কেটেছে অতীত, তাই সময় থাকতে দ্বীন আঁকড়ে ধর ও সুযোগ গ্রহণ কর।[157]

○ **প্রিয় ভাইসকল!** সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই কুরআনকে হেফয করুন এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘন থেকে তার বিধানসমূহের সীমারেখা হেফাযত করুন। জেনে রাখুন, কুরআন আপনাদের পক্ষে বা বিপক্ষে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবে। কুরআন অবতীর্ণের শুকরিয়া এটা নয় যে, তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করব। আল্লাহর বিধানসমূহের সম্মান এটা নয় যে, এগুলোকে উপহাস করব।

﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ٢٧ يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا ٢٨ لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا ٢٩ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ٣٠ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا مِّنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيٗا وَنَصِيرٗا ٣١﴾ [الفرقان: ٢٧، 31]

‘আর সেদিন যালিম নিজের হাত দুটো কামড়িয়ে বলবে, ‘হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোনো পথ অবলম্বন করতাম! ‘হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশবাণী (কুরআন)

---

[১৫৭] এ কবিতাসমূহ ইবন রাজাব এর গ্রন্থ লাতায়েফুল মা‘আরিফ থেকে নেওয়া হয়েছে। পৃ. ৩২৩, ৩২৪। ঈষৎ পরিবর্তিত।

থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক। আর রাসূল বলবে, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে। আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি। আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট।’ {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৭-৩১}

হে আল্লাহ! আমাদের যথাযথভাবে কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ দিন। আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা এর মাধ্যমে সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

হে আল্লাহ! আমাদের তৌফিক দিন কুরআনের অর্থ ও শব্দ বুঝে তা প্রতিষ্ঠাকারী হওয়ার, তার সীমারেখার হেফাযতকারী ও তার যথাযথ সম্মানের খেয়ালকারী হওয়ার।

হে আল্লাহ আমাদের কুরআনের গভীর জ্ঞানী করুন, যারা হবে কুরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহে বিশ্বাসী, তার সংবাদ সত্যায়নকারী এবং হুকুমসমূহ বাস্তবায়নকারী। হে রহমতের আঁধার, আপন রহমতে আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দিন।

আর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর।

ত্রয়োদশ আসর

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার কুদরতের সামনে প্রতিটি বান্দা বিনীত হয়; যার মাহাত্ম্যের কাছে প্রতিটি রুকু-সিজদাকারী বিগলিত হয়; যার মুনাজাতের স্বাদ গ্রহণের জন্য তাহাজ্জুদগুযার জেগে থাকে এবং বিনিদ্র রজনী যাপন করে; যার নেকীর প্রত্যাশায় মুজাহিদ নিজের জীবন ব্যয় করে এবং প্রচেষ্টা চালায়। পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি এমন কথা বলেন যা সৃষ্টিকুলের কথার সঙ্গে তুলনা থেকে উর্ধ্বে ও বহুদূরে; তাঁর কথার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাঁর নবীর ওপর অবতীর্ণকৃত কিতাব, যা আমরা দিনরাত পড়ি ও বারবার আওড়াই। বারবার পড়ায় তা পুরনো হয় না, বিরক্তি আসে না আর যাকে কখনও অগ্রহণযোগ্য বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। আমি তাঁর প্রশংসা করি এমন ব্যক্তির ন্যায় যে তাঁর দুয়ারে অবস্থানের প্রত্যাশা করে কোনোরূপ বিতাড়নের শংকা ছাড়াই।

আর আমি সাক্ষ্য দেই যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই- ওই ব্যক্তির সাক্ষ্য যে

আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠ এবং তাঁর অনুগত বান্দা। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, যিনি ইবাদতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পাথেয় সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহ সালাত বর্ষণ করুন তাঁর ওপর; তাঁর সঙ্গী আবূ বকর সিদ্দীকের ওপর, যার শত্রুদের অন্তর অনিঃশেষ ক্ষতে পূর্ণ হয়েছে; ‘উমরের ওপর, যিনি অবিরাম ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন; উসমানের ওপর, যিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছেন; আলীর ওপর, যিনি আপন তলোয়ার দিয়ে বিরামহীন কাফেরদের ক্ষেত নিমূল করেছেন। আর রাসূলের সকল পরিবার-পরিজন ও সাহাবীর ওপর, অনন্তকালব্যাপী বিরামহীন। আর তিনি তাদের উপর যথাযথ সালামও পেশ করুন।

○ **আমার ভাইয়েরা!** এই যে কুরআন, যা আপনাদের কাছে আছে, আপনারা তিলাওয়াত করছেন, শুনছেন, মুখস্থ করছেন এবং লিপিবদ্ধ করছেন, তা আপনাদের রব ও সৃষ্টিকুলের রব ও পূর্ববর্তী-পরবর্তীদের মা‘বুদের বাণী; এটা তাঁর সুদৃঢ় রশি, তাঁর সরল পথনির্দেশ, বরকতময় উপদেশবাণী ও সুস্পষ্ট নূর। মহান আল্লাহর সম্মান ও মাহাত্মের সাথে যেভাবে মানায় সেভাবে আল্লাহু তা‘আলা এ

কুরআন দ্বারা বাস্তবিকই কথা বলেছেন। তিনি কুরআনকে নৈকট্যশীল সম্মানিত ফেরেশতাদের একজন জিব্রাইল আমীনের নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি এরপর এ কুরআন নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওসাল্লামের হৃদয়ে নাযিল করেছেন। যাতে তিনি সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় মানুষকে সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বড় বড় বিশেষণে কুরআনকে বিশেষায়িত করেছেন যাতে আপনারা কুরআনের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান করতে পারেন। যেমন,

* আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

'রমযান মাস যাতে নাযিল হয়েছে আল-কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}

﴿ ذَٰلِكَ نَتۡلُوهُ عَلَيۡكَ مِنَ ٱلۡأٓيَٰتِ وَٱلذِّكۡرِ ٱلۡحَكِيمِ ٥٨ ﴾ [ال عمران: ٥٨]

* ‘এটি আমরা আপনার উপর তিলাওয়াত করছি, আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ থেকে।’ {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৮}

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا ١٧٤﴾ [النساء: ١٧٤]

* ‘হে মানুষ! অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দলীল এসেছে আর আমরা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নূর নাযিল করেছি।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৭৪}

﴿قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ١٥ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦]

* ‘অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নূর ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ হেদায়াত দান করবেন তথা শান্তির পথ জান্নাতের দিকে পথনির্দেশ করবেন- তাকে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে।’ {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ১৫-১৬}

﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ أَن يُفۡتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٣٧ ﴾ [يونس: ٣٧]

* আর এ কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো রচনা হওয়া সম্ভব নয়। বরং এর আগে যা নাযিল হয়েছে এটা তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে।' {সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৭}

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧ ﴾ [يونس: ٥٧]

* 'হে মানবকুল! তোমাদের নিকট উপদেশ বাণী এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময় ও হেদায়াত ও রহমত মুমিনদের জন্য।' {সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭}

﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١﴾ [هود: ١]

* 'আলিফ লাম রা, এটা এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রাজ্ঞ ও সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে।' {সূরা হূদ, আয়াত: ১}

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [الحجر: ٩]

* 'নিশ্চয় আমি উপদেশবাণী তথা কুরআন নাযিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে এর হেফাজতের দায়িত্বভার আমি নিজেই নিয়ে নিলাম।' {সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯}

﴿ وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعٗا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ ٨٧ لَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِينَ ٨٨﴾ [الحجر: ٨٧، ٨٨]

* 'আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দান করেছি। আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর দিকে দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্য দিয়েছি। তাদের জন্য পেরেশান হবেন না। আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন।' {সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৮৭-৮৮}

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩﴾ [النحل: ٨٩]

* 'আমরা আপনার নিকট কিতাবটি নাযিল করেছি। এটি এমন যে তা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটা হেদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।' {সূরা আন-নাহল, আয়াত:৮৯}

﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَبِيرٗا ٩ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ أَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٠﴾ [الاسراء: ٩، ١٠]

* 'নিশ্চয় এ কুরআন যেটা যথার্থ ও সঠিক সে দিকেই পথনির্দেশ করে এবং ঈমানদারদের সুসংবাদ প্রদান করে, যারা নেক কাজ করে। নিঃসন্দেহে তাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে।' {সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৯-১০}

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارٗا ٨٢ ﴾ [الاسراء: ٨٢]

* আর আমরা নাযিল করি এমন কুরআন যা রোগের নিরাময় এবং মু'মিনদের জন্য রহমতস্বরূপ। আর এটা জালিমদেরকে ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করে না।' {সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮২}

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨ ﴾ [الاسراء: ٨٨]

* আপনি বলে দিন! যদি মানব ও জ্বিন জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, তারা এ কুরআন অনুরূপ কিছু আনয়ন করবে- তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছুই আনয়ন করতে

পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হোক।' {সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮}

﴿مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ٢ إِلَّا تَذۡكِرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰ ٣ تَنزِيلٗا مِّمَّنۡ خَلَقَ ٱلۡأَرۡضَ وَٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلۡعُلَى ٤﴾ [طه: ٢، ٤]

* 'আমরা আপনার ওপর কুরআনকে এ জন্য নাযিল করিনি যে, আপনি দুঃখ-কষ্ট করবেন। অবশ্য এটা উপদেশবাণী স্বরূপ যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য এটা নাযিল হয়েছে। সুউচ্চ আকাশ ও যমীনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এমন সত্তার পক্ষ থেকে।' {সূরা ত-হা, আয়াত: ২-৪}

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ١ ﴾ [الفرقان: ١]

* 'বরকতময় সেই সত্তা যিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী কুরআন তাঁর বান্দাহর প্রতি নাযিল করেছেন; যাতে তিনি বা তা সৃষ্টিকুলের জন্য সতর্ককারী হয়।' {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ১}

﴿ وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٩٢ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥ وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُرِ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٩٦ أَوَ لَمۡ يَكُن لَّهُمۡ ءَايَةً أَن يَعۡلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُاْ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ١٩٧ ﴾ [الشعراء: ١٩٢، ١٩٧]

* ‘নিশ্চয়ই এ কুরআন তো সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেস্তা (জিব্রাঈল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে, আপনার অন্তরে যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শন কারীদের অন্যতম হোন, সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। নিশ্চয়-ই এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে। তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাইলের আলেমগণ এটা অবগত আছেন।’ {সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ১৯২-১৯৭}

﴿وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ ٢١٠ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيعُونَ ٢١١ ﴾ [الشعراء: ٢١٠، ٢١١]

* ‘আর শয়তানরা এ কুরআন নিয়ে অবতরণ করে না। আর তাদের জন্য উচিতও নয় এবং তারা পারবেও না।’ {সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ১০-১১}

﴿ بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ﴾ [العنكبوت: ٤٩]

* ‘বরং এ কুরআন কতিপয় নিদর্শন ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে এদের হৃদয়ে কতিপয় সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।’ {সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৭}

﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّبِينٞ ٦٩ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّٗا وَيَحِقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧٠ ﴾ [يس: ٦٩، ٧٠]

* 'এটা তো কেবল এক উপদেশবাণী ও প্রকাশ্য কুরআন। যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন জীবিতকে এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।' {সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬৯-৭০}

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩ ﴾ [ص: ٢٩]

* 'আমরা আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি এক বরকতপূর্ণ কিতাব; যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে পারে, আর জ্ঞানীরা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' {সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ২৯}

﴿ قُلۡ هُوَ نَبَؤٌاْ عَظِيمٌ ٦٧ ﴾ [ص: ٦٧]

* 'আপনি বলে দিন! এটা তথা এ কুরআন এক মহা সংবাদ।' {সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ২৭}

﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُۚ﴾ [الزمر: ٢٣]

* ‘আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কুরআন নাযিল করেছেন। যা সামঞ্জস্যপূর্ণ বারবার পঠিত গ্রন্থ। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার ওপর, যারা তাদের রবকে ভয় করে, এরপর এদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২৩}

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكۡرِ لَمَّا جَآءَهُمۡۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ ٤١ لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢]

* ‘নিশ্চয়ই কুরআন তাদের নিকট আগমন করার পর যারা তা অস্বীকার করে। (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে)। এটা অবশ্যই মহিমাময় গ্রন্থ।’ বাতিল তার সামনে বা পিছনে দিয়ে আসতে পারে না, এটা তো প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।’ {সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪১-৪২}

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ﴾ [الشورى: ٥٢]

“এমনিভাবে আমরা আপনার নিকট রুহ প্রেরণ করেছি আমাদের আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না কিতাব কি এবং

ঈমান কী? কিন্তু আমরা একে করেছি নূর। যার দ্বারা আমরা আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি।' {সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৫২}

﴿ وَإِنَّهُۥ فِيٓ أُمِّ ٱلۡكِتَٰبِ لَدَيۡنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ٤ ﴾ [الزخرف: ٤]

* 'নিশ্চয় এ কুরআন আমাদের নিকটে সমুন্নত অটল অক্ষুণ্ণ রয়েছে লওহে মাহফুযে।' {সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৪}

﴿هَٰذَا بَصَٰٓئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾ [الجاثية: ٢٠]

* 'এটা মানুষের জন্য সুস্পষ্ট দলীল, জ্ঞানবর্তিকা, হেদায়াত ও রহমত দৃঢ়বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে।' {সূরা আল-জাসিয়াহ্, আয়াত: ২০}

﴿وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ﴾ [ق: ١]

* 'ক্বফ, মর্যাদাপূর্ণ কুরআনের কসম।' {সূরা ক্বফ, আয়াত: ১}

﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٥ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٞ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦ إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ ٧٧ فِي كِتَٰبٖ مَّكۡنُونٖ ٧٨ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنزِيلٞ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٨٠ ﴾ [الواقعة: ٧٥، ٨٠]

* 'অতএব আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি। নিশ্চয় এটা মহা শপথ যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয় এটা

সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক সংরক্ষিত গ্রন্থে তথা লওহে মাহফুযে। যারা পাক-পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। এটা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' {সূরা আল-ওয়াকি'আ, আয়াত: ৭৫-৮০}

﴿لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعٗا مُّتَصَدِّعٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الحشر: ٢١]

* 'যদি আমরা নাযিল করতাম এ কুরআনকে পাহাড়ের ওপর তাহলে অবশ্যই আপনি দেখতে পেতেন পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমরা এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য উপস্থাপন করি; যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।' {সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২১}

আল্লাহ তা'আলা জ্বিন জাতির কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন:

﴿ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبٗا ١ يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلرُّشۡدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦۖ ﴾ [الجن: ١، ٢]

* 'নিশ্চয় আমরা বিস্ময়কর এক কুরআন শুনেছি যা হেদায়াতের পথে পরিচালিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম।' {সূরা আল-জিন, আয়াত: ১-২}

﴿ بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ٢١ فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ ٢٢ ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]

* 'বরং এটা সম্মানিত কুরআন। যা লওহে মাহফুয বা সংরক্ষিত ফলকে রয়েছে।' {সূরা আল-বুরূজ, আয়াত: ২১-২২}

এ সমস্ত মহান গুণাবলি যা কুরআনের ব্যাপারে উল্লেখ করলাম, আর যেসব গুণাবলি উল্লেখ করিনি, সবই এ কুরআনের মাহাত্ম্য, কুরআনকে সম্মান করার আবশ্যকতা, আদবের সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তা তিলাওয়াতের সময় উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে বিরত থাকার ওপর স্পষ্ট দলীল বহন করে।

কুরআন কিছু তিলাওয়াতের আদব:

- **নিয়্যাত খালেস করা:**

আর কুরআন তেলাওয়াতের আদব হলো আল্লাহ তা'আলার জন্য নিয়্যাতকে খালিস করা। কারণ কুরআন তিলাওয়াত একটি মহৎ ইবাদত। এর ফযীলত ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢ ﴾ [الزمر: ٢]

‘সুতরাং আপনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করুন।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২}

* আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥]

‘তাদেরকে একমাত্র নির্দেশ দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে খাঁটি মনে ইখলাসের সঙ্গে।’ {সূরা আল-বায়্যিনা, আয়াত: ৫}

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَابْتَغُوا بِهِ وجهَ اللَّهَ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ، يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ»

‘তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর এবং এ তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর। এ আমল কর ওই সম্প্রদায়ের আগমনের পূর্বে, যারা কুরআন তীরের মত সোজা করে পড়বে, কুরআন দ্রুত পড়বে তথা এর দ্বারা দুনিয়ার

প্রতিদান তালাশ করবে। তারা কুরআন ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করবে না।’[158]

○ **উপস্থিত-মন নিয়ে তিলাওয়াত করা:**

যা পড়বে তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে এবং এর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করবে এবং সে সময় তার অন্তরটা বিনয়ী হবে এবং সে নিজের অন্তরকে এমনভাবে হাযির করবে যেন এ কুরআনে আল্লাহ তার সঙ্গে সংলাপ করছেন। কারণ কুরআন তো মহান আল্লাহর বাণী।

○ **পবিত্র অবস্থায় তিলাওয়াত করা:**

এটা আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ। অপবিত্র ব্যক্তি, অর্থ যার ওপর গোসল ফরয, এমন ব্যক্তি গোসল না করা পর্যন্ত কুরআন পাঠ করবে না। সম্ভব হলে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। যদি পানি না পাওয়া যায় কিংবা রোগের কারণে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হয় তাহলে তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করবে। অবশ্য অযু বা গোসল ফরয এমন ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করতে পারবে এবং কুরআনে আছে

---

[১৫৮] আহমাদ ৩/৩৫৭, নং ১৪৮৫৫; আবু দাউদ: ৮৩০।

এমন দো‘আ পাঠ করতে পারবে তবে কুরআন পাঠের নিয়্যত করবে না। যেমন বলবে:

﴿ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧ ﴾ [الانبياء: ٨٧]

‘আল্লাহ আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।’ {সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: } কিংবা পড়বে:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٨ ﴾ [ال عمران: ٨]

‘হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিবেন না। আর আপনি আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে দান করুন রহমত।’ {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮}

- **নোংরা জায়গা কিংবা মনোযোগ কাড়বে না এমন জনসমাগমস্থানে কুরআন তিলাওয়াত না করা:**

নোংরা কিংবা এমন স্থান যেখানে তিলাওয়াত শোনার মত পর্যাপ্ত একাগ্রতার অভাব সেখানে কুরআন তিলাওয়াত কুরআনকে অপমান করার শামিল। টয়লেটে কিংবা পেশাব-

পায়খানার জন্য বরাদ্দকৃত স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নেই। কারণ এসব স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা কুরআনুল কারীমের মর্যাদার সঙ্গে মানানসই নয়।

○ **তিলাওয়াতের তিলাওয়াতের শুরুতে তা'আউউয পড়া:** কুরআন তিলাওয়াতের আরেকটি আদব হলো, তিলাওয়াতের শুরুতে তা'আউউয তথা (আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়ত্বানির রজীম) পড়া। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

﴿ فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ٩٨ ﴾ [النحل: ٩٨]

'যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবেন।' {সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৮}

যাতে করে শয়তান কুরআন তিলাওয়াত থেকে কিংবা তিলাওয়াত পরিপূর্ণ করা থেকে বাঁধা না দিতে পারে। আর সূরার মাঝখান থেকে তিলাওয়াত শুরু করলে বিসমিল্লাহ পড়বে না। সূরার শুরু থেকে পাঠ করলে বিসমিল্লাহ বলবে। অবশ্য সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে না। কারণ এ সূরার সূচনায় বিসমিল্লাহ নেই।

কারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করার সময় সাহাবীগণের এ বিষয়টি নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। সূরা তাওবা কি সম্পূর্ণ আলাদা সূরা নাকি এটা সূরা আনফালের অংশ। তখন তারা উভয় সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ লিখা বাদ দিয়েছেন।

○ **কণ্ঠ সুন্দর করা এবং সুর দিয়ে তিলাওয়াত করা:**

* কারণ, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَا أَذِنَ اللهُ لشيءٍ كما أذن لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ»

'আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর প্রতি এরকমভাবে শ্রবণ করেন না যেভাবে তিনি সুন্দর স্বরবিশিষ্ট নবীর পড়াকে শ্রবণ করেন। যিনি তাকে প্রদত্ত কুরআন তথা কিতাবকে উচ্চসুরে সুর দিয়ে পড়েন।'[159]

* অনুরূপ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে জুবাইর ইবন মুত'য়িম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

---

[১৫৯] বুখারী: ৫০২৩, ৫০২৪; মুসলিম: ৭৯২।

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ أو قراءة منه

'আমি মাগরিব সালাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা তুর পড়তে শুনেছি। এত সুন্দর কণ্ঠ ও কিরাত আমি আর কারো থেকে শুনি নি।'[160]

অবশ্য যদি পাঠকের আশপাশে এমন কেউ থাকে যে উচ্চ স্বরে কিরাত পাঠ করলে কষ্ট পায়, যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং সালাত আদায়রত ব্যক্তি ইত্যাদি, তাহলে এমন উচ্চ আওয়াজে পড়বে না যা তার জন্য বিরক্তিকর কিংবা কষ্টদায়ক দেয়। কারণ,

* আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের নিকট বের হলেন তখন তারা উচ্চ কিরাতে সালাত আদায় করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيْ القرآن»

---

১৬০ বুখারী: ৭৬৫; মুসলিম: ৪৬৩।

‘সালাত আদায়কারী তার রবের নিকট কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করে সে যেন লক্ষ্য করে তার প্রার্থনা সে কিভাবে করবে। আর কুরআন পাঠের সময় তোমাদের একজন অপরের ওপর যেন উচ্চ না করে।’[161] ইবন আবদিল বার বলেন, হাদীসটি সহীহ।

○ **তারতীল বা ধীরস্থিরভাবে সুন্দররূপে তিলাওয়াত করা:**

* আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ٤ ﴾ [المزمل: ٤]

‘আর আপনি কুরআনকে তারতীলের সঙ্গে তথা ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে সুন্দররূপে তিলাওয়াত করুন।’ {সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ৪}

কুরআন তিলাওয়াত করবে ধীরস্থিরভাবে, দ্রুত নয়; কারণ ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত, শব্দ ও অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ এবং কুরআনের অর্থ অনুধাবনে অধিক সহায়ক।

* সহীহ বুখারীতে এসেছে:

---

১৬১ মুওয়াত্তা মালিক ১/৮০।

«عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ»

'আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহর নবী 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কেরাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেনঃ তার কেরাত ছিল দীর্ঘ আকারের। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টেনে টেনে পড়তেন। এরপর তিনি পড়লেন بسم الله الرحمن الرحيم তিনি بسم الله বিসমিল্লাহকে দীর্ঘ করলেন। الرحمن আর রাহমানকে দীর্ঘ করলেন। الرحيم আর রাহীমকে দীর্ঘ করলেন।'[162]

* তেমনি উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন:

«كان يقطع قراءته آية آية-بسم الله الرحمن الرحيم-الحمد لله رب العالمين-الرحمن الرحيم-مالك يوم الدين»

---

১৬২ বুখারী: ৫০৪৬।

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি একটি আয়াত করে আলাদা আলাদা ভাবে পড়তেন। তিনি পড়তেন- بسم الله الرحمن الرحيم তার পর (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) তারপর (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ও তারপর (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) এভাবে আলাদা ভাবে পড়তেন।’[163]

* ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«لاَ تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقْل وَلاَ تَهُذُّوهُ كَهَذِّ الشِّعْرِ ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ ، وَلاَ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ» .

‘তোমরা একে (কুরআন) নষ্ট খেজুরের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ো না কিংবা কবিতার মতো গতিময় ছন্দেও পড়ো না। বরং এর যেখানে বিস্ময়ের কথা আছে সেখানে থামো এবং তা দিয়ে হৃদয়কে আন্দোলিত করো। আর সূরার সমাপ্তিতে পৌঁছা যেন তোমাদের কারো লক্ষ্য না হয়।’[164]

অবশ্য এমন দ্রুত পাঠে কোনো সমস্যা নেই যেখানে কোনো অক্ষর বিলুপ্ত করলে বা ছুটে গেলে শাব্দিক কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় না কিংবা যেখানে ইদগাম করা বিশুদ্ধ নয় সেখানে

---

[১৬৩] আহমাদ ৬/৩০২; আবু দাউদ: ৪০০১; তিরমিযী: ২৯২৭।

[১৬৪] ইবন আবি শাইবাহ, মুসান্নাফ: ২/২৫৬, নং ৮৭৩৩।

ইদগাম করলে শাব্দিক কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় না এবং অর্থেরও কোনো পরিবর্তন হয় না। আর যদি এতে শাব্দিক ত্রুটি বিচ্যুতি হয় তাহলে হারাম হবে কারণ এটা কুরআনকে পরিবর্তন করার শামিল।

- **তিলাওয়াতে সিজদায় গিয়ে সিজদা করা:**

কুরআন তিলাওয়াতকারী যখন অযু অবস্থায় থাকেন তখন দিন কিংবা রাত্রি যে কোনো সময় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা আদায় করতে হবে।

সিজদা আদায়ের নিয়ম হলো: সিজদার জন্য প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবে এবং সিজদায় গিয়ে বলবে: سبحان ربى الأعلى এবং দো'আ করবে। অতঃপর সিজদা থেকে তাকবীর ও সালাম ছাড়াই মাথা উঠাবে। কারণ তেলাওয়াতে সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর ও সালাম দেওয়ার কোনো বর্ণনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে যদি তিলাওয়াতে সিজদাটি সালাতের মধ্যে হয় তখন সিজদা দেওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়ও তাকবীর দিবে। কেননা,

* আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত যে:

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

তিনি যখনই মাথা অবনত করতেন এবং উত্তোলন করতেন তখনই তাকবীর বলতেন; আর তিনি (আবু হুরায়রা রা.) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিই করতেন।'[165]

* অনুরূপ আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود»

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথা উঠানো, মাথা অবনত করা, দাঁড়ানো ও বসা এ প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহু আকবার বলতে শুনেছি।'[166]

আর এটা সালাতের সিজদা ও সালাতে তিলাওয়াতে সিজদা উভয়কেই শামিল করে।

---

১৬৫ মুসলিম: ৩৯২।

১৬৬ আহমাদ ১/৪৪২, ৪৪৩; নাসাঈ ৩/৬২; তিরমিযী: ২৫৪।

এ হলো কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব। সুতরাং আপনারা এসব আদবের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে তিলাওয়াত করবেন এবং আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণা অন্বেষণ করবেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি আপনার সম্মানিত বস্তুগুলোর সম্মান করার, আপনার দানগুলো আহরণ করে সফলতা লাভের, আপনার জান্নাতসমূহের ওয়ারিস হওয়ার তাওফীক দিন। আর হে পরম করুণাময়! আপনি আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতা ও সকল মুসলিমকে স্বীয় রহমতে ক্ষমা করুন।

আর আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীদের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করুন।

চতুর্দশ আসর

সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ

সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান রাখেন। যিনি বান্দার গোপন, প্রকাশ্য ও ধারণা সম্পর্কেও জ্ঞাত। যিনি তাঁর সৃষ্টিকে তৈরী ও তার শৈল্পিক বিন্যাসে একক। যিনি প্রতিটি সৃষ্টির যাবতীয় নড়া-চড়া ও স্থিরতা সবই নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন সুন্দরভাবে, কর্ণ বিদীর্ণ করেছেন এবং চোখের মণি নির্ধারণ করেছেন। গাছে তার শাখা ও ডালে কত পাতা আছে তা তিনিই গুণে রেখেছেন। যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং সেটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন, আকাশকে প্রশস্ত করেছেন এবং সেটাকে উপরে উঠিয়েছেন। তারকাসমূহের তাদের কক্ষপথে পরিচালিত করেছেন এবং অন্ধকার রাতে ও তমসায় সেগুলোকে উদিত করেছেন। বৃষ্টিকে নাযিল করেছেন মুষল ও হাল্কাভাবে, আর এর মাধ্যমে তিনি বীজকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে যথার্থভাবে উদ্ধার করেছেন। “এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি সুতরাং তোমার দেখাও তিনি ব্যতীত অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে?”

[সূরা লুকমান: ১১] আমি তাঁর প্রশংসা করছি তাঁর দান ও দাক্ষিণ্যের উপর।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, যাঁর ইবাদতে কোনো শরীক নেই, তাঁর ক্ষমতাতেও কোনো শরীক নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাঁকে তাঁর পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণাদি দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়েছে।

আল্লাহ তার উপর সালাত পেশ করুন, অনুরূপ আবু বকরের ওপর যিনি সর্বাবস্থায় তার সাথী ছিলেন, উমরের উপর যিনি খসরু পারভেযকে তার সুরম্য অট্টালিকায় অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন, উসমানের ওপর যিনি কুরআন নিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলেন, আলীর ওপর যিনি খাইবারের দরজা উপড়ে ফেলেছিলেন এবং সেখানকার দূর্গসমূহকে স্থানচ্যুত করেছিলেন। আর তার পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথীগণ যাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার নড়া-চড়া ও স্থিরতার মধ্যে তার রবের আনুগত্যে যথাযথ শ্রম ব্যয় করেছেন। আর আল্লাহ তাদের উপর যথার্থ সালাম পেশ করুন।

○ **ভাই সকল:**

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: ١٨٧]

‘আর এখন তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে পারো এবং আল্লাহ যা কিছু তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন বা দান করেছেন তা আহরণ কর। আর ভক্ষণ করো, পান করো যতক্ষণ না রাতের কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়। অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত সাওমকে পূর্ণ কর।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭}

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সিয়াম ভঙ্গের মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে তা পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন।

- **সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ ৭ প্রকার:**

প্রথম কারণ: স্ত্রী সহবাস

সহবাস বলতে বুঝায়, পুরুষের লিঙ্গ মহিলার জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করানো। এটা সিয়াম সাওম ভঙ্গের বড় কারণ এবং সিয়াম অবস্থায় সবচেয়ে বড় গোনাহের কাজ। সুতরাং যে

সিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করল তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। চাই তা ফরয হোক কিংবা নফল।

○তাই সিয়াম পালনকারী যদি রমযানের সিয়াম পালন অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে তার জন্য সিয়ামের কাযাসহ **'কঠোর কাফফারা'** আদায় করা আবশ্যক। **এই কাফফারা হলো:** একজন মুসলিম কৃতদাস-দাসীকে আযাদ করা। যদি সে কৃতদাস-দাসী না পায় তাহলে শরয়ী ওযর ছাড়া একাধারে দুই মাস সিয়াম পালন করা। শরয়ী ওযর হলো: দুই ঈদের দিন, আইয়্যামে তাশরীক কিংবা শারিরীক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ওজর। যেমন- রোগাক্রান্ত হওয়া কিংবা সিয়াম ভাঙ্গার নিয়ত ছাড়া সফর করা।

○ এর মধ্যে যদি সে কোনো ওযর ছাড়া একদিনও সিয়াম ভঙ্গ করে, তাহলে পুনরায় তাকে শুরু থেকে সিয়াম পালন করতে হবে। যাতে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করা হয়। যদি দু'মাস একাধারে সিয়াম পালনে সক্ষম না হয় তাহলে ৬০জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে। প্রতি মিসকীনকে **'আধা কিলো ও ১০ গ্রাম'** ভাল মানের গম দিতে হবে।

* সহীহ মুসলিমে এসেছে:

«إن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هل تجد رقبة؟ قال لا، قال: هل تستطيع

صيام شهرين، (يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى) قال: لا، قال: فأطعم ستين مسكينا» وهو في الصحيحين مطولا

‘জনৈক লোক রমযানে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে ফতওয়া জানতে চাইল? তখন তিনি বললেন: তুমি কি কৃতদাস আযাদ করতে পারবে। সে উত্তরে বললো জ্বি-না। তখন তিনি বললেন: তুমি কি একাধারে দু’মাস সাওম রাখতে পারবে। (একাধারে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাওম রাখা অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে) সে বলল: জ্বি-না। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন: তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াও।’ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে দীর্ঘাকারে এসেছে।[167]

দ্বিতীয় কারণ: ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত ঘটানো

চাই তা চুম্বন, স্পর্শ বা হস্তমৈথুন অথবা কামভাবসহ এমন কিছু করার মাধ্যমে হোক যা বীর্যপাত ঘটায়, এমন হলে সিয়াম

[১৬৭] বুখারী: ১৯৩৬; মুসলিম: ১১১১।

ভেঙ্গে যাবে। কারণ এগুলো এমনসব কাজ যেগুলো পরিত্যাগ করা ব্যতীত সাওম সংঘটিত হতে পারে না। যেমন,

* হাদীসে কুদসীতে রয়েছে:

«يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي »

‘(আল্লাহ তা‘আলা বলেন) সিয়াম পালনকারী আমার কারণে তার পানাহার ও কামভাব থেকে বিরত থাকে।’[168]

আর চুম্বন বা স্পর্শ করাতে যদি বীর্যপাত না হয় তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ,

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এসেছে, তিনি বলেন,

«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأرِبِهِ».

‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন করতেন এবং সাওম অবস্থায় তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা

[১৬৮] বুখারী: ১৮৯৪।

করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর কামভাব তোমাদের চেয়ে অধিক নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলেন।’[169]

* অনুরূপ সহীহ মুসলিমে এসেছে:

«أَنَّ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ».

‘উমর ইবন আবূ সালমা রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। সাওম পালনকারী কি চুম্বন করতে পারবে? তখন আল্লাহর নবী বললেন, একে জিজ্ঞাসা কর অর্থাৎ উম্মে সালমাকে (যিনি রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী ছিলেন) অতঃপর উম্মে সালমা বলে দিলেন, আল্লাহর রাসূল এমনটি করতেন। তখন তিনি আরয করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ কি আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন নি? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুনে রাখ আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি

---

[১৬৯] বুখারী: ১৮৯৪; মুসলিম: ১১৫১।

তোমাদের চেয়ে অধিক তাকওয়ার অধিকারী এবং আমি আল্লাহকে অধিক ভয় করি।'[170]

অবশ্য যদি সাওম পালনকারী চুম্বন বা অন্য কিছুর মাধ্যম বীর্যপাতের আশঙ্কা বোধ করে কিংবা তাদের এ চুম্বন সহবাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে এবং সে তার কাম উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তখন তার ওপর চুম্বন ও অন্য আচরণগুলো হারাম হবে। এটা হচ্ছে অন্যায়ে পথ রুদ্ধ করা এবং সাওম ভঙ্গ থেকে সাওমকে হেফাজত করার জন্য। এ জন্যই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম পালনকারী অযুকারীকে নাকের মধ্যে ভালোভাবে পানি টানার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ, সাওম পালনকারী ভালোভাবে নাকে পানি দিলে পেটের ভেতরে পানি চলে যাবার আশঙ্কা আছে তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন; যাতে সাওম ফাসেদ না হয়ে যায়।

○ তবে কোনো স্বপ্নদোষের মাধ্যমে কিংবা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যদি বীর্যপাত হয় তাহলে সাওম ভঙ্গ হবে না। কারণ

---

[১৭০] বুখারী: ১৯২৭; মুসলিম: ১১০৬।

স্বপ্নদোষ সাওম পালনকারীর ইচ্ছায় হয়নি। আর চিন্তা-ভাবনার বিষয়টি ক্ষমারযোগ্য। কারণ,

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»

'নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা আমার উম্মত মনে মনে কল্পনা করে যাবৎ তা বাস্তবায়ন করে কিংবা আলাপ করে।"[171]

তৃতীয় কারণ: পানাহার করা

পানাহার করা বলতে, যে কোনো প্রকার খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য মুখ বা নাক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করানোকে বুঝায়। কারণ,

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: ١٨٧]

[১৭১] বুখারী: ২৫২৮; মুসলিম: ১২৭।

‘তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। অতঃপর সিয়ামকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর।’ {সূরা আল-বাকারা: **১৮৭**}

আর নাক দিয়ে কিছু প্রবেশ করানো পানাহারের মতোই। কারণ,

* লাকীত ইবনে সুবরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে এসেছে:

«وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

‘(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:) তুমি অযুর সময় নাকে ভালোভাবে পানি পৌঁছিয়ে দাও অবশ্য সাওম পালনকারী হলে এমন করবে না।’[172]

আর নাকে গন্ধের ঘ্রাণ নিলে সাওম ভাঙ্গবে না। কারণ ঘ্রাণের এমন কোনো দৃশ্যমান শরীর নেই যা পেটের ভেতরে প্রবেশ করবে।

চতুর্থ কারণ: পানাহারের অনুরূপ বস্তু গ্রহণ করা

[১৭২] মুসনাদে আহমাদ ৪/৩২, ৩৩, ২১১; আবু দাউদ: ২৩৬৬; তিরমিযী: ৭৮৮; নাসাঈ ১/৮৭।

এটা দু’ ধরনের হয়ে থাকে।

এক: সিয়াম অবস্থায় রক্তপাত কিংবা অন্য কোনো কারণে রক্তে প্রয়োজন হলে যদি রক্ত দেয়া হয়, তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। কেননা পানাহারের পুষ্টির চূড়ান্ত পর্যায় হলো রক্ত। রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে সে-ই পুষ্টি অর্জিত হয়।

দুই: যেসব ইনজেকশন খাদ্য ও পানীয়ের বিকল্প, তা প্রয়োগ করা হলেও সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। যদিও তা বাস্তবে খাদ্য ও পানীয় নয়, কিন্তু খাদ্য-পানীয়ের বিকল্প। সুতরাং তা খাদ্য ও পানীয়ের বিধান রাখবে।

আর যে ইনজেকশন খাদ্যের পরিপূরক নয়: তা দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ হবে না। যদিও ইনজেকশন মাংসপেশী কিংবা রগে নেয়া হয়। এমনকি কণ্ঠনালীতেও যদি এর প্রভাব যায় তাহলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কেননা তা খাদ্যও নয় পানীয়ও নয়; তাছাড়া তা খাদ্য বা পানীয়ের অর্থেও পড়ে না। সুতরাং এর দ্বারা খাদ্য বা পানীয়ের বিধান প্রযোজ্য হবে না।

আর খাদ্য বা পানীয় ছাড়া কণ্ঠনালীতে অন্য কোনো স্বাদের প্রভাব ধর্তব্য নয়।

* এজন্য আমাদের ফকীহগণ বলেন: 'যদি সাওম পালনকারীর পায়ে কোনো তিক্ত জিনিস ঘর্ষণের ফলে সে এর স্বাদ কণ্ঠনালীতে পায় তাহলে সাওম ভাঙ্গবে না।'

* শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. তাঁর 'হাকীকতুস সিয়াম' রিসালায় বলেছেন: 'কুরআন ও সুন্নাহর দলীল-প্রমাণাদিতে এমন কিছু আসে নি যার ভিত্তিতে দাবি করা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তা-ই সাওম ভঙ্গকারী যা মগজে পৌঁছে কিংবা শরীরে পৌঁছে কিংবা কোনো গহ্বর দিয়ে প্রবেশ করে অথবা মুখগহ্বরে প্রবেশ করে, কিংবা এধরনের অন্যান্য যেসব বিষয়কে এ-মতামতের প্রবক্তাগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকটে এ হুকুমের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। (অর্থাৎ এগুলোর কোনোটিই সাওম ভঙ্গের মূল কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয় নি।)

তিনি আরও বলেন: 'যখন এটা প্রমাণিত হলো না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এসব বৈশিষ্ট্য বা কারণকে সাওম ভঙ্গ হওয়ার কারণ বলে নির্ধারণ করেছেন, তখন কেউ যদি বলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এগুলোকে সাওম ভঙ্গের কারণ নির্ধারণ

করেছেন, তবে তা হবে আল্লাহর উপর না জেনে কথা বলা।’[173]

পঞ্চম কারণ: সিঙ্গার মাধ্যমে রক্ত বের করা

কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»

‘সিঙ্গা যে লাগায় ও যে সিঙ্গা গ্রহণ করে- উভয়ের সিয়াম ভঙ্গ হবে।’[174]

ইমাম বুখারী রহ. বলেন. ‘এ অধ্যায়ে এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ হাদীস আর নেই।’

আর এটাই ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব।

[১৭৩] হাকীকাতুস সিয়াম, পৃ. ৫২-৫৩। আর আল্লাহর উপর না জেনে কথা বল হারাম ও সবচেয়ে বড় গুনাহ; সুতরাং মগজ বা শরীরে পৌঁছা অথবা কোনো রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করা, অথবা পেটে প্রবেশ করা এগুলোর কোনোটিই সাওম ভঙ্গের কারণ নয়। [অনুবাদক ও সম্পাদক]

[১৭৪] মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৭, ২৮০, ২৮২, ২৮৩; আবু দাউদ ২৩৬৭; ইবন খুযাইমাহ: ১৯৬২, ১৯৬৩; মুস্তাদরাকে হাকিম ১/৪২৭।

○ সিঙ্গা দ্বারা রক্ত বের করার অর্থে আরো রয়েছে শিরা কেটে রক্ত বের করা ও এ জাতীয় কর্মকাণ্ড; যা দিয়ে রক্ত প্রদান করলে শরীরে শিঙ্গা দেওয়ার মত প্রভাব পড়ে।

সুতরাং ফরয সিয়াম পালনকারীর জন্য কাউকে রক্তদান করা বৈধ নয়; তবে যদি এমন কোনো অত্যাবশ্যক অবস্থায় পতিত হয়; যা ফরয সিয়ামপালনকারীর রক্তদান দ্বারাই কেবল সমাধান হতে পারে, আর রক্ত দেওয়ার কারণে সাওমপালনকারীরও ক্ষতি না হয় তখন অত্যাবশ্যকতার কারণে রক্ত প্রদান করা জায়েয হবে এবং সে ওই দিনের সাওম ভঙ্গ করবে ও পরবর্তীতে তা কাযা করে নিবে।

অবশ্য নাক দিয়ে রক্ত পড়া, কফের সঙ্গে রক্ত বের হওয়া, অর্শ রোগের কারণে রক্ত বের হওয়া, দাঁত উঠানোজনিত কারণে রক্ত বের হওয়া, ক্ষতস্থান ফেটে রক্ত বের হওয়া কিংবা সুঁই দিয়ে খোচা দিয়ে রক্ত বের করা ও এ জাতীয় কাজে সাওম ভঙ্গ হয় না। কারণ; এগুলো শিঙ্গাও নয়, তার মতও নয়; কেননা এগুলো শরীরে শিঙ্গার মত প্রভাব ফেলে না।

ষষ্ঠ কারণ: ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করা

বমি হচ্ছে, পাকস্থলীতে খাবার বা পানীয় যা কিছু রয়েছে তা মুখ দিয়ে বের করে দেওয়া। বমি দ্বারা সাওম নষ্ট হয়, কারণ;

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»

‘যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হলো, তার ওপর কোনো কাযা নেই। তবে যে ইচ্ছাকৃত বমি করল, সে যেন কাযা করে নেয়।’[175]

ইচ্ছাকৃত বমি করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই পেট চেপে বমি করুক, কিংবা কণ্ঠনালীতে কিছু প্রবেশ করিয়ে বমি করুক কিংবা এমন বস্তুর ঘ্রাণ নিল, যাতে বমি আসে, অথবা এমন বস্তুর দিকে ইচ্ছে করে নজর দিল যার কারণে বমি হয়। এসব কারণে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে।

আর যদি কোনো কারণ ছাড়া বমি হয়, তাহলে সাওমের কোনো ক্ষতি নেই।

আর যদি পাকস্থলী বমি করতে চায় তাহলে সেটাকে চেপে রাখাও সাওমপালনকারীর জন্য আবশ্যক নয়; কেননা এটা

---

[১৭৫] তিরমিযী: ৭২০; আবু দাউদ: ২৩৮০; মুসনাদ আহমদ: ২/৪৯৮, নং ১০৪৬৩।

তার ক্ষতি করবে, বরং সেটাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিবে, অর্থাৎ সে বমি করতে চেষ্টা করবে না, বমি বন্ধ করতেও চেষ্টা করবে না।

<u>সপ্তম কারণ: হায়েয তথা ঋতু বা নেফাস তথা সন্তান প্রসবের রক্ত বের হওয়া।</u>

* কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»

'নারীর যখন হায়েয হয়, তখন সালাত আদায় করে না এবং সিয়ামও পালন করে না, তা নয় কি?'[176]

যখন কোনো মহিলার হায়েয হয় কিংবা নেফাসের রক্ত দেখে তখন তার সাওম ভেঙ্গে যাবে। চাই সে দিনের শুরুতে দেখুক কিংবা শেষভাগে দেখুক। এমনকি যদিও তা সূর্য ডোবার এক ক্ষনিক আগেও হয়।

[১৭৬] বুখারী: ৩০৪।

আর যদি সে অনুভব করে যে রক্ত বের হওয়া শুরু হচ্ছে, কিন্তু সূর্য ডোবার পরই শুধু সেটা বের হয়, তবে তাতে তার সাওম শুদ্ধ হয়ে যাবে।

- **সাওম পালনকারীর উপর হারাম হবে,** উপরোক্ত সাওম ভঙ্গের কারণসমূহের যে কোনো একটি করা, যদি সাওমটি হয় ফরয সাওম, যেমন রমযানের সাওম। অথবা যদি সেটা হয় ওয়াজিব সাওম যেমন, কাফফারার সাওম ও মান্নতের সাওম। অবশ্য যদি সাওম ভাঙ্গার শরয়ী ওযর থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কারণ যে ব্যক্তি ওয়াজিব শুরু করে তার জন্য সহীহ কোনো ওযর ছাড়া এটা পরিপূর্ণ করাটা আবশ্যক। তারপর যদি কেউ কোনো ওযর ছাড়া রমযানের দিনের বেলায় এ হারামসমূহের কোনো একটা করে বসে তাহলে তার ওপর বাকী দিন পানাহার থেকে বিরত থাকা এবং কাযা করা ওয়াজিব। অবশ্য অন্যান্য ওয়াজিব সাওমের ক্ষেত্রে শুধু কাযা করতে হবে, পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে না।

আর যদি নফল সাওম হয়, তাহলে কোনো ওযর ছাড়াই সাওম ভাঙ্গা জায়েয। কিন্তু সাওম পুরা করাই উত্তম।

○ **প্রিয় ভাইসব!** তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে যত্নবান হও। পাপাচার ও হারাম থেকে বিরত থাক। আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তার দিকে কায়মনোবাক্যে

প্রার্থনা কর, তাঁর দানের বিশেষ সময়গুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাও; তিনি তো অফুরন্ত দানশীল। আর জেনে রেখো! তোমরা তোমাদের মাওলার আনুগত্যে যে সময় কাটিয়েছ দুনিয়া থেকে তা-ই শুধু তোমাদের প্রাপ্তি। সুতরাং সময় চলে যাওয়ার পূর্বে সময়কে গনীমত মনে করে তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করো। ক্ষতি আপতিত হওয়ার আগেই লাভকে বেছে নাও।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সময়গুলোকে কাজে লাগাবার তাওফীক দিন, আর আমাদেরকে নেক কর্মসমূহে ব্যস্ত রাখুন।

হে আল্লাহ! আমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ দান করুন আর আমাদের সঙ্গে ক্ষমা ও মার্জনার আচরণ করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য নেক কাজ তথা জান্নাতের রাস্তাসমূহকে সহজ করে দিন আর কঠিন কাজ তথা জাহান্নামের আমল থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে আখেরাত ও দুনিয়াতে ক্ষমা নসীব করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আমাদের নবীর শাফা‘আত নসীব করুন এবং আমাদেরকে তাঁর হাউজে উপনীত করুন আর তা থেকে পান করিয়ে এমনভাবে পরিতৃপ্ত করুন যে আর কখনো পিপাসা না লাগে হে সৃষ্টিকুলের রব।

হে আল্লাহ আপনি সালাত, সালাম ও বরকত নাযিল করুন আপনার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদের ওপর এবং তার পরিবার-পরিজন ও সকল সঙ্গী-সাথীর ওপর।

পঞ্চদশ আসর

সিয়াম ভঙ্গের শর্তাবলি এবং যে কাজে সিয়াম ভাঙে না আর সাওম পালনকারীর জন্য যা করা জায়েয

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা, মহীয়ান সহিষ্ণু সত্যবাদী, দয়ালু সম্মানিত রিযিকদাতা, সাত রাস্তা তথা আসমানকে কোনো প্রকার খুঁটি ও লগ্নি ছাড়াই উপরে উঠিয়েছেন, যমীনকে সুউচ্চ পাহাড় দ্বারা সুস্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর সৃষ্টির কাছে দলীল-প্রমাণাদি ও মৌলিক তত্ত্বের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছেন, সকল সৃষ্টিকুলের রিযিকের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সবেগে স্খলিত পানি থেকে, তাকে শরীয়ত দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন যাতে সে সম্পর্ক ঠিক রাখে, যেগুলো তাঁর মনঃপুত হয় না এমন ভুল-ভ্রান্তি তার থেকে মার্জনা করেছেন। আমি তার প্রশংসা করি যতক্ষণ নির্বাক চুপ থাকে আর যতক্ষণ কোনো কথক কথা বলে।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, এটা নিষ্ঠাবানের সাক্ষ্য

কোনো মুনাফিকের সাক্ষ্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল যার দাওয়াত উপর-নীচ সকল স্থানকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তাঁর উপর সালাত পেশ করুন, অনুরূপ তাঁর সাথী আবু বকরের উপর, যিনি উপযুক্ত বিচক্ষণতার সাথে মুরতাদদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, আর 'উমারের ওপর, যিনি কাফেরদের মাথাব্যাথার কারণ হয়েছিলেন এবং বন্ধ দরজা খুলেছিলেন, আর 'উসমানের উপর, যার সম্মানকে পাষণ্ড-সীমালঙ্ঘনকারী ব্যতীত কেউ নষ্ট করেনি, অনুরূপভাবে 'আলীর ওপর, যিনি তাঁর বীরত্বের কারণে সংকীর্ণ পথেও হাটতে সক্ষম ছিলেন। তদ্রূপ রাসূলের সকল পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবী যাদের প্রত্যেকেই অন্যদের উপর পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠত্ব। আর আল্লাহ তাদের যথাযথ সালামও প্রদান করুন।

- **আমার ভাইয়েরা!** পূর্বে আমরা সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি। হায়েয ও নেফাস ছাড়া সিয়াম ভঙ্গের অন্যান্য কারণসমূহ যেমন, সহবাস করা, সরাসরি বীর্যপাত ঘটানো, খাদ্য কিংবা এ জাতীয় কিছু খাওয়া বা ব্যবহার করা এবং শিঙ্গা লাগানো ও বমি করা এ সব কিছু দ্বারা কেবল তখনই সাওম ভঙ্গ হবে যখন তা জেনে শুনে, স্মরণ করে ও স্বপ্রণোদিত হয়ে করে।

○ **সুতরাং বোঝা গেল যে, সাওম ভঙ্গ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে:**

প্রথম শর্ত: সিয়াম ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা

তাই যদি না জেনে উপরোক্ত বিষয়ের কোনো একটিতে লিপ্ত হয়, তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ,

* আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল-বাকরায় বলেন:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

‘হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা কোনো ভুল করে বসি।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬} তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন, “অবশ্যই আমি তা কবুল করেছি”।[177]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ٥ ﴾ [الاحزاب: ٥]

‘আর তোমরা ভুলে যা কর, তাতে কোনো অপরাধ নেই। অবশ্য ইচ্ছাপূর্বক তোমাদের হৃদয় যা করছে তার ব্যাপারে

---

১৭৭ মুসলিম: ১২৬।

জবাবদিহি করতে হবে। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫}

না জানার কারণে সাওম না ভাঙ্গার বিষয়টি ব্যাপক, হতে পারে সে শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ। যেমন, সে ধারণা করে যে এ জিনিসটা সাওম ভাঙ্গবে না, ফলে তা করে বসে। অথবা কাজ করা অবস্থায় বা সময়ে সেটি তার অজানা ছিল। যেমন, সে ধারণা করে যে, ফজর বা সুবহে সাদিক এখনও উদিত হয়নি, ফলে সে খাওয়া-পিনা চালিয়ে যায় অথচ ফজর উদিত হয়ে গেছে। কিংবা সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে মনে করে খেয়ে ফেলল অথচ সূর্য তখনও অস্ত যায় নি। এসব কারণে সাওম ভঙ্গ হবে না। কারণ,

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«لما نزلت هذه الآية ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحتُ غدوتُ إلى رسول الله صلى الله عليهِ وسلم فأخبرتُهُ بالذي صنعتُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل».

“যখন নাযিল হলো এই আয়াতটি,

﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: 187]

“যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে দেখা যায় কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখা” তখন আমি দু’টি সুতা নিলাম, একটা কালো অপরটি সাদা। উভয়টাকে আমার বালিশের নীচে রাখলাম এবং উভয়ের দিকে তাকাতাম। অতঃপর যখন আমার নিকট কালো সূতা থেকে শুভ্র সুতাটা পরিস্কার ভাবে দেখা গেল তখন আমি পানাহার থেকে বিরত থাকলাম। অতঃপর যখন সকাল হলো তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে যা করলাম সে ঘটনা জানালাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার বালিশ তো বেশ বড় ও প্রশস্ত, যদি তোমার বালিশের নীচে থাকে শ্রভ্র ও কালো সুতা। এটা তো দিনের শুভ্রতা ও রাতের কৃষ্ণতা।”[178]

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, ‘আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পরও খেয়েছেন। দুটো রেখা পরিস্কার দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তিনি পানাহার পরিত্যাগ করেন নি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাওমটি কাযা

---

[১৭৮] বুখারী: ১৯১৬; মুসলিম: ১০৯০।

করার নির্দেশও দেননি; কারণ তিনি এর হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন।

* অনুরূপ সহীহ বুখারীতে আসমা বিনতে আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন,

«أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس».

"আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইফতার করেছিলাম এক মেঘলা দিনে তারপর সূর্য দেখা গিয়েছিল।"[179]

এখানে তিনি উল্লেখ করেননি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাওমটি কাযা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কারণ তাদের সময় অজানা ছিল। আর কাযার নির্দেশ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েই থাকতেন তবে তা অবশ্যই বর্ণিত হতো; কেননা এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বর্ণনার ক্ষেত্রে মানুষের হিম্মতের অভাব হতো না।

বরং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তার 'হাকিকাতুস সিয়াম' নামক রেসালায় বলেন,

---

[১৭৯] বুখারী: ১৯৫৯।

«إنه نقلَ هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ أحدُ رواة الحَدِيثِ عن أبيه عروة: أنهم لم يؤمروا بالقضاء».

এ হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যমত হিশাম ইবনে ‘উরওয়াহ তার পিতা ‘উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, “তাদেরকে কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি।”[180]

কিন্তু যখনই জানতে পারবে যে, দিন এখনও বাকী রয়েছে এবং সূর্য অস্ত যায়নি, তখন থেকে (দিনের অবশিষ্টাংশ) সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। **উদাহরণস্বরূপ,** যদি কেউ সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর ভক্ষণ করে এ মনে করে যে সুবহে সাদিক এখনো উদিত হয় নি। অতঃপর তার নিকট স্পষ্ট হলো যে, সুবহে সাদিক উদিত হয়ে গেছে, তাহলে তার রোযা সহীহ হবে, তার উপর কাযা আবশ্যক হবে না। কারণ সে সময়ের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল। আর আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য পানাহার ও সহবাসকে সুবহে সাদিক স্পষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হালাল করেছেন। আর

---

[১৮০] হাকীকাতুস সিয়াম, পৃ. ৩৪, ৩৫।

বুখারীর পূর্বোক্ত বর্ণনায় এসেছে, হিশামকে বলা হলো, তাদেরকে কী কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, কাযার কী প্রয়োজন? আর মা‘মার বলেন, আমি হিশামকে বলতে শুনেছি, “আমি জানি না তারা তা কাযা করেছিল কি না?”

অনুমতি দেয়া বৈধ জিনিসের কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয় না।

দ্বিতীয় শর্ত: সিয়ামের কথা স্মরণ থাকা

সুতরাং যদি সিয়াম পালনকারী নিজ সিয়ামের কথা ভুলে সাওম ভঙ্গকারী কোনো কাজ করে ফেলে তাহলে তার সিয়াম শুদ্ধ হবে, তাকে আর সেটা কাযা করতে হবে না। যেমনটি সূরা বাকারার আয়াতে গত হয়েছে।

* তাছাড়া আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ»

‘যে সিয়াম পালনকারী ভুলে পানাহার করল, সে যেন তার সিয়াম পূর্ণ করে; কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।’[181]

---

[১৮১] বুখারী: ১৯৩৩; মুসলিম: ১১৫৫।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সাওম পরিপূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান সে সাওম সহীহ হওয়ার স্পষ্ট দলীল। আর ভুলে যাওয়া ব্যক্তির খাওয়ানো ও পান করানোর সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা প্রমাণ করে যে এর উপর কোনো পাকড়াও বা জবাবদিহিতা নেই।

○ কিন্তু যখনই স্মরণ হবে কিংবা কেউ স্মরণ করিয়ে দেবে তখনই: সেটা থেকে বিরত থাকবে এবং মুখে কিছু থাক লে তাও নিক্ষেপ করবে; কারণ এখন তার ওযর দূরীভূত হয়েছে।

○ আর যখন কেউ দেখবে যে, সাওম পালনকারী ব্যক্তি খাচ্ছে কিংবা পান করছে, তখন তার উচিত হবে সাওম পালনকারীকে সতর্ক করে দেওয়া। কারণ,

* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ ﴾ [المائدة: ٢]

"তোমরা সদাচারণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ২]

তৃতীয় শর্ত: স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিয়াম ভঙ্গ করা

অর্থাৎ সিয়াম ভঙ্গকারী নিজের পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী যদি সিয়াম ভঙ্গকারী কিছু করে তবেই কেবল তার সিয়াম নষ্ট হবে। অন্যথায় যদি সিয়াম পালনকারীকে জোর-জবরদস্তি করে সিয়াম ভঙ্গ করানো হয় তবে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে, তার আর সেটা কাযা করা লাগবে না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা কুফুরীর হুকুমকে সে ব্যক্তি থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন যাকে কুফুরী করতে জোর করে বাধ্য করা হয়েছে, যখন তার অন্তর ঈমানের ওপর অটল থাকে।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦﴾ [النحل: ١٠٦]

“কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি ; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।” {সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৬}

সুতরাং যদি আল্লাহ তা‘আলা জোর-জবরদস্তি ও বাধ্য করার কারণে কুফরির হুকুমও তুলে দিয়েছেন তাহলে কুফরির চেয়ে ছোট অপরাধ তো উঠে যাবেই।

* অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

‘নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং বাধ্য হয়ে করা বিষয় ক্ষমা করেছেন।’[182]

○ **আর যদি কোনো লোক তার স্ত্রীকে সহবাস করতে বাধ্য করে অথচ সে সাওম পালনকারিনী,** তাহলে মহিলার সাওম শুদ্ধ হবে। তাকে সেটার কোনো কাযা করতে হবে না। যদিও লোকটির জন্য বৈধ নয় স্ত্রীকে সাওম অবস্থায় সহবাসে বাধ্য করা। হ্যাঁ, যদি কোনো মহিলা তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল সাওম পালন করে সেটা ভিন্ন কথা।

○ **যদি কোনো ধুলা-বালি উড়ে গিয়ে সাওম পালনকারীর পেটের ভিতরে চলে যায়** কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে পেটের মধ্যে কোনো কিছু ঢুকে কিংবা কুলি বা নাকে পানি দেওয়ার

---

১৮২ ইবন মাজাহ: ২০৪৩; সহীহ ইবন হিব্বান: ৭১৭৫।

ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে পেটের ভেতর কিছু পানি প্রবেশ করে, তবে তার সাওম বিশুদ্ধ হবে। তার উপর কাযা করতে হবে না।

○ **আর চোখে সুরমা ও ঔষধ ব্যবহার করলে সাওম ভঙ্গ হবে না।** যদিও এর স্বাদ সে কণ্ঠনালীতে পায়। কারণ এটা খাদ্য ও পানীয় নয় এবং সমপর্যায়েরও নয়।

○ **কানের মধ্যে ফোটা ফোটা করে ঔষধ দিলেও সাওম ভাঙ্গবে না।** আর কোনো ক্ষত স্থানে ঔষধ দিলেও সাওম ভঙ্গ হয় না। যদিও সে ঔষধের স্বাদ কণ্ঠনালীতে পায়। কারণ এটা খাদ্য নয় পানীয় নয়- এবং উভয়ের সমপর্যায়েরও নয়।

* শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তার ‘‘হাকীকাতুস সিয়াম’’ গ্রন্থে বলেন, আমরা জানি, কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু নেই যা প্রমাণ করে যে এ বস্তুগুলো দ্বারা সাওম ভঙ্গ হবে, তাই আমরা জানলাম যে, এগুলো সাওম ভঙ্গকারী নয়।’[183]

* তিনি আরো বলেন, সিয়াম মুসলিমদের দ্বীনে এমন একটি বিষয় যা সাধারণ মানুষ ও বিশেষ মানুষ সকলেরই জানা দরকার। যদি এসব বিষয় আল্লাহ ও তার রাসূল সিয়াম অবস্থায় হারাম করে থাকতেন এবং এর দ্বারা সাওম নষ্ট হতো,

---

[১৮৩] হাকীকাতুস সিয়াম পৃ. ৪০, ৪১।

তবে অবশ্যই এটা বর্ণনা করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আবশ্যক হতো। আর যদি তিনি এটা উল্লেখ করতেন তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমও তা জেনে যেতেন এবং তারা তা গোটা উম্মতকে পৌঁছিয়ে দিতেন যেমনি ভাবে তারা পুরা শরীয়তকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যখন কোনো আলেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না কোনো সহীহ, দ্ব'য়ীফ, মুসনাদ, কিংবা মুরসাল কোনো প্রকার হাদীসই বর্ণনা করেন নি, তখন জানা গেলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর কোনো কিছুই উল্লেখ করেন নি। আর সুরমার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস অর্থাৎ 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরামদায়ক সুরমা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন,

«ليتقه الصائم»

"রোযাদার যেন এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকে।" এটা দুর্বল হাদীস। ইমাম আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থে এটাকে সংকলন করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এটা বর্ণনা করেন নি।

ইমাম আবূ দাউদ বলেন, আমাকে ইয়াহইয়াহ ইবনে মা'ঈন বলেন, এ হাদীসটি মুনকার।'[184]

* শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, 'যে সব হুকুম-আহকাম জাতির জন্য জানা জরুরী, অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি অসাল্লামকে তা সাধারণভাবে বর্ণনা করতে হতো। আর অবশ্যই উম্মতরা এটা বর্ণনা করতো। অতঃপর যখন এটা এটা পাওয়া গেল না, তখন বুঝা গেল যে, এটা তাঁর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়।' শাইখের বক্তব্য এখানেই শেষ। শাইখের এ বক্তব্য অত্যন্ত সুদৃঢ় যা সুস্পষ্ট দলীল ও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

○ **আর খাবারের স্বাদ গ্রহণ করলে যখন না গিলা হয় তখন তাতে সাওম ভঙ্গ হবে না।** আর কোন সুঘ্রাণ ও ধুপের ঘ্রাণেও সাওম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ধুপের ধোঁয়া নাকে গ্রহণ করবে না। কারণ তার অনেক অংশবিশেষ আছে যা ঊর্ধ্বে উঠে থাকে; হয়তো বা তার কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছে যাবে। অনুরূপভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াতেও সাওম ভঙ্গ হয় না; কিন্তু তাতে অতিরঞ্জিত করবে না। কারণ কখনো কিছু পানি পেটের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে।

---

[১৮৪] হাকীকাতুস সিয়াম পৃ. ৩৭, ৩৮।

* যেমন হাদীসে এসেছে, লাকীত ইবন সুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»

"উত্তম রূপে অজু করো এবং আঙ্গুলের মাঝে খিলাল করো আর ভালো ভাবে নাকে পানি দাও- অবশ্য সাওম পালনকারী হলে নয়।"[185]

○ **সাওম পালনকারী মেসওয়াক করলে সাওম ভঙ্গ হবে না।** বরং সাওম ভঙ্গকারীদের মত সাওম পালনকারীর জন্যও দিনের প্রথম ও শেষ ভাগে মেসওয়াক করা সুন্নাত। কারণ,

* নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»

"যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টকর না হতো, তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক সালাতের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[186]

---

[১৮৫] আহমাদ ৪/৩২-৩৩, ২১১; আবু দাউদ ২৩৬৬; তিরমিযী ৭৮৮; নাসাঈ ১/৮৭; ইবন মাজাহ: ৪০৭।

[১৮৬] বুখারী: ৮৮৭; মুসলিম: ২৫২।

এটা সাওম পালনকারী ও সাওম ভঙ্গকারী সকলের জন্য সব সময় প্রযোজ্য হুকুম।

* অনুরূপভাবে ‘আমের ইবন রাবী‘আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصى يتسوك وهو صائم»

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাওম অবস্থায় অগণিত বার মেসওয়াক করতে দেখেছি”।[187]

- **সাওম পালনকারীর জন্য পেস্ট বা দাতের মাজন দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা উচিত নয়।** কারণ এর শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে, ফলে আশংকা করা হয় যে, মুখের লালার সাথে খাদ্যনালীর ভিতরে এর কোনো কিছু ঢুকে যাবে। মিসওয়াক ব্যবহার সেটার বিকল্প হতে পারে এবং সে অবস্থা থেকে বেঁচে থাকা যায়।
- **আর সাওম পালনকারীর এমন কিছু করা জায়েয যা তাকে প্রচণ্ড গরম ও পিপাসা থেকে কিছুটা হালকা করবে।** যেমন, পানি দ্বারা ঠাণ্ডা হওয়া বা অনুরূপ কিছু। কারণ,

[১৮৭] মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৪৫; আবু দাউদ ২৩৬৪; তিরমিযী: ৭২৫। (দুর্বল সনদে)

* ইমাম মালেক ও ইমাম আবূ দাউদ কোনো এক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج (اسم موضع) يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، أو من الحر»

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আরজ' নামক স্থানে সাওম পালনরত অবস্থায় পিপাসা কিংবা গরমের কারণে তার পবিত্র মাথা মোবারকে পানি ঢালতে দেখেছি।"[188]

* 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি কাপড় ভিজিয়ে নিজের উপর সাওম পালনরত অবস্থায় রেখেছেন।

* আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর একটি খোদাই করা পাথর ছিল এটা কূপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তিনি যখন সাওম পালনরত অবস্থায় গরম অনুভব করতেন, তখন তাতে অবতরণ করতেন। আল্লাহ ভালো জানেন, মনে হচ্ছে যেন এটা পানিতে পরিপূর্ণ থাকত।

* হাসান বলেন, সাওম পালনকারীর জন্য কুলি করা ও ঠান্ডা হওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই।

---

[১৮৮] মুওয়াত্তা ইমাম মালিক: ২/২৯৪; আবু দাউদ: ২৩৬৫।

এ বর্ণনাগুলো ইমাম বুখারী তা'লীক হিসেবে সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন।

○ **প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ!** আল্লাহর দীন ভালোভাবে জানুন, যাতে জেনে-শুনে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন। কারণ যারা জানে এবং যারা জানে না তারা সমান হতে পারে না। আর

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।'[189]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দীন বুঝা এবং সেটার উপর আমলের তাওফীক দিন। আর আমাদেরকে দীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমাদেরকে মুমিন হিসেবে মৃত্যু দিন এবং নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর হে দয়ালুদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দয়ালু আপনার একান্ত দয়ায় আমাদেরকে ও আমাদের মা-বাবা এবং সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন।

---

[১৮৯] বুখারী: ৭১; মুসলিম: ১০৩৭।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

ষোড়শ আসর

যাকাত

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি পদস্খলন মিটিয়ে দেন ও উপেক্ষা করেন, ক্ষমা করেন আবোল-তাবোল কথা ও ছাড় দেন। যে কেউ তাঁর কাছে আশ্রয় চায় সে সফল হয়, যে কেউ তার সাথে লেন-দেন করে সেই লাভবান হয়, তিনি আকাশকে বিনা খুঁটি উপরে উঠিয়েছেন সুতরাং তুমি চিন্তা কর এবং খাঁটি ও স্বচ্ছ হও। তিনি নাযিল করেছেন বৃষ্টি ফলে ফসলাদিকে দেখা যায় পানিতে সাতরাতে। প্রাচুর্যও প্রদান করেন আবার দারিদ্র্যতাও দেন, কখনও কখনও দারিদ্র্যতা হয় বান্দার জন্য উপযোগী। এমন বহু প্রাচুর্যশীল রয়েছে, যার প্রাচুর্য তাকে গর্ব অহংকারের খুব নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নিপতিত করেছে। এ তো ‘কারূন’ অনেক কিছুরই সে মালিক হয়েছিল, কিন্তু সে সামান্যের ব্যাপারে ছাড় দিতে রাযী ছিল না, তাকে সাবধান করা হয়েছিল কিন্তু সে জাগ্রত হয় নি, তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল কিন্তু তিরস্কার তার কাজে আসে নি, বিশেষ করে যখন তার জাতির লোকেরা তাকে বলেছিল, ‘তুমি বেশি খুশি

হয়ো না। আমি তাঁর প্রশংসা করি যতক্ষণ পর্যন্ত দিন গড়িয়ে বিকেল হবে, আর রাত পেরিয়ে হবে সকাল।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি অমুখাপেক্ষী, দানবীর, প্রশস্ত দান করার মাধ্যমে দয়া করেছেন এবং নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি আল্লাহর জন্য তাঁর জান ও মাল ব্যয় করেছেন, সত্যকে করেছেন স্পষ্ট ও প্রকাশিত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর সালাত পেশ করুন, আর তার সাথী আবু বকরের উপর, যিনি সফরে ও অবস্থানস্থল সর্বদা তার সাথে ছিলেন, কখনও তাকে পরিত্যাগ করেন নি। অনুরূপ উমারের উপর, যিনি দিনের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ছিলেন সদা সচেষ্ট। আর উসমানের উপর, যিনি আল্লাহর রাস্তায় বহু খরচ করেছেন এবং সংশোধন করেছেন। তদ্রূপ আলীর উপর, যিনি ছিলেন রাসূলের চাচাতো ভাই, তার ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ি কিংবা সম্মানহানি থেকে তাদের থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত; অনুরূপভাবে বাকী সাহাবীগণের উপর এবং যারা সুন্দরভাবে তাদেরকে অনুসরণ করেছেন তাদেরও উপর। আর আল্লাহ তাদের উপর যথাযথ সালামও পেশ করুন।

○ **প্রিয় ভাইয়েরা!**

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥ ﴾ [البينة: ٥]

‘তাদের এ মর্মে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা নিবিষ্ট মনে একান্তভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত প্রদান করব। আর এটাই হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন।’ {সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠ ﴾ [المزمل: ٢٠]

‘আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ {সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ২০}

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩﴾ [الروم: ٣٩]

‘আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলত আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত।’ {সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩৯}

এ ছাড়াও যাকাত ফরয হওয়ার বিধান সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে।

○ **হাদীসের আলোকে যাকাতের বিধান:**

* ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ، عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجُّ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: «لَا، صِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ»

‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, যথা- এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্যিকারের মাবুদ নেই। সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের সিয়াম পালন করা ও হজ আদায় করা। এ কথা শুনে একব্যক্তি বললেন, হজ তারপর কি রমযানের সিয়াম? তিনি বললেন, না বরং প্রথমে রমযানের সিয়াম তারপর হজ। এ ধারাবাহিকতায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।’[190]

* অন্য বর্ণনায় রয়েছে: (ইসলামের ভিত্তি হলো) এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে ‘এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল’। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[191]

সুতরাং বোঝা গেল, যাকাত ইসলামের একটি রুকন ও মৌলিক ভিত্তিগুলোর একটি।

আর কুরআনের বহু জায়গায় সালাতের পাশাপাশি যাকাতের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

---

[১৯০] মুসলিম: ১৬।

[১৯১] বুখারী: ৮; মুসলিম: ১৬

○ **ইজমা:**

সকল মুসলিম অকাট্যভাবে একমত যে, যাকাত একটি ফরয বিধান। সুতরাং যাকাত ফরয জেনেও যদি কোনো ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

আর যে যাকাত প্রদানে কৃপণতা করবে বা পরিমানের চেয়ে কম দেবে, সে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে।

○ **চার ধরনের সম্পদে যাকাত ফরয:**

প্রথম প্রকার: ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্য ও ফল-ফলাদী

* কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]

‘হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের বৈধ উপার্জন এবং আমরা তোমাদের জন্য ভুমি থেকে যে শস্য উৎপন্ন করি তা থেকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় কর।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৭}

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ﴾ [الانعام: ١٤١]

'আর তোমরা ফসল কাটার সময় তার হক (যাকাত) আদায় কর।' {সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৪১}

আর সম্পদের সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে যাকাত।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»

'আসমান ও ঝর্ণার পানিতে কিংবা স্বেচ্ছা উৎপাদিত ফসলের মধ্যে এক দশমাংশ আর যা সেচের মাধ্যমে আবাদ হয় তার মধ্যে বিশভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদেয়।'[192]

ফসলের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার নির্ধারিত পরিমাণ হলো পাঁচ ওসক। কারণ,

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسقٍ»

---

[১৯২] বুখারী: ১৪৮৩।

‘শস্য বা ফলমুলের ওপর যাকাত ফরয হবে না। যতক্ষণ তা পাঁচ ওসক পরিমাণ না হয়।’[193]

আর ওসকের পরিমাণ হলো; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত সা‘ এর ৬০ সা‘ সমপরিমাণ। তাহলে নিসাব হলো, তিনশ সা‘, আর এক সা‘র পরিমাণ হলো ২০৪০ গ্রাম (দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম)। সুতরাং নিসাবের পরিমাণ দাঁড়ালো ৬১২ কেজি। তাই এর কমে যাকাত ফরয নয়। ওই নিসাবে বিনাশ্রমে প্রাপ্ত ফসলের যাকাতের পরিমাণ হলো এক দশমাংশ আর শ্রম ব্যয়ে প্রাপ্ত ফসলের এক বিশমাংশ।

○ ফলমূল, শাক-সবজি, তরমুজ ও জাতীয় ফসলের ওপর যাকাত ফরয নয়।

* কেননা ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, ‘শাক-সবজিতে যাকাত নেই’।

* তেমনি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, ‘আপেল বা এ জাতীয় ফলের ওপর যাকাত ফরয নয়।

* তাছাড়া যেহেতু এগুলো (নিত্যপ্রয়োজনীয়) খাবার জাতীয় শস্য বা ফল নয়, তাই এর ওপর যাকাত নেই। তবে যদি

---

১৯৩ মুসলিম: ৯৭৯।

এসব টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে মূল্যের ওপর নিসাব পূর্ণ হয়ে এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর যাকাত ফরয হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: যে সকল প্রাণীর ওপর যাকাত ফরয হয়

তাহলো: উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ। যদি এ সকল প্রাণী 'সায়েমা' হয় তথা মাঠে চরে চষে খায় এবং এগুলোকে বংশ বৃদ্ধির জন্য পালন করা হয় এবং তা নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে এদের যাকাত দিতে হবে। উটের নিসাব ন্যূনতম ৫টি, গরুর ৩০টি, আর ছাগলের ৪০টি।

'সায়েমা' ওই সকল প্রাণীকে বলে, যেগুলো সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে ঘাস খেয়ে বেড়ায়। যদি এসব প্রাণী সায়েমা না হয়, তবে এর ওপর যাকাত ফরয নয়। কিন্তু যদি এগুলো দ্বারা টাকা-পয়সা কামাই করার উদ্দেশ্য থাকে; যেমন বেচা-কেনা, স্থানান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে টাকা-পয়সা আয় করা, তাহলে তা ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে; আর তখন সেগুলো সায়েমা কিংবা মা'লুফাহ (যাকে ঘাস কেটে খাওয়ানো হয়) যা-ই হোক না কেন তাতে ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত আসবে; যদি তা স্বয়ং নিসাব পরিমাণ হয়

অথবা এসবের মূল্য অন্য ব্যবসায়িক সম্পদের সঙ্গে যুক্ত করলে নিসাব পরিমাণ হয়।

তৃতীয় প্রকার: স্বর্ণ-রৌপ্যের ওপর (নিসাব পরিমাণ হলে) সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয। কারণ,

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]

‘আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে অথচ তা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে না (যাকাত দেয় না)। আপনি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করুন। কিয়ামত দিবসে ওই সোনারূপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে ছেকা দেয়া হবে এবং বলা হবে এ হলো তোমাদের সে সকল ধন-সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে। সুতরাং আজ জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ কর।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫}

আয়াতে ‘জমা করে রাখা’ বলতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করা বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে, যাকাতে ব্যয় করা।

* তাছাড়া সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ »

‘যে সকল সোনা-রূপার মালিকগণ তাদের সম্পদ থেকে নির্ধারিত হক (যাকাত) আদায় না করে, কিয়ামত দিবসে তার জন্য কতগুলো আগুনের পাত প্রস্তুত করে তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা ওই লোকদের ললাট ও পিঠে চেপে ধরা হবে। তাপ কমে গেলে উত্তপ্ত করে পুনরায় চেপে ধরা হবে। পঞ্চাশ বছর দীর্ঘ সময় বান্দাদের হিসাব-নিকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে শাস্তি চলতেই থাকবে।’[194]

---

[১৯৪] মুসলিম: ৯৮৭।

* ‘সোনা-রূপার হক’ আদায় না করার অর্থ, যাকাত আদায় না করা। যা অন্য বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেখানে এসেছে,

«ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته»

‘যে সকল সোনা-রূপার মালিকগণ তাদের সম্পদের যাকাত আদায় না করে....’।

সোনা-রূপার যাবতীয় প্রকারে যাকাত ফরয হবে। চাই তা হোক টাকা পয়সা, চাকা বা টুকরা, পরিধেয় অলংকার বা ধার দেওয়ার মত অলংকার অথবা অন্য প্রকার সোনা-রূপা এসব কিছুর ওপর যাকাত ফরয। কারণ সোনা-রূপার উপর যাকাত ফরয করে বর্ণিত সকল আয়াত বা হাদীস ব্যাপকভাবে এর উপর প্রমাণবহ।

* ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا « أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ». قَالَتْ لاَ. قَالَ «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ». قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

‘একদা একজন মহিলা তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এলেন। ওই মেয়ের হাতে স্বর্ণের দুটি ভারি ও মোটা বালা ছিলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এসবের যাকাত দাও? মেয়েটি বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এসবের দ্বারা দুটি আগুনের চুড়ি বানিয়ে তোমার হাতে পরিয়ে দেবেন? মেয়েটি এ কথা শুনে বালা দুটি খুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে বলল, এসব আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।’[195]

* অন্য এক হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَأَى فِى يَدِى فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ». فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا

[১৯৫] আহমাদ ২/১৭৮; আবু দাউদ: ১৫৬৩; নাসাঈ ৫/৩৭; তিরমিযী: ৬৩৭। ইবনুল কাত্তান এটাকে সহীহ হাদীস বলেছেন। শাইখ উসাইমীন এর সনদকে ‘শক্তিশালী’ বলেছেন।

رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ». قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ».

'একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন, তখন আমার হাতে কয়েকটি বড় বড় রূপার আংটি ছিল। তিনি বললেন, এসব কী? আমি বললাম, আপনার সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য এগুলো তৈরি করেছি। তিনি বললেন, তুমি কি এসবের যাকাত প্রদান করো? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমার জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।'[196]

হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। অনুরূপ বাইহাকী ও হাকেম, আর তিনি সেটাকে সহীহ বলেছেন এবং আরও বলেছেন যে, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী।

ইবন হাজার 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেন, এটি বুখারী শর্ত অনুযায়ী।

ইবন দাকীকিল 'ঈদ বলেন, এটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী।

---

[১৯৬] আবু দাউদ: ১৫৬৫; বাইহাকী ৪/১৩৯; হাকেম ১/৩৮৯-৩৯০। হাকেম বলেছেন বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী, ইমাম যাহাবী তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী তার ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (৩/২৯৭) বলেছেন, হাদিসটি তারা দু'জন যেমন বলেছেন তেমনই।

- **সোনার নিসাব পূর্ণ না হলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে না।** আর সে নিসাব হলো, ২০ দিনার। কারণ,

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার ব্যাপারে বলেছেন,

«وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا»

'(স্বর্ণের যাকাত হিসেবে) তোমার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না যাবৎ তোমার কাছে বিশ দিনার পরিমাণ স্বর্ণ না হবে।'[197]

* দিনার বলতে ইসলামী দিনার উদ্দেশ্য যার ওজন এক মিছকাল। মিছকাল সমান সোয়া চার গ্রাম। সে হিসাবে সোনার নিসাব হলো ৮৫ গ্রাম। যা সা'উদী মাপে এগার জুনাইহ ও এক জুনাইহ এর তিন সপ্তমাংশ।[198]

○ **রূপার নিসাব পূর্ণ না হলে তাতে যাকাত ফরয নয়। আর তার নেসাব হলো: পাঁচ ওকিয়্যা। কারণ,**

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

---

১৯৭ আবু দাউদ: ১৫৭৩।

১৯৮ এ দেশীয় মাপে ৭.৫ ভরি হয়। [অনুবাদক ও সম্পাদক]

‘পাঁচ ওকিয়্যার কম রূপার ওপর যাকাত নেই।’[199]

এক ওকিয়্যা সমান ৪০ ইসলামী দিরহাম।

সে মতে রূপার হিসাব হলো: ২০০ দিরহাম।

আর এক দিরহাম হলো, এক মিসকালের সাত দশমাংশ। এর মোট ওজন ১৪০ মিসকাল, যার বর্তমান প্রচলিত ওজন হলো: ৫৯৫ গ্রাম।[200] যা আরবী ৫৬ রৌপ্য রিয়াল মুদ্রা।

রৌপ্য ও স্বর্ণের যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে, চার দশমাংশ বা ৪০ ভাগের এক ভাগ।

- **কাগজের তৈরি নোট (টাকা) এর ওপরও যাকাত ফরয;** কারণ নোটগুলো রূপার বদলেই চলমান। সুতরাং এসব রূপার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং এর মূল্যমান রূপার নিসাবের সমপরিমাণ হলে তাতে যাকাত ফরয হবে।
- সোনা-রূপা ও কাগজের নোট ইত্যাদি ওপর সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয। চাই তা হাতে মজুদ থাকুক বা অন্য কারো যিম্মাদারীতে থাকুক।

---

[১৯৯] বুখারী: ১৪৫৯; মুসলিম: ৯৭৯।

[২০০] যা এ দেশীয় মাপে ৫২.৫ ভরি। [অনুবাদক ও সম্পাদক]

এ থেকে বুঝা যায়, সব ধরনের ঋণ, চাই তা কর্জ হোক বা বিক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য হোক কিংবা ভাড়া বা এ ধরনের যা-ই হোক না কেন, তার ওপর যাকাত ফরয। তারপর যদি সে ঋণ এমন লোকের কাছে থাকে যে সচ্ছল এবং সহজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন সে প্রতি বছর অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে এসবের যাকাত দিবে, অথবা সে ঋণ আদায় করা পর্যন্ত দেরী করে যত বছর যাকাত দেয় নি তত বছরের যাকাত হিসেব করে আদায় করবে।

আর যদি দরিদ্র বা ঋণ আদায়ে টালবাহানাকারী লোককে ঋণ দেয়া থাকে, যার কাছ থেকে সেটা আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে ঋণ আদায় হওয়ার পর শুধু ওই ঋণ উসুল করা বছরের যাকাত প্রদান করবে; পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে না।

- **সোনা-রূপা ছাড়া অন্য সকল খনিজ পদার্থ যদিও তা আরও মূল্যবান হয়, তাতে যাকাত ফরয নয়।** তবে তা যদি ব্যবসার পণ্য হয়ে থাকে; তাহলে নিসাব পূর্ণ হলে অবশ্যই ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

চতুর্থ প্রকার: ব্যবসায়ী পণ্য

ব্যবসায়ী পণ্য বলতে বুঝায়: এমন যাবতীয় বস্তু যা দ্বারা মুনাফা অর্জন কিংবা ব্যবসার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। যেমন, জমি, জীব-জন্তু, খাবার, পানীয় ও গাড়ী ইত্যাদি সব ধরনের সম্পদ।

সুতরাং বছরান্তে সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে তার চার দশমাংশ বা ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। চাই সেটার মূল্যমান ক্রয়মূল্যের সমপরিমান হোক, অথবা কম হোক অথবা বেশি হোক।

মুদি দোকানদার, মেশিনারি দোকানদার বা খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রেতা ও এ জাতীয় ব্যবসায়ীদের কর্তব্য হলো, ছোট বড় সকল অংশের মূল্য নির্ধারণ করে নেবে, যাতে কোনো কিছু বাদ না পড়ে। পরিমাণ নির্ণয়ে যদি জটিলতা দেখা দেয়, তাহলে সতর্কতামূলক বেশি দাম ধরে যাকাত আদায় করবে, যাতে সে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বমুক্ত হতে পারে।

○ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু যথা খাবার, পানীয়, বিছানা, আসবাবপত্র, থাকার ঘর, বাহন, গাড়ী, পোশাকের (ব্যবহার্য সোনা-রূপা ছাড়া) ওপর **যাকাত নেই**। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ».

'মুসলিমের দাস-দাসী, ঘোড়ার ওপর যাকাত নেই।'[201]

○ অনুরূপভাবে ভাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত পণ্য যেমন জমি-জমা, গাড়ী ইত্যাদির ওপর **যাকাত আসবে না।** তবে সেসব থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর বছর পূর্তির পর সেটা দ্বারা স্বয়ং নিসাব পূর্ণ হোক বা এ জাতীয় অন্য সম্পদের সাথে মিশে নিসাব পূর্ণ হোক তাতে যাকাত দেয়া ফরয হবে।

○ **প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!** তোমরা তোমাদের সম্পদের যাকাত যথাযথভাবে আদায় কর, আর এতে তোমাদের মন যেন খুশী থাকে। বস্তুত এটা লাভজনক, জরিমানামূলক নয়। মুনাফাস্বরূপ, ক্ষতিস্বরূপ নয়। তোমরা তোমাদের সকল যাকাতযোগ্য সম্পদ ভালোকরে হিসেব কর। আর আল্লাহর কাছে যা তোমরা ব্যয় কর তা কবুল করার জন্য এবং যা তোমাদের কাছে অবশিষ্ট রেখেছ তাতে বরকত দেওয়ার জন্য প্রার্থনা কর।

আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর।

---

[২০১] বুখারী: ১৪৬৪; মুসলিম: ৯৮২।

সপ্তদশ আসর

যারা যাকাতের হকদার

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি নিচু করলে উপরে তোলার কেউ নেই, আর তিনি উপরে উঠালে নিচু করার কেউ নেই। তিনি দান করলে বাধা দেওয়ার কেউ নেই, তিনি নিষেধ করলে দেওয়ার কেউ নেই। তিনি যে সম্পর্ক ঠিক রেখেছেন তা কাটার কারও ক্ষমতা নেই, তিনি যে সম্পর্ক কর্তন করেছেন তা জোড়া দেওয়ার কেউ নেই। সুতরাং কতই না পবিত্র তিনি! তিনি মহা পরিচালক, প্রাজ্ঞ ও দয়ালু ইলাহ, তাঁর প্রাজ্ঞতার কারণেই ক্ষতি অনুষ্ঠিত হয় আর তার রহমতেই উপকার সাধিত হয়। আমি তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের উপর তাঁর প্রশংসা করি, তার প্রশস্ত ব্যাপক দানের কারণে তার শুকরিয়া আদায় করি।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, যা শরীয়ত হিসেবে দিয়েছেন তা দক্ষতার সাথে দিয়েছেন, যা তৈরী করেছেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে তা করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ

তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে তিনি এমন সময় পাঠিয়েছেন যখন কুফরি উপরে উঠেছিল এবং উঁচু হয়ে গিয়েছিল, আক্রমণ করেছিল, জমায়েত হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে উঁচু অবস্থান থেকে সেটাকে নীচে নামিয়ে রেখেছিলেন এবং দমন করেছিলেন, আর যারা ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়েছিল তিনি তাদেরকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাঁর উপর সালাত পেশ করুন, অনুরূপ তাঁর সাথী আবু বকরের উপর, যার বীরত্বের তারকা মুরতাদদের সাথে যুদ্ধে দেখা দিয়েছিল এবং উদিত হয়েছিল। আর 'উমারের উপর, যার দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে করেছেন সম্মানিত ও অপ্রতিরোধ্য। তদ্রূপ 'উসমানের উপর, যিনি মাযলুমভাবে নিহত হয়েছিলেন। অনুরূপ আলীর উপর, যিনি তাঁর জিহাদ দ্বারা কুফরিকে করেছেন বিনষ্ট ও দমন। তাছাড়া রাসূলের সকল পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর, যতদিন সালাত আদায়কারীরা সিজদা ও রুকু করবে। আর আল্লাহ তাঁদের উপর যথাযথ সালামও পেশ করুন।

○ **প্রিয় ভাইয়েরা!**

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: ٦٠]

‘নিশ্চয়ই ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী, (ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের) হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে জিহাদে রত এবং মুসাফিরগণ যাকাতের হকদার, এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ২০}

এ মহতী আয়াতে: আল্লাহ তা‘আলা যাকাত ব্যয়ের খাত ও তার হকদারদের বিষয়টি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ইনসাফ ও দয়া অনুসারে ওই আট প্রকারে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, এদের মাঝেই যাকাত বণ্টন করা আবশ্যকীয় ফরয। আর এ বণ্টন আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে উত্থিত। সুতরাং এর ব্যতিক্রম করা ও যাকাতকে অন্য খাতে ব্যবহার করা জায়েয নেই। কারণ, আল্লাহ তা‘আলাই তাঁর সৃষ্টির কল্যাণ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন এবং

প্রত্যেক বিষয়কে তার যথাস্থানে রাখতে তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার অধিকারী।

﴿ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ ﴾ [المائدة: ٥٠]

“আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? {সূরা আল-মায়িদাহ্, আয়াত: ৫০}

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার হকদার: ফকীর ও মিসকীন

এরা হলো ওই সকল লোক, যাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের নগদ অর্থ, বেতন ভাতা, প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও আয় রোজগার যথেষ্ট নয়। অন্যের সাহায্য সহায়তার প্রয়োজন হয়।

* উলামায়ে কেরামের মতে, এদেরকে এ পরিমাণ যাকাতের অংশ দেয়া উচিত, যাতে সামনের বছর যাকাতের সময় আসা পর্যন্ত আর অর্থের প্রয়োজন না হয়।

- গরীবদের বিবাহ সম্পাদনে বিয়ের প্রয়োজন পূরণে যাকাত দেওয়া যাবে।

- গরীব দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের কিতাব ক্রয়েও দেওয়া যাবে।
- গরীব চাকরীজীবি, যাদের বেতন ভাতা নিজের ও পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়, এদেরকে প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট পরিমাণ যাকাত দেয়া উচিত।

পক্ষান্তরে যার আয়-রোজগার নিজের ও পরিবারের জন্য যথেষ্ট, তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। তাকে বরং এ অবৈধ যাচনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান করাই কর্তব্য। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

* আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»

‘মানুষের কাছে ব্যক্তি চাইতে থাকে, এমনকি কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে তার চেহারায় কোনো গোশত অবশিষ্ট থাকবে না।’[202]

---

২০২ বুখারী: ১৪৭৪; মুসলিম: ১০৪০।

* অনুরূপ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»

'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষা চায়, সে মূলত আগুনের টুকরাই চায়, এখন সে ভিক্ষা চাওয়া বাড়াতেও পারে বা কমাতেও পারে।'[203]

* হাকীম ইবন হিযাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»

'এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় মিষ্ট ভোগ উপকরণ। সুতরাং যে একে গ্রহণ করে অন্তরের বদান্যতার সঙ্গে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে একে গ্রহণ করে আগ্রহ আতিশয্যের সঙ্গে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় না। যেমন

[২০৩] মুসলিম: ১০৪১।

ওই ব্যক্তি যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উচু হাত নিচু হাতের চেয়ে শ্রেয়।’[204]

* আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« وَلا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»

‘যে ব্যক্তি ভিক্ষার পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেন।’[205]

যদি অপরিচিত লোক যাকাত প্রার্থনা করে যার মধ্যে ধনাঢ্যতার ছাপ স্পষ্ট, তাকে দান করা যাবে। তবে তাকে এ কথা জানিয়ে দিতে হবে যে ধনী এবং কামাই করতে সক্ষমদের জন্য যাকাতে কোনো অংশ নাই। কেননা,

* হাদীসে আছে, একবার দু’জন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যাকাতের অর্থ থেকে কিছু চাইলো। তিনি তাদের দেখে বুঝতে পারলেন তারা সামর্থ্যবান। তাদের তিনি বললেন,

---

[২০৪] বুখারী: ১৪৭২; মুসলিম: ১০৩৫।

[২০৫] তিরমিযী: ২৩২৫; মুসনাদ আহমাদ: ১৬৭৪

«إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»

‘তোমরা চাইলে তোমাদের দেব; তবে জেনে রেখো, ধনী ও সামর্থ্যবানদের জন্য যাকাতে কোনো অংশ নেই।’[206]

তৃতীয় প্রকার: যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী

এরা হলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়, সংরক্ষণ ও যথাস্থানে ব্যয় করার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। তাদের নিজ নিজ কর্ম ও শ্রম অনুপাতে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হবে, যদিও তারা ধনী হয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ কোনো লোককে তার যাকাত বণ্টনের কাজে ওকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে, তাহলে সে যাকাতের কর্মচারী বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং তাকে ওকালতির কাজে যাকাতের কোনো অংশ দেওয়া যাবে না।

এ ওকিল বা প্রতিনিধিগণ যদি বিশ্বস্ততা ও শ্রম ব্যয় করে হকদারদের মধ্যে এ কাজ বিনা পারিশ্রমিকে সওয়াবের আশায়

---

২০৬ আহমাদ ৪/২২৪; আবূ দাউদ: ১৬৩৩; নাসাঈ: ২৫৯৭।

করে তবে অবশ্যই তারা যাকাতদাতার সওয়াবে শরীক হবেন। কারণ;

* বুখারীতে এসেছে, আবূ মুসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ»

‘বিশ্বস্ত মুসলিম কোষাধ্যক্ষ, যিনি তাকে যা নির্দেশ করা হয় তা সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে যথাযথ ও সন্তুষ্টচিত্তে; যাকে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার জন্য তা বাস্তবায়ণ করেন -অথবা বলেছেন: প্রদান করেন, সেও দুই সদকাকারীর একজন।’[207]

আর যদি এ ওকিল বা প্রতিনিধিগণ বিনা পারিশ্রমিকে এ বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে না চায়, তবে সম্পদের মালিক তাকে নিজ সম্পদ থেকে পারিশ্রমিক প্রদান করবেন, যাকাত থেকে নয়।

[২০৭] বুখারী: ১৪৩৮; মুসলিম: ১০২৩।

চতুর্থ প্রকার: যাদের হৃদয় আকর্ষণ করা প্রয়োজন

তারা হচ্ছে এমন নতুন মুসলিম যাদের অন্তর এখনো দোদুল্যমান অথবা এমন লোক যাদের ক্ষতির আশংকা করা হয়; তাই তাদের ঈমানকে মজবুত করার জন্য অথবা তাদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য তাদেরকে যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে; যদি তাদের ক্ষতি প্রতিহত করার অন্য উপায় না থাকে।

পঞ্চম প্রকার: দাস মুক্তির জন্য

যে সকল দাস-দাসী আপন মুনিবের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের মুক্তির ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, তাদের যাকাত থেকে এ পরিমাণ অর্থ দেয়া যাবে, যাতে তারা এর মাধ্যমে মুক্তিলাভ করতে পারে।

অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে সাধারণ দাস-দাসী ক্রয় করেও মুক্ত করা যাবে।

তাছাড়া মুসলিম কয়েদিদেরকেও মুক্ত করা যাবে। কারণ এটাও দাসমুক্তির ব্যাপক নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ প্রকার: যারা ঋণের বোঝা বহন করছে

যারা ঋণের বোঝা বহন করে তারা দু'প্রকার:

১) যে ব্যক্তি সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ এবং সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলার আগুন নেভাতে গিয়ে ঋণের শিকার হয়েছে, যাকাতের অর্থ থেকে তাকে ঋণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যাবে। যেন সে এমন মহতী কাজে আরও উৎসাহিত হয়, যাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও হিংসা-বিবাদ দূর হয়ে মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

* কাবীসা ইবন মুখারিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ» قَالَ: ثُمَّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ...»

‘একবার আমি অপরের ভার (ঋণ বা সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব) নিজের উপর নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি জানিয়ে এ বিষয়ে সহযোগিতা চাইলাম। তখন তিনি বললেন, ‘হে কাবীসা! তুমি আমার নিকট অবস্থান কর; যাতে আমার কাছে যাকাতের মাল আসে। যখন সেটা আসবে তখন আমি তোমাকে তা প্রদান করার নির্দেশ দেব। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে কাবীসা! সাদাকা কেবল তিন ব্যক্তির জন্য হালাল: (তাদের মধ্যে একজন) ওই ব্যক্তি যে পরোপকার করতে গিয়ে ঋণী হয়েছে ফলে তার জন্য চাওয়া বৈধ; যাতে তা পরিশোধ করতে পারে। অতঃপর যাচঞা থেকে বিরত থাকে।...’[208]

২) যে ব্যক্তি নিজের বা পরিবারের প্রয়োজন পূরণে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু তার ঋণ পরিশোধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাকে ঋণ শোধ পরিমাণ অর্থ যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে; যদিও তার পরিমাণ বেশি হয়। অথবা তলবকৃত ব্যক্তি (ঋণী)র কাছে না দিয়ে সরাসরি তলবকারীকে অর্থ দিয়ে দেয়া যাবে।

---

[২০৮] মুসলিম: ১০৪০।

কারণ তলবকারীর কাছে অর্থ হস্তান্তরের মাধ্যমেই তলবকৃত ব্যক্তি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে।

সপ্তম প্রকার: আল্লাহর রাস্তায়

‘আল্লাহর রাস্তায়’ বলতে ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’ বুঝায়; যে জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা। নিজের বীরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব অথবা দলীয় কিংবা গোত্রীয় গোড়ামী প্রদর্শনের জন্য নয়। সুতরাং এ নিয়্যতে যে জিহাদ করবে সে মুজাহিদকে যাকাত থেকে এমন অর্থ প্রদান করা যাবে যা জিহাদের পথে তার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে। অথবা ইসলামের সাহায্য ও তার শত্রুদের বিতাড়ন এবং আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য যাকাতের অর্থ থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী কেনা যাবে।

অষ্টম প্রকার: মুসাফির

যে মুসাফিরের আসবাবপত্র শেষ হয়ে গেছে, যাকাত থেকে তাকে এ পরিমাণ অর্থ দেওয়া যাবে যাতে সে সফর পূর্ণ করে নিজ আবাসে পৌঁছুতে পারে।

এ জাতীয় মুসাফির যদি তার নিজ দেশে ধনী লোকও হয় এবং এমন কাউকে পাওয়া যায় যে তাকে ঋণও প্রদান করবে, তারপরও তাকে যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে।

তবে এভাবে যাকাতের টাকা নেওয়ার মানসিকতা নিয়ে অল্প-পরিমাণ টাকা-পয়সা নিয়ে সফরে বের হওয়া মুসাফিরের জন্য উচিত নয়।

○ **আর কোনো ক্রমেই যাকাতের সম্পদ কাফিরদেরকে দেয়া যাবে না।** তবে যদি তাদের মন আকৃষ্ট করার জন্য হয় তাহলে তা ভিন্ন কথা। অনুরূপভাবে কোনো ধনী লোক, যার কাছে তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন ব্যবসায়ী, কারিগর, শিল্পী এবং নিয়মিত বেতনভোগী, প্রচুর ফসলের মালিক অথবা অত্যাবশ্যক খরচ মেটানোর ব্যবস্থা রয়েছে এমন ব্যক্তি, তাদের কাউকেই যাকাতের সম্পদ থেকে দেয়া বৈধ হবে না। তবে তারা যদি যাকাত সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী হয় অথবা যদি তারা

আল্লাহর পথে জিহাদকারী হয় অথবা কোনো ধনী ব্যক্তি যদি সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে যাকাতের সম্পদ থেকে দেয়া যাবে।

○ উপরে বর্ণিত কাজগুলো ব্যতীত অন্য কোনো ওয়াজিব কাজ সম্পাদনের জন্য যাকাত থেকে ব্যয় করা যাবে না। সুতরাং কোনো মেহমানকে মেহমানদারীর জন্য যাকাত থেকে দেওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যাদের খোর-পোষ তার উপর ওয়াজিব, যেমন স্ত্রী বা নিকটাত্মীয়, তাদেরকে তাদের জন্য খরচের পরিবর্তে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে না। তবে স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়ের ওয়াজিব খরচ বাদে অন্য কাজে তাদের প্রয়োজনে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে। সুতরাং স্বামী যাকাত থেকে তার স্ত্রীর একান্ত ঋণ, যা সে পরিশোধ করতে অক্ষম, তা পরিশোধ করতে পারবে। অনুরূপভাবে কেউ তার পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়ের ঋণ যা তারা পরিশোধ করতে পারছে না সেটাও যাকাত থেকে পরিশোধ করতে পারবে।

○ অনুরূপভাবে নিকটাত্মীয়দের সম্পদ যদি তাদের খরচ মেটাতে অপ্রতুল হয়, তবে তাদের খরচ মেটানোর জন্য তাদেরকে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে; যদি তাদের খরচ মেটানোর দায়িত্ব যাকাতদাতার উপর ওয়াজিব না হয়।

○ তদ্রূপ কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে ঋণ পরিশোধ বা এ জাতীয় কাজের জন্য যাকাতের সম্পদ থেকে দিতে পারবে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা যাকাতের হকদার করার বিষয়টি এমন সাধারণ গুণাগুণের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন যা তাদেরকে ও অন্যান্যদেরকে সমভাবে সম্পৃক্ত করে। সুতরাং নস তথা কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য অথব ইজমা ব্যতীত তাদেরকে হকদারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। তাছাড়া এর সপক্ষে হাদীসও রয়েছে। যেমন,

* বুখারী ও মুসলিমে ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পত্নী যায়নাব সাকাফিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের সাদাকাহ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন,

«يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»

“হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিছু গহনা আছে, আমি এটা দ্বারা সাদাকা করতে চাই। এদিকে ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মনে করলেন তিনিই সাদাকার যোগ্য হকদার। বিষয়টি জেনে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবন মাসঊদ ঠিকই বলেছেন; তুমি যাদের কাছে তা সাদাকা করবে তাদের মধ্যে তোমার স্বামী ও সন্তানরাই এর অধিক হকদার।’[209]

* সালমান ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ».

‘ফকীর-মিসকীনকে সাদাকাহ দিলে শুধু সাদাকাই করা হয় আর আত্মীয়দের সাদাকাহ দিলে দুটি কাজ হয়: সাদাকাহও দেওয়া হয় আবার আত্মীয়তার সম্পর্কও রক্ষা করা হয়।’[210]

○ কোনো দরিদ্র লোকের কাছে প্রাপ্য ঋণ মাফ করে দিয়ে যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে না। কারণ,

- যাকাত হলো গ্রহণ ও প্রদানের সমষ্টি।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

---

২০৯ বুখারী: ১৪৬২।

২১০ ইবন মাজাহ: ১৪৮৮; নাসাঈ: ২৫৮২।

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

'আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নিন, এর মাধ্যমে তাদেরকে আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। আর তাদের জন্য দো'আ করুন, নিশ্চয় আপনার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৩}

* আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ».

'আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন, ধনীদের থেকে তা নেয়া হবে আর দরিদ্রদের দেয়া হবে।'[211]

আর ঋণ মাফ করার মধ্যে যেহেতু এ আদান-প্রদান নেই, সেহেতু তা দিয়ে যাকাত আদায় হবে না।

- তাছাড়া ফকীরের যিম্মায় যে ঋণ রয়েছে তা অনুপস্থিত ঋণ, যাতে কোনো কিছু করার নেই, তাই সেটা উপস্থিত

[২১১] বুখারী: ১৩৯৫; মুসলিম: ৩৩২।

সম্পদ যাতে কিছু করার আছে সেটার জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

- অনুরূপভাবে ঋণের ব্যাপারটি উপস্থিত সম্পদের চেয়ে অন্তরে কমই প্রভাব ফেলে, তাই সেটা দিয়ে ঋণ দেওয়া যেন ভালোর বদলে মন্দ প্রদান করা।

○ আর যদি যাকাতদাতা তার প্রচেষ্টা চালানোর পর যাকাতের হকদার মনে করে কাউকে যাকাত দেয়, তারপর জানতে পারে যে সে যাকাতের হকদার নয়, এমতাবস্থায় যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ সে তার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেছে ও আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না।

* আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত লম্বা হাদীসের অংশবিশেষ হলো:

«قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَأُتِىَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ وَلَعَلَّ الْغَنِىَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ».

'(পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য হতে) এক ব্যক্তি শপথ করে বলল, আজ রাতে আমি সাদাকাহ্ করব... তাতে এসেছে, "পরে সে এক ধনী লোককে (না জেনে) সাদাকাহ্ দিয়ে বসল। এতে

লোকেরা তার সমালোচনা করে বলতে লাগলো যে ধনীকে সাদাকাহ দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ আপনার প্রশংসা, যদিও আমি ধনীকে দিয়েছি।... অতঃপর লোকটিকে স্বপ্নে এসে জানানো হলো যে, ওই ধনী লোক সম্ভবত এ থেকে শিক্ষা নেবে এবং তাকে আল্লাহ যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে সে দান করবে।'[212] সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় স্পষ্ট এসেছে যে, তাকে স্বপ্নে এসে বলা হলো যে, তোমার সাদাকাহ্ গৃহীহ হয়েছে। ... আর ওই ধনী লোক...।

* মা'আন ইবন ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«كَانَ أَبِى يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ . فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ » .

'আমার বাবা ইয়াযীদ দান করার উদ্দেশে স্বর্ণমুদ্রা মসজিদে এক ব্যক্তির কাছে রাখলেন। অতঃপর আমি সেখানে গিয়ে তা গ্রহণ করলাম, তারপর সেটা নিয়ে তার কাছে এলাম। তিনি

---

২১২ বুখারী: ১৪২১; মুসলিম: ১০২২।

বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাকে দেব এমন নিয়ত করিনি। তখন আমি এর সমাধানের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, ‘হে ইয়াযীদ তুমি যা নিয়ত করেছ তাই পাবে আর হে মা‘আন তুমি যা গ্রহণ করেছে তাই তোমার’।’[213]

- ভাই সকল! যাকাত ততক্ষণ আদায় হবে না যতক্ষণ না তা তার সঠিক ও উপযুক্ত স্থান যেখানে আল্লাহ দিতে বলেছেন সেখানে দেওয়া হবে।
- সুতরাং, আল্লাহ তোমাদেরকে রহমত করুন, তোমরা সকলে যাকাতকে তার সঠিক ও যথাযথ স্থানে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাও ও যত্নবান হও; যাতে তোমরা দায়িত্বমুক্ত হও, তোমাদের সম্পদ পবিত্র হয়, তোমাদের রবের নির্দেশ বাস্তবায়িত হয় এবং তোমাদের সাদাকাসমূহ কবুল হয়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

  আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য, আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর।

---

[২১৩] বুখারী: ১৪২২।

অষ্টাদশ আসর

বদর যুদ্ধ

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি শক্তিশালী সুদৃঢ়, পদানতকারী বিজয়ী কর্তৃত্বশীল, প্রকাশ্য সত্য, মৃদু কান্নার শব্দও যার শ্রবণ থেকে গোপন থাকে না, যার মহত্বের কাছে ক্ষমতাধর নরপতিরা হীন হয়ে গেছে। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী ফয়সালা করেন, আর তিনি মহাবিচারক।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি পূর্বের ও পরের সবার ইলাহ। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাঁকে তিনি সকল সৃষ্টিকুল থেকে বেঁছে নিয়েছেন, বদর প্রান্তরে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ তাঁর উপর সালাত পেশ করুন, অনুরূপ তার পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের অনুসারীদের সবার উপর। আর তিনি তাদের উপর যথাযথ সালামও প্রদান করুন।

- **সম্মানিত ভাইয়েরা!** এ পবিত্র মাসেই আল্লাহ তা‘আলা মহান বদর যুদ্ধে মুসলিমদেরকে তাদের শত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা এ দিবসকে ‘ইয়াওমুল ফুরকান’ তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের দিন বলে নাম রেখেছেন; কেননা আল্লাহ তা‘আলা সেদিন তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের বিজয়ী এবং কাফির ও মুশরিকদের পরাজিত করার মাধ্যমে হক্ক ও বাতিলের পার্থক্য সূচিত করেছেন।
- **এ মহা বিজয়ের ঘটনাটি ঘটেছিল** দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে।
- **এ যুদ্ধের কারণ ছিল,** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মর্মে সংবাদ পেলেন যে, আবূ সুফিয়ান কুরাইশ কাফিরদের একটি বানিজ্য দল নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কা ফিরছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে কুরাইশদের বানিজ্য কাফেলার গতিরোধের জন্য বের হওয়ার আহ্বান জানালেন। কেননা কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের মাঝে কোনো প্রকার চুক্তি ছিল না। আর কাফির কুরাইশরা মুসলিমদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদ হতে বের করে দিয়েছিল এবং ইসলামের সত্যবাণীর দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ বানিজ্য কাফেলার সাথে যা করার ইচ্ছা করেছিলেন তা ছিল যথার্থ।

○ **অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩১০** এর বেশি কিছু সাহাবীকে নিয়ে বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। তাদের ছিল কেবলমাত্র দুটি ঘোড়া ও সত্তরটি উট; যাতে তারা পালাক্রমে চড়ছিলেন। এ যুদ্ধে ৭০ জন মুহাজির এবং অন্যরা আনসার মুজাহিদ ছিলেন। তারা বানিজ্য কাফেলা ধরতে চেয়েছিলেন, যুদ্ধ করতে চান নি। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা অনির্ধারিত সময়ে তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম ও শত্রুদের মাঝে মুখোমুখি দাঁড় করালেন।

আবূ সুফিয়ান মুসলিমদের অবস্থা জানতে পেরে কুরাইশদের কাছে এ মর্মে একজন চিৎকারকারী সংবাদবাহক পাঠায় যেন কুরাইশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। তাই আবূ সুফিয়ান রাস্তা পরিবর্তন করে সমুদ্র উপকূল ধরে রওয়ানা দিল এবং নিরাপদে পৌঁছে গেল।

○ **কিন্তু কুরাইশ সম্প্রদায়;** তাদের কাছে চিৎকারকারীর মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছা মাত্রই তাদের নেতৃস্থানীয় একহাজার লোক সদলবলে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। তাদের ছিল ১০০টি অশ্ব ও ৭০০ উষ্ট্র। তারা বের হয়েছিল

﴿بَطَرٗا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٞ ٤٧﴾ [الانفال: ٤٧]

‘অহঙ্কার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা প্রদান করতে, আর তারা যা করছিল, আল্লাহ তা পরিবেষ্টনকারী।’ {সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৭}

তাদের সঙ্গে ছিলো নর্তকী দল, যারা মুসলিমদের বদনামি ও বিদ্রূপ করে গান গাইছিলো। আবূ সুফিয়ান যখন কুরাইশদের যাত্রার কথা জানতে পারল, তখন সে নিজের নিরাপদে ফিরে আসার সংবাদ জানিয়ে কুরাইশদের যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে যেতে অনুরোধ করল। কিন্তু কুরাইশ বাহিনী যুদ্ধ ছাড়া পিছু ফিরে যেতে অস্বীকার করল।

আবূ জেহেল বলল, “আল্লাহর শপথ, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বদর প্রান্তরে না পৌঁছব ততক্ষণ ফিরে যাব না। আমরা বদর প্রান্তরে তিনদিন অবস্থান করব। তথায় উট জবাই করব, খাদ্য খাব, মদ পান করব আর তাতে আরব জাতি আমাদের গৌবরগাথা শুনে সর্বদা ভয় পাবে”।

○ **অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম** যখন কুরাইশদের বের হবার খবর জানতে পারলেন, সাহাবীদের একত্র করে পরামর্শে বসলেন। তাদের উদ্দেশে তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন

দু’টি দলের একটি (মুসলিমদের মাধ্যমে পদানত হবে) হয়তো ব্যবসায়ী কাফেলা অথবা অন্যটি সৈন্যবাহিনী।’

* অতঃপর মুহাজির সাহাবী মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হোন। আল্লাহর শপথ! আমরা আপনাকে এমন কথা বলব না, যেমন মুসা (‘আলাইহিস সালাম) কে তাঁর জাতি বনী ইসরাইল বলেছিল:

﴿ٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ٢٤﴾ [المائدة: ٢٤]

‘হে মুসা! তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। আমরা এখানে বসে থাকলাম।’ {সূরা আল-মায়িদাহ্, আয়াত: ২৪} বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে এবং পিছনে যুদ্ধ করব।

* এ কথা শুনে আউস গোত্রের নেতা সা‘দ ইবন মু‘আয আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সম্ভবত আপনি আনসারদের ব্যাপারে এ আশংকা করছেন যে, তাদের অধিকার আছে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে দূরে আপনাকে

সাহায্য না করার। তাই আমি আনসারদের পক্ষ থেকে বলছি এবং তাদের পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছি, যে দিকে আপনি চলুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা আপনি সম্পর্ক গড়ে তুলুন, যার থেকে ইচ্ছা সম্পর্ক কর্তন করুন, আমাদের সম্পদ হতে যা ইচ্ছা গ্রহণ করুন, তন্মধ্য হতে যা ইচ্ছা আমাদের দান করুন, আপনি যা আমাদের জন্য ছেড়ে যাবেন তার চেয়ে যা আমাদের থেকে গ্রহণ করবেন তা-ই আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। আপনি আমাদের যা নির্দেশ দেবেন আমাদের নির্দেশ সেখানে আপনার নির্দেশের অনুগামী হবে। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাদের নিয়ে গামদান হতে বুরাক পর্যন্ত চলেন, তাহলে অবশ্যই আমরা আপনার সঙ্গে চলব। আর যদি আপনি আমাদের এ সাগরে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমরা তাই করব। আমরা এটা পছন্দ করি না যে, আপনি আগামী দিন আমাদের নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করবেন। নিশ্চয় আমরা যুদ্ধে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, শত্রুদের মোকাবিলায় সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানকারী। আমরা আশা রাখি আল্লাহ আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখাবেন যদ্বারা আপনার চক্ষু শীতল হবে।

○ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের কথা শুনে খুশি হয়ে সুসংবাদ দিয়ে বললেন:

«سَيْرُوا وأبْشِرُوا فَوالله لَكَأنِّي أنْظُرَ إلى مَصارِعِ القومِ»

‘তোমরা চলতে থাক আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর শপথ, আমি যেন (মুশরিক) গোষ্ঠীর মৃত দেহ পড়ে থাকার জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছি।’[214]

○ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৈন্যদল সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে চললেন এবং বদর কূপসমূহের কাছের পানির কূপের সম্মুখে যাত্রাবিরতি দিলেন। হুবাব ইবনুল মুনযির ইবন ‘আমর ইবনুল জুমুহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি এমন স্থান যেখানে অবস্থানের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, যা থেকে আমাদের এদিক-সেদিক যাওয়ার সুযোগ নেই; নাকি এটা যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মকৌশল ও অভিমত?

উত্তরে তিনি বললেন, বরং এটা যুদ্ধ সংক্রান্ত কৌশল ও সিদ্ধান্ত। হুবাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো ভালো স্থান নয়, তাই

---

[২১৪] দালায়েলুন নাবুওয়াহ: ৩/৩৪। ইবন হিশাম ফিস সীরাহ, ১/৬২৫; ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: ২/৩৯৫।

আমাদেরকে কুরায়েশের নিকটবর্তী কূপের নিকট নিয়ে চলুন। সেখানে আমরা অবস্থান করব এবং এর পিছনের কূপগুলো নষ্ট করব। অতঃপর সে কূপের কাছে হাওজ বানিয়ে তা পানি দিয়ে পূর্ণ করে রাখব, ফলে আমরা পানি পান করব অথচ তারা পানি পান করতে পারবে না।[215]

এ মতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন। এরপর তারা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনার দিক থেকে নিকটবর্তী ‘উদওয়াতুদ দুনিয়া’তে (উপত্যকার নিকটবর্তী অংশে) অবতরণ করলেন, অন্য দিকে কুরাইশরা মক্কার দিক থেকে ‘উদওয়াতুল কুসওয়া’তে (উপত্যকা থেকে দূরের অংশে) অবস্থান করল। ওই রাতেই আল্লাহ তা‘আলা এমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন যা কাফিরদের জন্য বিরাট বিপদ ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাদের মাটি কাদা ও পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। ফলে তারা সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেনি। অপরদিকে বৃষ্টি মুসলিমদের জন্য খুব হাল্কা ছিল ফলে তা তাদেরকে পবিত্র করল এবং তাদের যমীনকে চলাচল উপযোগী করে দিল, বালুকে শক্ত

---

[২১৫] সীরাতে ইবন হিশাম: ১/৬২০; বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৬৭; যাদুল মা‘আদ ৩/১৭৫।

করল, অবস্থানকে অনুকুল করল এবং পদসমূহে স্থিরতা প্রদান করল।

- আর মুসলিমরা যুদ্ধের মাঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উঁচু স্থানে একটি তাঁবু বানালেন, যেখান থেকে যুদ্ধের ময়দান দেখা যায়, তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে নামলেন, সাহাবীগণের কাতার সুন্দর করে সাজালেন, যুদ্ধের ময়দানে চলতে থাকলেন এবং মুশরিকদের পতনের স্থল ও হত্যার স্থানসমূহের দিকে ইঙ্গিত করতে থাকলেন, আর তিনি বলছিলেন, “আল্লাহ চাহেত এটা অমুকের পতিত হওয়ার জায়গা, এটা অমুকের মৃত্যুস্থান।” পরবর্তীতে দেখা গেল যে, রাসূলের ইঙ্গিতের জায়গা থেকে ঐ লোকদের মৃত্যু সামান্যও হেরফের হয়নি।[216] ।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবী মুসলিম মুজাহিদ এবং কাফির কুরাইশদের দিকে তাকালেন। আল্লাহর কাছে দু’হাত তুলে দো‘আ করে বললেন, “হে আল্লাহ! এ কাফির কুরাইশ দল অহংকার ও গর্বোদ্ধত হয়ে এখানে এসেছে তাদের যাবতীয় সৈন্য-সামন্ত নিয়ে, আপনার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করছে এবং আপনার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

---

[২১৬] আহমাদ ১/১১৭; অনুরূপ মুসলিম: ১৭৭৯।

করছে। হে আল্লাহ! এ কঠিন মুহূর্তে আপনি আমাকে সাহায্য করুন, যার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বাস্তাবায়ন করুন। হে আল্লাহ আমি আপনার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকারের বাস্তবায়ণ চাই। হে আল্লাহ, আপনি যদি চান তো আপনার ইবাদত করা হবে না। হে আল্লাহ! যদি এ মুসলিম দলকে আপনি ধ্বংস করে দেন, তাহলে আজ থেকে আপনার ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না।”[217]

○ মুসলিমগণ স্বীয় রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর কাছে উদ্ধার কামনা করলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের ডাকে সাড়া দিলেন।

﴿إِذۡ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمۡ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ سَأُلۡقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعۡبَ فَٱضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلۡأَعۡنَاقِ وَٱضۡرِبُواْ مِنۡهُمۡ كُلَّ بَنَانٖ ١٢ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٣ ذَٰلِكُمۡ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٤﴾ [الانفال: ١٢، ١٤]

‘স্মরণ কর, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে অনড় রাখ। অচিরেই আমি

---

[২১৭] মুসলিম : ১৭৬৩।

ভীতি ঢেলে দেব তাদের হৃদয়ে যারা কুফরী করেছে। অতএব তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে। এটি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। এটি আযাব, সুতরাং তোমরা তা আস্বাদন কর। আর নিশ্চয় কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের আযাব।’ {সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ১২-১৪}

অতঃপর দু’টি দল (মুসলিম ও মুশরিক) পরস্পর মুখোমুখি হল এবং যুদ্ধ চলতে থাকল এবং প্রচণ্ড রূপ লাভ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুতে অবস্থান করলেন। তার সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও সা‘দ ইবন মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। তারা দু’জনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারা দিচ্ছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রবের নিকট দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাতর প্রার্থনা জানালেন, সাহায্য ও বিজয়ের প্রার্থনা করলেন, উদ্ধার চাইলেন। তারপর রাসূল সামান্যতম সময়ের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন, তারপর এ অবস্থা থেকে বের হয়ে বললেন, “অবশ্যই কাফিররা পরাজিত

হবে এবং পৃষ্ঠদেশ দেখিয়ে পলায়ন করবে।” [সূরা আল-কামার: ৪৫][218]

○ আর তিনি মুসলিম যোদ্ধাদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বললেন, “ওই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আজ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের আশায় সামনে অগ্রসর হয়ে পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন না করে যুদ্ধ করে মারা যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” এ কথা শুনে ‘উমাইর ইবনুল হুমাম আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দাঁড়ালেন, আর তার হাতে ছিল কিছু খেজুর; যা তিনি খাচ্ছিলেন; তিনি বলতে লাগলেন: হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাত কি আকাশ ও জমিন পরিমাণ প্রশস্ত? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তখন ‘উমাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, বিরাট ব্যাপার, বিরাট ব্যাপার, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাঝে আর জান্নাতে প্রবেশের মাঝে পার্থক্য এতটুকুই যে, ওই কাফিররা আমাকে হত্যা করবে। আমি যদি এ খেজুরগুলো খাওয়া শেষ করা পরিমান সময় জীবিত থাকি তাহলে তো অনেক লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে, এ কথা বলেই তিনি খেজুরগুলো নিক্ষেপ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ

---

[২১৮] দেখুন, বুখারী: ৩৯৫৩।

করলেন এবং নিহত হলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন।[219]

- আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি মাটি বা পাথর নিয়ে কাফির দলের প্রতি ছুঁড়ে মারলেন, রাসূলের নিক্ষিপ্ত পাথর তাদের সকলের চোখে বিদ্ধ হল। তাদের সকলের চোখেই সেটা পূর্ণ করে দিল, তারা তাদের চোখের মাটি ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল; যা ছিল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। ফলে মুশরিক সৈন্যদের পরাজয় হল এবং তারা যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করে পলায়ন করল। আর মুসলিমগণ তাদের পিছু নিয়ে তাদের হত্যা ও বন্দি করা অব্যাহত রাখল। এভাবে তাদের ৭০ জন কাফির নিহত ও ৭০ জন বন্দি হল। নিহতের মধ্যকার ২৪ জন কাফির কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বদরের একটি নর্দমাক্ত কূপে নিক্ষেপ করা হলো। এদের মধ্যে ছিল আবূ জাহল, শায়বা ইবন রবী‘আ ও তার ভাই ‘উতবা এবং তার ছেলে অলীদ ইবন ‘উতবা।

* সহীহ বুখারীতে ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হয়ে কাফির কুরাইশদের এ চারজনের বিরুদ্ধে বদ দো‘আ করেছিলেন”। ইবন মাস‘ঊদ বলেন, আমি

---

[২১৯] মুসলিম: ১৯০১।

আল্লাহর সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, নিশ্চয়ই আমি এ কাফির কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে মৃত দেখতে পেয়েছি; সূর্য তাদের চেহারাগুলোকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। আর সেদিন খুব গরম ছিল।”[220]

* অনুরূপভাবে বুখারীতে আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের দিন ২৪ জন কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বদরের নিকৃষ্ট কূপের মধ্যে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল যে, তিনি কারও উপর বিজয়ী হলে সেখানে তিন দিন অবস্থান করতেন। সে অনুসারে বদরের তৃতীয় দিনে তিনি তাঁর বাহন প্রস্তুতের নির্দেশ দিলেন, তা বাঁধা হলে তিনি চলতে লাগলেন সাহাবীগণ তাঁর পিছু নিলেন। অবশেষে তিনি কূপের পার্শ্বদেশে দাঁড়ালেন এবং প্রত্যেকের নাম ও পিতার নাম ধরে ডাকলেন এবং বলতে লাগলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক, আজ তোমাদের জন্য কি এটা আনন্দদায়ক হত না, যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে? আমাদের রব আমাদের বিজয় দান করার ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা যথার্থ পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদা

---

[২২০] বুখারী: ৩৯৬০।

পেয়েছ? ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন লোকদের সঙ্গে কি কথা বলছেন যাদের দেহ আছে কিন্তু আত্মা নেই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ

ওই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি তাদের সঙ্গে যা বলছি, তোমরা তা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাচ্ছ না।”[221]

○ **আর বন্দীদের ব্যাপার:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে সাহাবীদের পরামর্শ চাইলেন। সা‘দ ইবন মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে তাদের বিষয়টি খুবই মারাত্মক ও খারাপ মনে হয়েছে, তাই তিনি বললেন, এটাই সর্বপ্রথম ঘটনা যা আল্লাহ মুশরিকদের উপর ঘটিয়েছেন। আর যুদ্ধে রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া আমার কাছে তাদেরকে জীবিত রাখার চেয়েও বেশি প্রিয়।

* ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি মনে করি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনুমতি থাকলে আমরা কাফিরদের ঘাড়ে আঘাত করে হত্যা করব। অতএব আলীকে (রাদিয়াল্লাহু

---

২২১ বুখারী: ৩৯৭৬।

‘আনহু) আকীলের ব্যাপারে নির্দেশ দিন, তিনি যেন তাকে হত্যা করেন। আর আমাকে অমুকের (যিনি তার আত্মীয় ছিলেন তার) ব্যাপারে অনুমতি দিন তার ঘাড়ে আমি এখনিই আঘাত হানব। কেননা এরা সকলেই কাফির নেতৃবৃন্দ ও প্রধান ব্যক্তিবর্গ।”

* আর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “এরা তো আমাদেরই চাচাতো ভাই, আমাদেরই গোষ্ঠীর লোক। তাই আমি মনে করি, তাদের কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হোক। এতে করে কাফিরদের উপর আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, তাছাড়া হতে পারে তাদেরকে আল্লাহ ইসলামের প্রতি হেদায়াত করবেন।”[222]

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনিময় (মুক্তিপণ) গ্রহণ করলেন। তাদের সর্বোচ্চ বিনিময়ের পরিমাণ ছিল ৪০০০ দিরহাম থেকে শুরু করে ১০০০ দিরহাম পর্যন্ত।

- **আর তাদের কেউ কেউ** মদীনায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়া-লেখা করানোর মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করল।

---

[২২২] দেখুন, মুসলিম: ১৭৬৩।

- **কেউ** মুক্তি পেল কুরাইশের কাছে বন্দি মুসলিমের মুক্তির বিনিময়ে।
- **আবার কাউকে** মুসলিমদের প্রতি কঠিন কষ্টদায়ক আচরনের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা করলেন।
- **আবার কাউকে** তিনি বিশেষ স্বার্থের কারণে দয়া করে বিনা বিনিময়েই মুক্ত করে দিলেন।

- **এ হচ্ছে বদর যুদ্ধ।** যে যুদ্ধে অল্প সংখ্যক সৈন্যবাহিনী বেশি সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর ওপর বিজয় অর্জন করেছিল।

﴿ فِئَةٞ تُقَٰتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخۡرَىٰ كَافِرَةٞ ﴾ [ال عمران: ١٣]

‘একটি দল লড়াই করছিল আল্লাহর পথে এবং অপর দলটি কাফির। {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩}

অল্প সংখ্যক লোকের দলটি বিজয় অর্জন করেছিল। কেননা তারা আল্লাহর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা আল্লাহর দ্বীনের কালেমা বুলন্দ করার জন্য ও আল্লাহর দ্বীনের পক্ষে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ করেছিল। ফলে মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেছিলেন। অতএব হে মুসলিম ভাইসব! আপনারা দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন; যাতে আপনাদের শত্রুদের ওপর বিজয়ী হতে পারেন এবং ধৈর্য ধারণ করুন, অপরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিন,

স্থির থাকুন এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। আশা করা যায় আপনারা সফল হবেন।

হে আল্লাহ! আমাদের ইসলাম দিয়ে আমাদেরকে বিজয় দান করুন, আমাদেরকে আপনার দ্বীনের সাহায্যকারী এবং আপনার দ্বীনের দা‘ঈ হিসেবে কবুল করুন আর আপনার সাক্ষাতের সময় পর্যন্ত আপনি আমাদেরকে এ দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর।

ঊনবিংশ আসর

মক্কা বিজয়

আল্লাহ এ নগরকে সম্মানিত করুন

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তা পরিমিত করেছেন। প্রতিটি সৃষ্টির অবতরণস্থল ও বের হওয়ার স্থান জেনেছেন, তিনি যা চেয়েছেন তা লাওহে মাহফুজে সন্নিবেশিত করেছেন এবং লিখে রেখেছেন। সুতরাং তিনি যা সামনে নিতে চাইবেন তা কেউ পেছাতে সক্ষম হবে না, আর তিনি যা পিছনে ফেলবেন তা কেউ এগিয়ে দিতে পারবে না। তিনি যাকে অপমান করবেন তার কোনো সাহায্যকারী নেই, আর তিনি যার সাহায্য করবেন তার কোনো অপমানকারী নেই। রাজত্ব, স্থায়ী অস্তিত্ব, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে তিনি একক, সুতরাং যে কেউ এগুলোতে তার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে তাকে তিনি তুচ্ছ বানিয়ে ছাড়বেন। সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত সুতরাং তাঁর কাছে বান্দা যা গোপন বা লুকিয়ে রাখবে তা কোনোভাবেই গোপন থাকবে না। আমি তাঁর প্রশংসা করছি তাঁর সকল নেয়ামতের উপর যা তিনি

আমাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রদান করেছেন এবং সহজলভ্য করে দিয়েছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, অপরাধীর তাওবা কবুল করেছেন, তাকে তার গুনাহ থেকে মুক্ত করেছেন এবং তাকে ক্ষমা করেছেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; যার মাধ্যমে তিনি হেদায়াতের পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং আলোকিত করেছেন। আর তার মাধ্যমে শির্কের অন্ধকার ও তমাসা দূর করেছেন। আর তিনি তাঁর হাতে মক্কা বিজয়ের গৌরব তুলে দিয়েছেন, ফলে আল্লাহর ঘর থেকে মূর্তি দূর করেছেন এবং ঘরকে পবিত্র করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তার উপর সালাত পেশ করুন, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, অনুরূপ তাঁর সৎকর্মশীল সম্মানিত সাহাবীগণের উপর, আর তাঁদের সুন্দর অনুসারীর উপর, যতদিন চাঁদের পূর্ণতা ও সূক্ষ্মতা চলবে ততদিন পর্যন্ত। আর আল্লাহ তাদের উপর যথাযথ সালামও প্রদান করুন।

○ **প্রিয় ভাইয়েরা!** যেমনিভাবে এ রমযান মাসে বদর প্রান্তে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে; যাতে ইসলামকে বিজয়ী করা হয়েছে এবং তার মিনার বুলন্দ হয়েছে, তেমনিভাবে অষ্টম হিজরীর এ মাসে নিরাপদ নগরী মক্কা বিজয়ের যুদ্ধও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মক্কা নগরীকে শির্কমুক্ত ইসলামী শহরে পরিণত করেন। যেখানে শির্কের পরিবর্তে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কুফরীর পরিবর্তে ঈমান, অহংকারের পরিবর্তে ইসলাম তথা আত্মসমর্পন প্রতিষ্ঠিত হয়। এক মহাপ্রতাপশীল আল্লাহর ইবাদত ঘোষিত হলো, শির্কী মুর্তিগুলো এমনভাবে ভেঙে ফেলা হলো যে সেগুলো আর কোনোদিন জোড়া লাগেনি।

○ **এ মহান বিজয়ের কারণ সম্পর্কে বলা হয়,** যখন ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া প্রান্তরে কুরাইশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে সন্ধি হয়, তখন কেউ স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলভুক্ত হল আবর কেউ কুরাইশের দলভুক্ত। খুযা'আ গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলে যোগ দিল এবং বনু বকর কুরাইশের দলে যোগ দিল।[223]

এ গোত্রদ্বয়ের মাঝে জাহেলিয়্যাতের যুগে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল। বনূ বকর এ সন্ধির সুযোগকে কাজে লাগাল এবং খুযা'আর ওপর নিরাপদ অবস্থায় হামলা করে বসল।

[২২৩] দেখুন, যাদুল মা'আদ ২/৩৯৪, ৩৯৮।

কুরাইশরা গোপনে তাদের দলভুক্ত বনূ বকরকে জনশক্তি ও অস্ত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলভুক্ত খুযা‘আকে আক্রমণে সাহায্য করল। অতঃপর খুযা‘আ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বনূ বকরের কার্যক্রম ও কুরাইশের সাহায্য সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি অবশ্যই তোমাদের পক্ষ হয়ে তোমাদের থেকে প্রতিরোধ করব যেভাবে আমি নিজের ব্যাপারে প্রতিরোধ করে থাকি।”

○ **কিন্তু কুরাইশ;** তারা বিপদ আঁচ করতে পারল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো, তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে ফেলেছে। তাই তারা তাদের আবূ সুফিয়ানকে সন্ধি পুনর্বহাল ও মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালো। আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলল। কিন্তু রাসূল তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। এরপর সে আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার সাথে কথা বলল; যাতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ করে কিন্তু

তাতেও সে সফল হতে পারলো না, তারপর সে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সুপারিশ চেয়েও কাজ হল না। তখন আবূ সুফিয়ান আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলল, হে হাসানের পিতা! তোমার কী অভিমত? তখন তিনি বললেন, আমি এমন কিছু দেখি না যা তোমার কাজে আসবে। কিন্তু তুমি বনী কেনানার সর্দার। তুমি যাও আর লোকদেরকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দাও। আবূ সুফিয়ান বলল, আপনি কি মনে করেন এটা আমার কোনো কাজে আসবে? উত্তরে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন: না, আল্লাহর শপথ! কিন্তু এ-ছাড়া অন্য কিছু তোমার জন্য আমি পাচ্ছি না। অতঃপর আবূ সুফিয়ান তা-ই করল এবং কুরাইশদের কাছে ফিরে গেল। তখন কুরাইশের লোকেরা বলল, তোমার অভিযানের সংবাদ কী? আবূ সুফিয়ান বলল, আমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছি এবং কথাবার্তা বলেছি। আল্লাহর কসম তিনি কোনো উত্তর দেন নি। অতঃপর আমি ইবন আবি কুহাফা (আবু বকর) ও ইবনুল খাত্তাবের কাছে গিয়েছি, তার থেকেও কোনো ভালো কিছু পাইনি। অতঃপর আমি আলীর কাছে গিয়েছি, তিনি আমাকে একটি বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন; যা আমি করেছি। আমি মানুষদেরকে পরস্পরের থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়েছি। তখন তারা বলল, মুহাম্মদ কী এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন? সে বলল, না। তখন তারা বলল, তুমি ধ্বংস হও, তুমি কোনো কাজ

করতে পারো নি। বরং সে (আলী) তোমার সঙ্গে তামাশা করেছে।

- **এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম** তাঁর সাহাবীগণকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার হুকুম দিলেন। তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করলেন। আর তিনি তাঁর চারপাশের গোত্রসমূহকেও যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার আহ্বান জানালেন। এরপর এ বলে দো‘আ করলেন, “হে আল্লাহ! কুরাইশ গুপ্তচরদের কাছে আমাদের এ সংবাদ পৌঁছা বন্ধ কর, যাতে আমরা হঠাৎ করে তাদের দেশে পৌঁছুতে পারি।”[224]
- **তারপর তিনি মদীনা থেকে** প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা সাহাবী নিয়ে বের হলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূমকে মদীনার দায়িত্ব প্রদান করেন।
- **পথিমধ্যে তিনি যখন** ‘জুহফা’য় ছিলেন, তখন তাঁর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, তিনি সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করে মদীনা আসছিলেন। অতঃপর যখন তিনি আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন রাসূলের চাচা আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস ইবনে আবদিল মুত্তালিব ও তাঁর ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবন আবি উমাইয়্যা তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারা উভয়েই ছিল তাঁর ঘোর শত্রু; কিন্তু তারা উভয়ে ইসলাম

---

[২২৪] সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩৮৯।

গ্রহণ করল। রাসূল তাদের ইসলাম গ্রহণ মেনে নিলেন। তিনি আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস সম্পর্কে বললেন, “আমি আশা করি তিনি হামযার স্থলাভিষিক্ত হবেন”।[225]

○ তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার নিকটবর্তী “মাররুয যাহরান” নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি সৈন্য বাহিনীকে আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দিলেন, তারা ১০,০০০ আগুনের চুলা জ্বালালেন। আর মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রহরায় উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে নিযুক্ত করলেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরে আরোহণ করে এমন এক ব্যক্তিকে তালাশ করতে লাগলেন যে কুরাইশদের কাছে এ সংবাদ নিয়ে যাবে যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এসে যুদ্ধ পরিহার করে নিরাপত্তা চায়। যাতে মক্কায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত না ঘটে। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু চলতে চলতে হঠাৎ আবূ সুফিয়ান (ইবনে হারব) এর কথার আওয়াজ শুনলেন, সে বুদাইল ইবন ওয়ারাকাকে বলছে, “গত রাতের মতো এত আগুন প্রজ্জ্বলিত হতে আমি আর কখনো দেখিনি। তখন বুদাইল বলল, এ তো খোযা‘আ গোত্র। আবূ সুফিয়ান বলল, খোযা‘আরা তো এরচেয়ে অনেক কম ও হীন লোক। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবূ

[২২৫] দেখুন, যাদুল মা‘আদ: ৩/৪০১।

সুফিয়ানদের আওয়াজ বুঝতে পেরে ডাকলেন, আবূ সুফিয়ান বলল, হে আবূল ফযল! তোমার কী হয়েছে? আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, এই তো আল্লাহর রাসূল সকলের মাঝে উপস্থিত। আবূ সুফিয়ান বলল, এখন আমি কী করব? আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাব এবং তোমার জন্য নিরাপত্তা চাইব। এরপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবূ সুফিয়ান তোমার জন্য ধ্বংস, এখনো কি তোমার বুঝে আসেনি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বুদ নেই? উত্তরে আবূ সুফিয়ান বলল, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক! আপনি কতই না সহিষ্ণু, সম্মানিত ও আত্মীয়পরায়ণ। আমি ভালোভাবে জানি যে, যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ থাকত, তাহলে এখন সে আমার কাজে লাগত।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এখনো বুঝতে পারোনি যে আমি আল্লাহর রাসূল? এ কথা শুনে আবূ সুফিয়ান ইতস্তত করতে লাগলেন। তাকে উদ্দেশ করে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তোমার জন্য ধ্বংস; ইসলাম গ্রহণ কর। এরপর

আবূ সুফিয়ান কালেমায়ে শাহাদাৎ পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।’[226]

○ **পরক্ষণেই** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে পাহাড়ের সংকীর্ণ উপত্যকায় অবস্থান করেন এবং মানুষ যেন তার পাশ দিয়ে যাতায়াত করে। এরপর তার পাশ দিয়ে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন তাদের ঝান্ডাসহ অতিক্রম করতে লাগল। যে গোত্রই অতিক্রম করত আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গোত্রের পরিচিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, তখন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উভয়ের মাঝে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আর আবু সুফিয়ান বলতেন, ‘আমাদের মাঝে ও তাদের কী হলো’? ইতোমধ্যে একটি কাফেলা তার মুখোমুখি হলে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন এরা কারা?

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, এরা হলো মদীনার আনসার, তাদের নেতা হলেন সা‘দ ইবন উবাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সঙ্গেই ঝান্ডা ছিল, যখন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার পাশাপাশি আসলেন, তখন তিনি বললেন, হে

[২২৬] দেখুন, সহীহ বুখারী: ৪২৮০; যাদুল মা‘আদ: ৩/৪০১, ৪০৩।

আবূ সুফিয়ান! আজকের দিন ধ্বংসযজ্ঞের দিন, আজ কা‘বায় রক্তপাত হালাল করা হয়েছে।

○ **অতঃপর** ছোট অথচ সম্মানিত একটি কাফেলা এলো যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামও ছিলেন। তাদের ঝান্ডা ছিল যুবায়ের ইবন ‘আওয়াম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাতে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আবু সুফিয়ান তখন তাকে সা‘দ ইবন ‘উবাদা রাদিয়াল্লাহু যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন:

«كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ»

‘সা‘দ ভুল বলেছে, বরং আজ এমন এক দিন যাতে আল্লাহ তা‘আলা কা‘বাকে সম্মানিত করেছেন। আজ কা‘বাকে গিলাফাচ্ছাদিত করা হবে।’[227]

○ **অতঃপর** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাত থেকে ঝান্ডা নিয়ে তার ছেলে কায়েসের হাতে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি লক্ষ্য রাখছিলেন যে যখন ঝান্ডাটা তার ছেলের হাতে দেয়া হচ্ছিল

---

[২২৭] বুখারী: ৪২৮০।

তখন তা সম্পূর্ণরূপে সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হস্তচ্যুত হয় নি।

○ **তারপর** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন, তিনি তাঁর ঝাণ্ডাটি 'হাজুন' নামক স্থানে স্থাপন করতে বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়পদে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন। তিনি সেখানে আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিনীত হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রবেশ করছিলেন। এমনকি তাঁর মাথা বাহনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল এবং তিনি উঁচু আওয়াজে বার বার পড়ছিলেন:

﴿ إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا ١ ﴾ [الفتح: ١]

'নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।' {সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১}

তিনি মক্কা নগরীর এক প্রান্তে খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা. এবং অন্য প্রান্তে যোবায়ের ইবন 'আওয়াম রা. কে প্রেরণ করে এ ঘোষণা দিতে বললেন, "যে ব্যক্তি মাসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। আর যে ব্যক্তি

নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করবে সেও নিরাপদ।”[228]

- **এরপর** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করে তিনি তার বাহনের উপর থেকেই তাওয়াফ করলেন। তখন বাইতুল্লাহর পাশে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে থাকা ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে মূর্তিগুলোর গায়ে আঘাত করে তিরস্কার করে বলছিলেন:

﴿جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا ٨١ ﴾ [الاسراء: ٨١]

‘হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল’। {সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৮১} আরও পড়লেন,

﴿جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَمَا يُبۡدِئُ ٱلۡبَٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٤٩ ﴾ [سبا: ٤٩]

‘সত্য এসেছে এবং বাতিল কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, আর কিছু পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না’।’ {সূরা সাবা’, আয়াত: ৪৯}

---

[২২৮] বুখারী: ৪২৮০।

আর তখন মূর্তিগুলো আপনা আপনি মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল।[229]

- **এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বার ভিতরে প্রবেশ করলেন।** তিনি সেখানে কিছু ছবি দেখতে পেলেন। তিনি সেগুলোকে মিটিয়ে দেবার নির্দেশ দিলে তা নিশ্চিহ্ন করা হলো। তারপর তিনি সেখানে সালাত আদায় করলেন; সালাত শেষ করার পর তিনি কা‘বার বিভিন্ন দিকে ঘুরে ফিরে দেখলেন এবং সবদিকে তাওহিদের বাণী উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি বায়তুল্লাহর দরজার উপর আসলেন, আর কুরাইশরা ছিল তাঁর নীচে; তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেন তা প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বার দরজার দুপাল্লা ধরে বললেন: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকারের মা‘বুদ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল রাজত্ব তাঁরই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি স্বীয় ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। স্বীয় বান্দার সাহায্য করেছেন। একাকী সমস্ত শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়্যাতের অহমিকা ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে অহংকার

---

[২২৯] বুখারী: ৪২৮৭; মুসলিম: ১৭৮১।

দূর করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম ‘আলাইহিস সালাম থেকে জন্ম নিয়েছে। আর আদম ‘আলাইহিস সালাম মাটির তৈরি।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾ [الحجرات: ١٣]

‘হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।’ [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩]

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? আমি তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব? তারা বলল, আমরা শুধু উত্তমই আশা করি, সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত ভাতুষ্পুত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের তেমনি বলব যেমন ইউসূফ ‘আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদের উদ্দেশে বলেছিলেন:

﴿لَا تَثۡرِيبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡيَوۡمَۖ يَغۡفِرُ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ﴾ [يوسف: ٩٢]

‘আজ তোমাদের প্রতি কোনো ভর্ৎসনা নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। {সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯২} তোমরা যাও, তোমরা মুক্ত। তোমাদের থেকে কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।’[230]

○ **মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও স্তুতি পেশ করলেন এরপর বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মক্কা নগরীকে সম্মানিত করেছেন। কোনো মানুষ তা সম্মানিত ঘোষণা করে নি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য এখানে রক্তপাত এবং গাছ কর্তন করা বৈধ নয়। সুতরাং তোমাদের কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের কারণে এখানে যুদ্ধের অবকাশ চাইলে তাকে বলবে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদের অনুমতি দেন নি। তিনি বললেন, আমাকে দিনের কিছু অংশ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আজ মক্কার হুরমত ও সম্মান পুনরায় বহাল হলো, যেমনটি

[২৩০] দেখুন, যাদুল মা‘আদ ৩/৩৫৯।

গতকাল ছিল। তোমাদের উপস্থিতরা যেন আমার বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়।”[231]

আর যে সময়টুকু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মক্কায় যুদ্ধ হালাল করা হয়েছিল, তা হলো বিজয়ের দিন সূর্যোদয় থেকে নিয়ে ওই দিন আসর পর্যন্ত। এরপর তিনি মক্কায় ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন এবং তখন সালাত কসর করেছিলেন।”[232] আর মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে তিনি সিয়ামও পালন করেন নি।”[233] কেননা তখনও তিনি সফর শেষ করার নিয়ত করেন নি। তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষাকে সুদৃঢ় করা, ইসলামের ভিত্তি অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়া, ঈমান দৃঢ় করা এবং মানুষের কাছ থেকে বাই‘আত গ্রহণ করার জন্য।

* সহীহ বুখারীতে মুজাশে‘ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, তিনি বলেন, “আমি আমার ভাইকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের জন্য বাই‘আত গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি

---

২৩১ বুখারী: ৪২৯৫; মুসলিম: ১৩৫৪।

২৩২ বুখারী: ৪২৯৮।

২৩৩ বুখারী: ৪২৭৫।

বললেন, “হিজরতকারীরা হিজরতের সকল কল্যাণ নিয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে। তাই এখন আমি তাকে ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করছি।”[234]

- আর এ প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য পূর্ণাঙ্গ রূপ ফেলো, লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। আর আল্লাহর নগরী মক্কা পুনরায় ইসলামী রুপান্তরিত হলো; যেখানে আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা এবং আল্লাহর কিতাবের দৃঢ়তার ঘোষণা প্রদত্ত হলো। আর এর ক্ষমতা মুসলিমদের হাতে চলে এলো। শির্ক দূরীভূত হলো এবং তার আঁধার বিলুপ্ত হলো। আল্লাহই সবচে বড়, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা; আর এটি কিয়ামতাবধি তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর রহমতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

হে আল্লাহ! আমাদের এ মহান নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দিন। সব জায়গায় সব সময় মুসলিম উম্মাহর বিজয় নিশ্চিত করুন। আমাদের ও আমাদের পিতামাতা এবং সকল মুসলিমকে আপনার দয়ায় ক্ষমা করুন, হে পরম করুণাময়।

---

[২৩৪] বুখারী: ৪৩০৫, ৪৩০৬; মুসলিম: ১৮৬৩।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর।

বিংশ আসর

আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির প্রকৃত কারণসমূহ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর মর্যাদায় মহান, তাঁর দমনে প্রবল পরাক্রমশালী, বান্দার গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, জিহাদকারীর উপর বিজয় প্রদানের মাধ্যমে বদান্যতা প্রদর্শনকারী, তাঁর জন্য বিনয় অবলম্বনকারীকে উঁচু মর্যাদায় আসীনকারী, তিনি ছত্র লেখার সময় কলমের খচখচ শব্দ শুনতে পান, জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে পিপড়ার চলার গতি দেখতে পান। আমি তার প্রশংসা করছি তাকদীরের ফয়সালা, তা মিষ্ট হোক কিংবা তিক্ত।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, এ সাক্ষ্য তার স্মরণকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে তিনি জলে-স্থলে সর্বস্থানের সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তাঁর উপর সালাত পেশ করুন আর তাঁর সাথী আবু বকরের উপর, যিনি তাঁর অন্তরে আছড়ে পড়া ঈমান নিয়ে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন, অনুরূপ ‘উমারের উপর, যিনি তাঁর সাবধানতা ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করেছেন, আর উসমানের উপর, যিনি ছিলেন দুই নূরের মালিক, কঠিন বিপদের মধ্যে নিজের বিষয়ে পূর্ণ ধৈর্যশীল। তদ্রূপ আলীর উপর, যিনি ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা। আর তাঁর সকল পরিবার-পরিজনের উপর, সকল সাহাবীর উপর এবং তাদের সকল সুন্দর অনুসারীর উপর যতদিন মেঘ তার বৃষ্টি নিয়ে বদান্যতা দেখাবে। আর আল্লাহ তাদের সবার উপর যথাযথ সালামও প্রদান করুন।

- **প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!** আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের বহু স্থানে সাহায্য করেছেন। যেমন, বদর, আহযাব, মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধসহ অন্যান্য স্থানে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে তার কৃত অঙ্গীকার পূরণার্থে,

* তিনি বলেছেন:

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧ ﴾ [الروم: ٤٧]

‘আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।’ {সূরা আর-রূম, আয়াত: ৪৭}

* আরও বলেন,

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ ٥١ يَوۡمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعۡذِرَتُهُمۡۖ وَلَهُمُ ٱللَّعۡنَةُ وَلَهُمۡ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٥٢﴾ [غافر: ٥١، ٥٢]

“নিশ্চয় আমরা আমাদের রাসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে, আর যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে। যেদিন যালিমদের ‘ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে লা‘নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।”। {সূরা গাফের:৫১-৫২}

আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এ কারণে সাহায্য করেছেন যে, মুমিনরা তাদের দ্বীন ইসলামের উপর অটল থেকেছে। আর ইসলাম এমন একটি দ্বীন যাহা অন্যসব দ্বীনের উপর বিজয়ী। অতঃপর যে ব্যক্তি এ মহান দ্বীনকে আকড়ে ধরেছে সে অবশ্যই অন্যান্য জাতির উপর বিজয়ী হবে।

﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٣٣ ﴾ [التوبة: ٣٣]

“তিনিই সে মহান সত্তা যিনি তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ যেন তিনি অন্যসব দ্বীনের উপর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে থাকে।”

মহান আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন; কেননা তারা বস্তুগত ও মানসিক উভয় প্রকার সাহায্য ও বিজয় লাভের উপকরণ নিয়ে আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের কাছে ছিল এমন দৃঢ়তা যা তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী করেছিল। তারা গ্রহণ করেছিল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা, তারা তাঁর দেওয়া হেদায়াত অনুসারে চলেছিল আর তিনি তাদেরকে সুদৃঢ় করেছিলেন।

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٣٩ إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ﴾ [ال عمران: ١٣٩، ١٤٠]

“আর তোমরা নিষ্ঠুর হয়ো না, হতাশ হয়ো না। আর তোমরাই বিজয়ী হবে; যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। যদি তোমাদেরকে আঘাত স্পর্শ করে থাকে তবে তোমাদের মতই তাদের উপরও ইতিপূর্বে আঘাত এসেছিল। আর এভাবেই আমরা দিনগুলো

মানুষের মাঝে চক্রাকারে ঘুরিয়ে থাকি।” {সূরা আলে-ইমরান: ১৩৯-১৪০}

﴿ وَلَا تَهِنُوا۟ فِي ٱبۡتِغَآءِ ٱلۡقَوۡمِۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأۡلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ يَأۡلَمُونَ كَمَا تَأۡلَمُونَۖ وَتَرۡجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرۡجُونَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤ ﴾ [النساء: ١٠٤]

“আর আর শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্র কাছে তোমরা যা আশা কর ওরা তা আশা করে না। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” {সূরা আন-নিসা: ১০৪}

﴿ فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدۡعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلۡمِ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمۡ وَلَن يَتِرَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٥ إِنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا لَعِبٞ وَلَهۡوٞۚ﴾ [محمد: ٣٥، ٣٦]

“কাজেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন না। দুনিয়ার জীবন তো শুধু খেল-তামাশা।” {সূরা মুহাম্মাদ: ৩৫-৩৬}

সুতরাং তারা এ শক্তি ও সুদৃঢ়করণ দ্বারা শক্তি, দৃঢ়তা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে পথ চলেছিল এবং সব ধরণের শক্তি থেকে কিছু অংশ নিতে সক্ষম হয়েছিল।

* এ ব্যাপারে তারা আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٖ﴾ [الانفال: ٦٠]

"আর তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি সামর্থ্য নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ কর।" {সূরা আল-আনফাল: ৬০।}

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অপ্রকাশ্য আত্মশক্তি এবং প্রকাশ্য সৈন্যশক্তি দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন; কারণ তারা তার দ্বীনকে সাহায্য-সহযোগিতায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল।

* আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١ ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١]

"আর অবশ্যই আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন যারা আল্লাহকে সাহায্য করবে, নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রমশালী। যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজের নিষেধ করে। আর আল্লাহর জন্যই সকল কাজের পরিণাম ফল নির্ধারিত হয়ে আছে।" {সূরা আল-হজ: ৪০-৪১}

উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বিজয় ও সাহায্য করার ওয়াদা দিচ্ছেন যারা তার দ্বীনকে সাহায্য করবে। আর এ ওয়াদা শব্দগত ও অর্থগত সবধরণের তাগিদের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।

- **তন্মধ্যে শব্দগত তাগিদ হচ্ছে:** গোপন শপথ, কারণ, এখানে অর্থ হচ্ছে, “আল্লাহর শপথ অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা আল্লাহকে সাহায্য করে।” অনুরূপভাবে ‘লাইয়ানসুরান্না’ শব্দের মধ্যে ‘লাম’ এবং ‘নূন’ নিয়ে আসা হয়েছে, যা তাগিদের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **আর অর্থগত তাকিদ হচ্ছে:** মহান আল্লাহর বাণী, إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ “নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রমশালী” এ কথার মধ্যে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মহান আল্লাহ শক্তিমান তাকে কেউ দুর্বল করতে পারে না, তিনি প্রবল প্রতাপশালী তাকে কেউ হীন করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং যে কোনো শক্তি ও প্রতাপ তাঁর বিপরীতে দাঁড়াতে চাইবে সে অবশ্যই অপমানিত ও দুর্বল হতে বাধ্য।

* অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী, وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ “আর আল্লাহর জন্যই সকল কাজের পরিণাম ফল নির্ধারিত হয়ে আছে”। এর মাধ্যমে মুমিনদের অন্তরকে সুদৃঢ় করা হয়েছে, যখন মুমিনের দৃষ্টিতে সাহায্য আসা সুদূর পরাহত মনে হবে, কারণ তার সাহায্য আসার মত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে পারে

নি। তাই আল্লাহ তা‘আলা মুমিনকে সান্ত্বনা ও তার অন্তরকে দৃঢ়তা প্রদান করার জন্যই বলেছেন, সবকিছুর শেষ পরিণাম তো আল্লাহর হাতেই, সুতরাং তিনি তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারে যখন ইচ্ছা অবস্থা পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম।

আর এ আয়াত দুটিতে: যে সব গুণাবলী থাকলে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারী হয় তার বর্ণনা রয়েছে। মুমিন এগুণগুলো যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্জন করবে, সুতরাং যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে সে যেন গর্ব, অহংকার, অহমিকা, সীমালঙ্গন ও ফেতনা-ফাসাদে জড়িত না হয়, বরং এ প্রতিষ্ঠিত হওয়া যেন আল্লাহর দ্বীনের জন্য শক্তিবর্ধক হিসেবে কাজ করে এবং দ্বীনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, এটাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য অপরিহার্য গুণাবলি:

প্রথম গুণ: “যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে

তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে।”

তবে যমীনে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে, **একমাত্র আল্লাহর ইবাদত বাস্তবায়ণ করা**। ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট না করা (অর্থাৎ শির্ক বন্ধ না করা) পর্যন্ত যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। যেমন,

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ﴾ [النور: ٥٥]

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তাদের সঙ্গে আল্লাহর ওয়াদা হলো, আল্লাহ অবশ্যই পৃথিবীতে তাদেরকে প্রতিনিধি বানাবেন, যেমন পূর্ববর্তীদের বানিয়েছিলেন। আর তাদের জন্য মনোনীত দ্বীন (ইসলাম) কে তিনি তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করবেন, যারা শুধুমাত্র আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৫}

সুতরাং বান্দা যখন তার কথা, কাজ ও ইচ্ছায় একান্তভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সফলতাই তার লক্ষ্য থাকবে, কোনো মান-মর্যাদা, সম্পদ, মানুষের প্রশংসা বা জাগতিক অন্য কিছু তার কাম্য হবে না, সুখে দুঃখে বিপদাপদে সর্বাবস্থায় অবিচলভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে অটল থাকবে তখন আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন।

তাহলে বুঝা গেল যে, যমীনের বুকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে হলে এর আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ অর্জন করতে হবে, আর সেটি হচ্ছে: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, যার কোনো শরীক নেই।

আর যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত ও ইখলাসের পর আসবে দ্বিতীয় গুণটি।

দ্বিতীয় গুণ: সালাত প্রতিষ্ঠা করা:

আর সালাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হচ্ছে, বান্দার কাছ থেকে যেভাবে সালাত আদায় চাওয়া হয়েছে সেভাবে সেটা সংঘটিত

হওয়া, তার সকল শর্ত, রুকন ও ওয়াজিবসমূহ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

আর এর পূর্ণরূপ হচ্ছে, সালাতের যাবতীয় মুস্তাহাব পালন করা, সুতরাং সুন্দরভাবে অযু করবে, রূকু, সিজদা, কিয়াম ও বসা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে, সময়ের প্রতি যথাযথ যত্নবান হবে, জুম'আ ও জামাআতের প্রতি গুরুত্ব দিবে, সালাতে খুশু' তথা বিনয়াবনত হবে, আর তা হচ্ছে, সালাতে মন উপস্থিত রাখা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থির রাখা। কেননা সালাতের মূল ও প্রাণই হচ্ছে বিনয়াবনত থাকা। বিনয়াবনত ব্যতীত সালাত আদায় যেন আত্মা ব্যতীত শরীর।

* আম্মার ইবন ইয়াসের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় কোনো লোক সালাত থেকে ফিরে এমতাবস্থায় যে তার সালাতের এক দশমাংশ লিখা হয়েছে, এক নবমাংশ, এক অষ্টমাংশ, এক সপ্তমাংশ, এক ষষ্ঠাংশ, এক পঞ্চমাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ, অর্ধেক লেখা হয়েছে।"[235]

[২৩৫] আবু দাউদ ৭৯৬; নাসাঈ, আল-কুবরা (তুহফাতুল আশরাফ অনুসারে) ৭/৪৭৮)।

তৃতীয় গুণ: যাকাত প্রদান

﴿وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ যাকাতের বিধান অনুসারে তার সঠিক প্রাপককে কোনো প্রকার ত্রুটি ছাড়া খুশি মনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যাকাত দেওয়া। এর মাধ্যমে নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি, সম্পদের পবিত্রতা এবং গরীব দুঃখী ইত্যাদি অভাবী ভাইদের উপকার হয়। যাকাতের হকদার কারা এ বিষয়টি সপ্তদশ আসরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।[236]

চতুর্থ গুণ: সৎকাজে আদেশ করা

﴿وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ **মা'রূফ হচ্ছে,** আল্লাহ তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত সকল ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজ। সুতরাং যারা আল্লাহর সাহায্য পেতে চায় তারা শরীয়তের পূনর্জীবন দান করা, বান্দাদের সংস্কার এবং আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি কামনায় এ কাজগুলো করে থাকে।

বস্তুত মুমিন হচ্ছে দেয়ালের মত। যার একটি ইট অপরটিকে মজবুত করে। সুতরাং একজন মুমিন যেভাবে নিজের জন্য

২৩৬ দেখুন, পৃ.

পছন্দ করে যে সে তার রবের আনুগত্যে সদা তৎপর থাকবে, সেভাবে সে নিজের মত করে তার অন্যান্য ভাইদের জন্যও আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকা পছন্দ করা ওয়াজিব।

সৎকাজের নির্দেশ যদি সত্যিকারের ঈমান ও সততার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় সেটা আবশ্যক করে যে নির্দেশদাতা নিজেও সেটা যথাযথভাবে পালন করবে; কেননা সে সৎকাজের আদেশের উপকারিতা ও ইহ ও পারলৌকিক ফলাফল সম্পর্কে ঈমান ও পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের কারণেই সে সেটার নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

পঞ্চম গুণ: মন্দের প্রতিকার

﴿وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ﴾ **মুনকার বলতে বুঝায়:** এমন প্রত্যেক বিষয় যা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন। ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা লেন-দেনের সাথে সম্পৃক্ত সকল কবীরা গুনাহ, সগীরা গুনাহ এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যারা আল্লাহর সাহায্য পেতে চায় তারা আল্লাহর দ্বীনকে হেফাযত করার জন্য, আল্লাহর বান্দাদের রক্ষা করার জন্য

এবং ফেতনা-ফাসাদ ও শাস্তির কারণসমূহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এসকল কাজ থেকে নিষেধ করে থাকেন।

বস্তুত উম্মতের স্থায়িত্ব, সম্মান ও একতা বজায় রাখার জন্য সৎ কাজের আদেশ প্রদান এবং মন্দের প্রতিবিধান দু'টি শক্তিশালী স্তম্ভবিশেষ। যাতে করে উম্মতকে প্রবৃত্তির তাড়না বিচ্ছিন্ন করতে এবং বিভিন্ন মত ও পথ তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে সক্ষম না হয়। আর এজন্যই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়; যা সকল মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর সাধ্যানুযায়ী ফরয।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٥ ﴾ [آل عمران: ١٠٤، ١٠٥]

"আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।

আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব।’ {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪-১০৫}

যদি ভালো কাজের আদেশ প্রদান আর মন্দের প্রতিবিধান না থাকতো তবে মুসলিম সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এমন হতো যে, প্রত্যেক দলই তার কাছে যা আছে তা নিয়ে খুশী হয়ে যেতো। (অথচ সত্য কখনো মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না।)

এ আহ্বান থাকার ফলেই এ উম্মত অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পেরেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [ال عمران: ١١٠]

“তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।’ {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০}

যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٧٨ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ٧٩ ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩]

“বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে লা‘নত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! {সূরা আল-মায়িদাহ্, আয়াত: ৭৮-৭৯}

- উল্লেখিত পাঁচটি গুণসহ আল্লাহর নির্দেশিত সতর্কতা, দৃঢ়তা ও বাহ্যিক বস্তুগত শক্তি যখন লাভ করবে, তখন আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٦ يَعۡلَمُونَ ظَٰهِرٗا مِّنَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غَٰفِلُونَ ٧﴾ [الروم: ٦، ٧]

‘আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জানে, আর আখিরাত সম্পর্কে তারা গাফিল।’ {সূরা আর-রূম, আয়াত: ৬-৭}

সুতরাং এ গুণগুলো অর্জিত হলে উম্মত অকল্পনীয় আসমানী সাহায্য দ্বারা ধন্য হবে। আর আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে জানে যে বাহ্যিক উপকরণ যতই শক্তিশালী হোক তা এগুলোর স্রষ্টা ও অস্তিত্বদানকারী আল্লাহর শক্তির সামনে অতি নগণ্য।

* **আদ সম্প্রদায়** নিজেদের শক্তিমত্তায় অন্ধ হয়ে ঘোষণা করেছিল:

﴿مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةًۖ﴾

“অর্থাৎ কে আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিমান?!!”

আল্লাহ তা‘আলা তার উত্তরে বলেন,

﴿أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَجۡحَدُونَ ١٥ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا صَرۡصَرٗا فِيٓ أَيَّامٖ نَّحِسَاتٖ لِّنُذِيقَهُمۡ عَذَابَ ٱلۡخِزۡيِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَخۡزَىٰۖ وَهُمۡ لَا يُنصَرُونَ ١٦﴾ [فصلت: ١٥، ١٦]

“তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি যে, নিশ্চয় আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করত। তারপর আমি তাদের উপর অশুভ দিনগুলোতে ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠালাম যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব আস্বাদন করাতে পারি। আর আখিরাতের আযাব তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।’ {সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ১৫-১৬}

* **ফির‘আউন** কতই না দম্ভ করেছিল তার মিসরের রাজত্ব নিয়ে এবং যে সকল নদী-নালা তার নিম্নভাগে প্রবাহিত আছে তা নিয়ে!!

অতঃপর আল্লাহ তাকে সে পানিতেই ডুবে মেরেছিলেন যা নিয়ে সে অহংকারে ফেটে পড়েছিল। আর তার রাজত্বের ওয়ারিস বানিয়েছেন মূসা ও তার জাতিকে; যারা ছিল ফের‘আউনের দৃষ্টিতে হীন ও কথা বলতে অক্ষম।

* আর এই যে **কুরাইশ,** তারা তাদের মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে অন্ধ হয়ে সর্বশক্তি নিয়ে তাদের নেতা ও কর্তা ব্যক্তিরা গর্ব ও লোকদেখানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছিল। তারা

ঘোষণা দিয়েছিল, আমরা ততক্ষণ কখনো ফিরবো না যতক্ষণ না বদরে পৌঁছব, সেখানে উট যবেহ করব, মদ পান করব, আমাদের উপর গায়ক-গায়িকা, নর্তকীরা গান গাইবে এবং আমরা সেটা উপভোগ করব, আর আরবরা সেটা শুনবে এবং সব সময়ের জন্য আমাদেরকে ভয় পেতে থাকবে!![237]

কিন্তু তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের হাতে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ও শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল। আর তাদের লাসগুলো বদরের দুর্গন্ধময় কূপে টেনে-হেঁচড়ে ফেলা হয়েছিল। এভাবে তারা অপমান-অপদস্থের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে মানুষের মুখে কিয়ামত পর্যন্ত আলোচিত হবে।

আমরা মুসলিমরা যদি এ যুগেও আল্লাহর সাহায্যের জন্য অপরিহার্য গুণাবলি অর্জন করতে পারি, যদি দীনের প্রতিটি নির্দেশ মান্য করে চলতে পারি, যদি আমরা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারি, অন্যদের অনুসারী না হয়ে পথপ্রদর্শক হতে পারি, অনুসরণকারী না হয়ে অনুসরণীয় হতে পারি, ন্যায়-নিষ্ঠা আর পরিশুদ্ধ মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধের

---

২৩৭ দেখুন, পৃ.

যাবতীয় আধুনিক সামগ্রী অবলম্বন করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে শত্রুর ওপর বিজয়ী করবেন; যেমন অতীতে আমাদের পূর্বসূরীদের সাহায্য করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্য করেছিলেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছিলেন এবং যাবতীয় বিরোধী শক্তিকে একাই পরাস্ত করেছিলেন।

﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا ٦٢ ﴾ [الاحزاب: ٦٢]

‘তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটি আল্লাহর নিয়ম; আর আপনি আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬২}

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আপনার এমন সাহায্যের উপায়-উপকরণগুলোর ব্যবস্থা করে দিন, যাতে রয়েছে আমাদের বিজয়, ইয্যত, সম্মান আর ইসলামের জন্য উঁচু মর্যাদা ও কুফরি ও অবাধ্যতার জন্য অপমান ও হীনতা। নিশ্চয় আপনি দানশীল ও দাতা।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর।

একবিংশ আসর

রমযানের শেষ দশ দিনের ফযিলত

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মাহাত্ম্য, চিরস্থায়িত্ব, মহত্ব ও গর্বে একক, এমন সম্মানের অধিকারী যার ইচ্ছা কেউ করতে পারে না, এক ও একক, অনন্য ও অমুখাপেক্ষী, এমন বাদশাহ যিনি কারও প্রয়োজন বোধ করেন না, চিন্তায় যে সব নিকৃষ্টতা আসে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে, তিনি এমন মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যে কোনো বিবেক ও বুঝ তাকে আয়ত্ব করতে পারে না, তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ; কারণ যমীনের বুকে যা-ই রয়েছে সবাই তার প্রতি স্থায়ীভাবে মুখাপেক্ষী, তিনি যাকে ইচ্ছা তাওফীক দিয়েছেন ফলে সে তাঁর উপর ঈমান এনেছে এবং তাতে সুদৃঢ় রয়েছে; তারপর তাকে তার প্রভুর সাথে গোপনে আলাপ করার স্বাদ দিয়েছে ফলে সে আরামের ঘুম ত্যাগ করেছে এবং এমন বন্ধুদের সাথী হয়েছে যাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে দূরে থাকে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানো। আপনি যদি তাদের দেখতেন যখন তাদের কাফেলা নিশ্চিদ্র অন্ধকারে

চলতে শুরু করেছে, তাদের কেউ তার পদস্খলন থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, অপর কেউ বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে, আবার কেউ তার যিকিরে ব্যস্ত থাকার কারণে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকছে, সুতরাং ঐ সত্ত্বা কতই পবিত্র! যিনি এদের জাগিয়ে দিয়েছেন অথচ অন্য মানুষরা সবাই ঘুমে বিভোর, আর ঐ সত্ত্বা কতই বরকতময়! যিনি ক্ষমা করেন ও অপরাধ মিটিয়ে দেন, দোষ-ত্রুটি গোপন করেন ও যথেষ্ট করেন, সবার উপর সব রকমের নেয়ামত ঢেলে দিয়েছেন। আমি তার প্রশংসা করি তার বড় বড় নেয়ামতসমূহের উপর আর তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি এবং তাঁর কাছে ইসলাম নামক নেয়ামতটি হেফাযত করার বিনীত প্রার্থনা করি।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, যে তাঁর দ্বারা প্রতিপত্তি অর্জন করতে চায় সে হয় সম্মানিত ফলে তার উপর কেউ যুলুম করতে পারে না। যে তাঁর আনুগত্য করতে অহঙ্কার করে ও গুনাহে লিপ্ত থাকে সে হয় অপমানিত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি হালাল ও হারাম বর্ণনা করেছেন।

আর আল্লাহ সালাত পেশ করুন তাঁর উপর, অনুরূপ তাঁর সাথী আবু বকর আস-সিদ্দীক তথা মহাসত্যবাদীর উপর, যিনি সাওর গিরি গুহায় তাঁর উত্তম সহচর হিসেবে ছিলেন, আর 'উমার ইবনুল খাত্তাবের উপর, যিনি সঠিক কথা কাজের ছিলেন তাওফীকপ্রাপ্ত, আর 'উসমানের উপর, যিনি বিপদে ধৈর্য্যধারণ করেছিলেন এবং শত্রুদের হাতে মহান শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছিলেন, আর তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবন আবী তালেবের উপর, অনুরূপ সকল সাহাবী ও তাঁদের সুন্দর অনুসারীদের উপর, যতদিন আকাশের দিগন্তে নক্ষত্র লুকাতে থাকবে। আর আল্লাহ তাঁদের উপর যথাযথ সালামও পেশ করুন।

- **প্রিয় ভাইসকল!** আল্লাহ আপনাদের রমযানের শেষ দশ দিনে পৌছিয়েছেন। এ দশ দিনের রয়েছে অনেক কল্যাণ ও অধিক সওয়াব; অনেক ফযীলত ও তাৎপর্য। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সময়ের চেয়ে এতে বেশি আমল করতেন।

* সহীহ মুসলিমে 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ»

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকে যে পরিমাণ আমল করতেন অন্য কোনো সময় এত বেশি আমল করতেন না।'[238]

* বুখারী ও মুসলিমে উম্মুল মুমিনীন 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ»

'যখন রমযানের শেষ দশদিন আসত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধেয় বস্ত্রকে শক্ত করে বাঁধতেন, রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।'[239]

* মুসনাদে 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

---

[২৩৮] মুসলিম: ১১৭৫।

[২৩৯] বুখারী: ২০২৪; মুসলিম: ১১৭৪।

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِطُ الْعِشْرِينَ بِصَلَاةٍ وَنَوْمٍ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ شَمَّرَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ »

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বিশ দিন সালাত আদায় করতেন ও ঘুমাতেন। কিন্তু শেষ দশ দিন ঘুমাতেন না, বরং পরিধেয় বস্ত্রকে মজবুত করে বেঁধে সালাতে মনোনিবেশ করতেন।'[240]

০ **এ সকল হাদীস এ কথার প্রমাণ বহন করে যে,** রমযানের শেষ দশদিনের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা,

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সময়ের চেয়ে এ দশদিন অধিক আমল করতেন। এ দশদিনে সকল প্রকার ইবাদত তথা সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও সদাকাহ ইত্যাদি বেশি করতেন।

* অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'পরিধেয় বস্ত্র খুব মজবুত করে বাঁধতেন।' এর অর্থ হলো, তিনি স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান করতেন, যেন সালাত ও যিকিরে অধিক মগ্ন হতে পারেন।

---

[২৪০] আহমাদ ৬/৬৮, ১৪৬।

* তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতগুলোতে সারা রাত জাগ্রত থেকে মন, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও সালাতে অতিবাহিত করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতেন রাতগুলোর সম্মানার্থে এবং লাইলাতুল কদরের খোঁজে, কারণ, লাইলাতুল কদর এমন এক রাত, যে রাতে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় কেউ সালাত আদায় করলে, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

এ হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত তাঁর রবের ইবাদত তথা সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও শেষ রাতে সাহরী খাওয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত করতেন।

* এ বক্তব্যের মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীস ও সহীহ মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যা বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন,

«ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلةً حتى الصباح»

“আমি জানি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রাত সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়েছেন।”[241] এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান হয়েছে। কারণ; রমযানের শেষ দশ দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়াম তথা সালাতের জন্য দাঁড়ানোর সাথে সাথে অন্যান্য ইবাদতও করতেন, পক্ষান্তরে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যা নিষেধ করেছেন তা হচ্ছে শুধু কিয়াম তথা সালাতে দণ্ডায়মান হয়ে সারা রাত নিঃশেষ করা। ‘আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন’।

- **এ হাদীস থেকে শেষ দশকের আরও যে ফযীলত জানা যাচ্ছে তা হলো,** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত ও যিকিরের জন্য নিজ পরিবারবর্গকেও জাগ্রত রাখতেন এ আশায় যেন তারা শেষ ১০ রাতের উপযোগী ইবাদতের মাধ্যমে বরকত লাভ করতে পারেন।

  নিঃসন্দেহে প্রতিটি মানুষের জীবনে এটা একটি সুবর্ণ সুযোগ। যাকে আল্লাহ তাওফীক দান করেন সে-ই এ অমূল্য নেয়ামত লাভ করতে পারে। সুতরাং বুদ্ধিমান মু’মিন ও তার পরিবার-পরিজনের জন্য এ মূল্যবান সময় অবহেলায় কাটানো উচিৎ হবে না। বস্তুত এ

---

[২৪১] মুসলিম: ৭৪৬।

মূল্যবান সময় খুব হাতেগোনা নির্দিষ্ট কয়েকটি রাত; হতে পারে কোনো লোক এ মূল্যবান রাতে আল্লাহর রহমতের একটু পরশ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। ফলে সেটা তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে যাবে।

তবে কেউ কেউ এ মহান রাত অবহেলায় কাটিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভুত কল্যাণ থেকে মাহরূম ও বঞ্চিত হয়। কোনো কোনো মুসলিমকে দেখা যায়, তারা এ মূল্যবান সময় অবহেলায় কাটায়। রাতের বেশির ভাগ সময় হাসি-ঠাট্টা ও অনর্থক খেলাধুলায় কাটিয়ে দেয়। অতঃপর সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকে। এভাবে ইবাদতবিহীন রাত কাটিয়ে নিজেরা অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। তারা এ মূল্যবান রাত আর নাও পেতে পারে।

আর এসব হচ্ছে শয়তানের কর্মকাণ্ড ও প্রতারণা, যা আল্লাহর রাস্তা হতে ফিরিয়ে রাখার ও পথভ্রষ্ট করার এক অশুভ পরিকল্পনা।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ٤٢﴾ [الحجر: ٤٢]

‘নিশ্চয় আমার বান্দাদের ওপর তোমার সামান্যতম আধিপত্য নেই; তবে বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে চলে, তারা ছাড়া।’ {সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৪২}

বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া শয়তানকে কখনোই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা এটা জ্ঞান ও ঈমানের বিপরীত কাজ।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا﴾ [الكهف: ٥٠]

‘তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে (শয়তানকে) ও তার বংশধরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু, এটা কতই না নিকৃষ্ট বিকল্প।’ {সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ৫০}

* আরেক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦ ﴾ [فاطر: ٦]

‘নিশ্চই শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গণ্য কর, সে তো তার দলবলকে জাহান্নামী হওয়ার জন্যই আহ্বান করে।’ {সূরা ফাতির, আয়াত: ৬}

০ ই‘তিকাফ রমযানের শেষ ১০ দিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ১০ দিনে মসজিদে ই‘তিকাফ করতেন।

আর ই‘তিকাফ হলো, আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য পার্থিব কাজ থেকে অবসর হয়ে মসজিদে অবস্থান করা। ই‘তিকাফ করা সুন্নাত, যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

‘তোমরা মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলা-মেশা করো না।’ {সূরা আল-বাকারাহ্‌, আয়াত: ১৮৭}

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই‘তিকাফ করতেন সাহাবাগণও ই‘তিকাফ করতেন।

* আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের প্রথম ১০ দিন ই‘তিকাফ করলেন, এরপর দ্বিতীয় ১০ দিন ই‘তিকাফ করলেন, এরপর বললেন,

« إِنِّى اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِى إِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ».

‘আমি প্রথম ১০ দিন ই‘তিকাফ করে এ মহান রাতটি খুঁজলাম, এরপর দ্বিতীয় ১০ দিন ই‘তিকাফ করলাম, কিন্তু তাতে কদর নামক রাতটি পেলাম না। এরপর আমাকে বলা হলো, এ রাতটি শেষ ১০ দিনের মাঝে নিহেত রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ই‘তিকাফ করতে চায়, সে যেন শেষ দশকে ই‘তিকাফ করে।’[242]

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ‘আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত,

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

---

[২৪২] মুসলিম: ১১৬৭।

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ ১০ দিনে ই‘তিকাফ করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণও ই‘তিকাফ করতেন।’[243]

* সহীহ বুখারীতে ‘আয়েশা ছিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে আরও বর্ণিত,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমযানে ১০ দিন ই‘তিকাফ করতেন। আর তিনি যে বছর মারা যান, সে বছর ২০ দিন ই‘তিকাফ করেছেন।’[244]

* আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত,

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً.

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ ১০ দিন ই‘তিকাফ করতেন, পুরো বছর আর কোনো ই‘তিকাফ

---

২৪৩ বুখারী: ২০২৬; মুসলিম: ১১৭২।

২৪৪ বুখারী: ২০৪৪।

করতেন না। পরবর্তী বছর রমযানে ২০ দিন ই‘তিকাফ করেছেন।’[245]

* ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ই‘তিকাফ করতেন, ফজরের সালাত আদায় করতেন তারপর ই‘তিকাফের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন। একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে অনুমতি চাইলেন, তিনি তাকে অনুমতি দিলেন, অতঃপর তার জন্যও তাঁবু টাঙ্গানো হলো। এরপর হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশার কাছে তার জন্য রাসূলের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার অনুরোধ জানালেন, তিনি তাই করলেন, ফলে তার জন্যও তাঁবু টাঙ্গানো হলো, অতঃপর যখন যায়নার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সেটা দেখলেন, তিনি তার জন্য তাঁবু টাঙ্গানোর নির্দেশ দিলেন, ফলে তাই করা হলো। অতঃপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো তাঁবু দেখলেন তখন বললেন, এটা কি? তারা বলল, এ হচ্ছে আয়েশা, হাফসা ও যাইনাবের তাঁবু। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তারা কী এর মাধ্যমে সাওয়াব পাওয়ার ইচ্ছা করছে? তোমরা এগুলোকে

---

[২৪৫] তিরমিযী: ৮০৩; ইবন মাজাহ: ১৭৭০; ইবন খুযাইমাহ: ৩/৩৪৬।

খুলে ফেল, আমি এগুলোকে দেখতে চাই না। ফলে এগুলো খুলে ফেলা হলো, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের ই‘তিকাফ পরিত্যাগ করলেন; শেষপর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাওয়ালে প্রথম দশক ই‘তিকাফ করলেন।” (বুখারী ও মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে সংগৃহীত।[246]

* ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. বলেন, “আমি জানি না কোনো আলেম দ্বিমত করেছেন কি না যে: ই‘তিকাফ সুন্নাত।”

০ ই’তিকাফের উদ্দেশ্য

“কোনো মানুষ সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহের কোনো মসজিদে বসে তাঁর অনুগ্রহ, সাওয়াব এবং লাইলাতুল কদর লাভের আশায় একান্তভাবে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করা। এ জন্য প্রত্যেক ই‘তিকাফকারীর উচিৎ আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ও অন্যান্য ইবাদতে ব্যস্ত থাকা এবং দুনিয়াবী অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বেঁচে থাকা।

---

২৪৬ বুখারী: ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৪৫; মুসলিম: ১১৭১।

তবে পরিবার বা অন্য কারও সাথে কোনো বৈধ বিষয়ে অল্প কথা-বার্তায় কোনো দোষ নেই। কারণ,

* উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأنْقَلِبَ، أي: لأنصرف إلى بيتي، فَقَامَ النبي صلى الله عليه وسلم مَعِي» ... الحديث. متفق عليه.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ই‘তিকাফ অবস্থায় রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম, আলোচনা শেষে যখন বাড়িতে ফিরে আসতে চাইলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।’[247]

- **ই‘তিকাফকারীর জন্য স্ত্রী সহবাস ও তার পূর্বক্রিয়া যেমন- চুম্বন করা, পূর্ণ উত্তেজনার সঙ্গে স্পর্শ করা নিষেধ। কারণ,** আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

---

২৪৭ বুখারী: ২০৩৮; মুসলিম: ২১৭৫।

‘তোমরা মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় সহবাস ও তাদের সঙ্গে অন্যান্য যৌনকর্ম করবে না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭}

- **আর ই‘তিকাফকারীর মসজিদ হতে বের হওয়ার ব্যপারে বিধান হলো,** যদি শরীরের কিছু অংশ বাইরে বের করে তবে কোনো দোষ নেই। কারণ,

* ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهْوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ».

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই‘তিকাফ অবস্থায় মসজিদ হতে মাথা বের করতেন আর আমি ঋতু অবস্থায় তাঁর মাথা ধৌত করতাম।’[248]

* অন্য বর্ণনায় এসে,

كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ وَهْوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهْيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ

‘‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল আঁচড়ে দিতেন। তখন আয়েশা

---

[২৪৮] বুখারী: ৩০১, ২০৩১; মুসলিম: ২৯৭।

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তার কক্ষেই থাকতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা বের করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার দিকে দিতেন।’[249]

- **ই‘তিকাফকারী মসজিদ থেকে সারা শরীর নিয়ে বের হওয়ার তিন অবস্থা:**

প্রথম: কোনো প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যাওয়া। তা স্বভাবগত হোক বা শরীয়তসম্মত হোক। যেমন পেশাব-পায়খানা, উযু, ফরয গোসল, ইত্যাদি ও পানাহার হয়, আর ওই কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা মসজিদে না থাকে বা সমজিদে সম্ভব না হয়, তা হলে ই‘তিকাফকারীর জন্য বাইরে যাওয়া জায়েয হবে। আর যদি ওই কাজগুলো মসজিদে করা সম্ভব হয় বা তার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে ই‘তিকাফকারীর মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয হবে না। গেলে ই‘তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়: কোনো ইবাদত জাতীয় কাজের জন্য বের হওয়া, যা তার ওপর ওয়াজিব নয়। যেমন- অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য যাওয়া ও জানাযায় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি। এসব অবস্থায় বের হওয়া জায়েয নেই; তবে যদি ই‘তিকাফের প্রথমেই শর্ত করে নেয় যে, তবে বের হওয়াতে ক্ষতি নেই। যেমন,

---

[২৪৯] বুখারী: ২০২৮; মুসলিম: ২৯৭।

ই‘তিকাফকারীর কোনো রোগী থাকে; যাকে সে দেখা-শোনা করতে চায়, অথবা যদি তাঁর মৃত্যুর আশংকা থাকে আর ই‘তিকাফ শুরুর পূর্বেই তাকে দেখতে যাওয়ার শর্ত করে থাকে তবে সমস্যা নেই।

তৃতীয়: ই‘তিকাফকারী এমন কোনো কাজের জন্য বের হওয়া যা ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য বিরোধী। যেমন, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, স্ত্রী সহবাস অথবা তাদের সাথে মেলা-মেশা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া। ই‘তিকাফকারী এগুলো করতে পারে না। এর জন্য শর্ত করলেও কোনো লাভ নেই। শর্ত করা না করা সমান। কারণ, এগুলো ই‘তিকাফ নষ্ট করে দেয় এবং তার মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।

- **রমযানের এই শেষ দশ দিনের আরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো,** এ ১০ দিনের মধ্যে রয়েছে লাইলাতুল কদর, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সুতরাং আল্লাহ তোমাদেরকে রহমত করুন, তোমরা এ ১০ দিনের ফযীলত সম্পর্কে জান, সাবধান! এ মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করবে না; কেননা এ সময়গুলো অতীব মূল্যবান, এর কল্যাণ স্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন কর্মের তৌফিক দিন যাতে আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আর

আমাদের শেষ পরিণাম সুন্দর করুন এবং সম্মান জনক ঠিকানা দান করুন। আর আমাদেরকে এবং আমাদের পিতা-মাতা ও সকল মুসলিমদেরকে আপনার কৃপায় ক্ষমা করে দিন।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর।

দ্বাবিংশ আসর

রমযানের শেষ দশকের ইবাদত ও লাইলাতুল ক্বদর

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, নিজ প্রতাপ ও প্রতিপত্তির মাধ্যমে নিপীড়কদের দমনকারী, নদীতে প্রবাহমাণ পানির ফোটার সংখ্যা গণনাকারী, রাতের অন্ধকার সৃষ্টিকারী যাকে ভোরের আলো মিটিয়ে দূরিভূত করে দেয়। ইবাদতকারীদের জন্য সাওয়াবে পরিপূর্ণতা প্রদানকারী এবং তাদের প্রতিদানে উৎকর্ষতা প্রদানকারী, চোখের খেয়ানত ও অন্তরের গোপন ইচ্ছা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানী, তাঁর রিযিক সকল সৃষ্টিকুলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, ফলে বালুতে অবস্থানরত কোনো পিপড়া কিংবা নীড়ে অবস্থানরত পাখীর বাচ্ছাও বাদ যায় নি। ধনী করেন, দরিদ্র করেন আর তাঁরই প্রজ্ঞায় অনুষ্ঠিত হয় ধনাঢ্যতা কিংবা দারিদ্র্যতা। কোনো কোনো সৃষ্টিজীবকে অপর সৃষ্টিজীবের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এমনকি সময়ের ক্ষেত্রেও, লাইলাতুল কদর, সম্মানিত রাত্রি, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আমি তার এমন প্রশংসা করছি যা কোনো সংখ্যায় শেষ হবার নয়, আর

এমন শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যা তার আরও সাহায্যকে টেনে আনে।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, একজন ঐকান্তিক বিশ্বাসীর সাক্ষ্য, আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল যাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়েছিল। আল্লাহ তাঁর উপর সালাত প্রেরণ করুন, অনুরূপ আবু বকরের ওপর, যিনি সুখে কিংবা দুঃখে তাঁর সাথী ছিলেন, অনুরূপ উমরের ওপর, যিনি ছিলেন ইসলামের কাঁধ ও বাজু, আর উসমানের উপর, যিনি ছিলেন কুরআনের বিন্যাস ও একত্রকারী। আর আলীর উপর যিনি একাই যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনে যথেষ্ট নৈপূণ্যতা প্রদর্শনকারী, অনুরূপ রাসূলের সকল পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর, যাঁদের প্রত্যেকেই তাদের আমল ও উদ্দেশ্যে ছিলেন সৎ ও কল্যাণকামী। আর আল্লাহ তাদের উপর যথাযথ সালামও প্রেরণ করুন।

- **প্রিয় ভাইয়েরা!** রমযানের শেষ দশদিনে রয়েছে বরকতময় ক্বদরের রাত। এ মাসকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা

উম্মতকে এ রাতে অফুরন্ত সাওয়াব ও কল্যাণ দান করে অনুগ্রহ করেছেন।

* আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাব আল-কুরআনে এ রাতের মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেছেন:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ ٤ أَمۡرٗا مِّنۡ عِندِنَآۚ إِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِينَ ٥ رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَآۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٧ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٨ ﴾

[الدخان: ٣، ٨]

“নিশ্চয় আমরা এটা নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে; নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়, আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, নিশ্চয় আমরা রাসূল প্রেরণকারী। আপনার রবের রহমতস্বরূপ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ-- আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও রব।” {সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৩-৮}

মহান আল্লাহ এ রাতকে মুবারক বলে গুণান্বিত করেছেন; কারণ এতে রয়েছে অত্যাধিক কল্যাণ, বরকত ও মর্যাদা।

- **এ রাতের বরকতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,** এ বরকতময় কুরআন ওই রাতেই নাযিল হয়েছে। এর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন যে, এ রাতে প্রত্যেক চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়, অর্থাৎ লাওহে মাহফূয থেকে লেখক ফেরেশতাদের কাছে স্থিরিকৃত হয়, এ বছর আল্লাহর নির্দেশে রিযিক, বয়স সীমা, ভাল ও মন্দ ইত্যাদি যত প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ রয়েছে সবই। এ সবই আল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও হিকমতপূর্ণ নির্দেশ যাতে নেই কোনো দোষ, কমতি, অবিবেচনাপ্রসূত কিংবা বাতিল কিছু; সর্বজ্ঞ, মহাসম্মানিতের কাছ থেকে সুনির্ধারিতরূপে।

* মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ٢ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥﴾ [القدر: ١، ٥]

"নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কদরে'; আর আপনাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল কদর' কী? 'লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফিরিশ্তাগণ ও রূহ্ নাযিল হয় তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে। শান্তিময় সে রাত, ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত।' {সূরা আল-ক্বদর, আয়াত: ১-৫}

ক্বদর শব্দটি সম্মান ও মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার এর অপর অর্থ হচ্ছে, তাকদীর ও ফয়সালা করা; কেননা ক্বদরের রাত অত্যাধিক সম্মানিত ও মহত্বপূর্ণ রাত, এ রাতে আল্লাহ তা'আলা এ বছর যা কিছু হবে তা নির্ধারণ করেন এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

আর **"কদরের রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম"** কথাটির অর্থ হলো: ফযিলত, সম্মান, অত্যাধিক সাওয়াব ও পুরস্কারের দিক থেকে তা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। তাই যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও সাওয়াবের আশা নিয়ে এ রাতের সালাত (কিয়ামুল-লাইল) আদায় করবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

আর **"ফেরেশতা নাযিল হওয়া"** এর অর্থ হলো: ফেরেশতাগণের অবতরণ; তারা আল্লাহর এক প্রকার বান্দা; যারা দিন-রাত আল্লাহর ইবাদতে রত থাকে। "তারা অহংকার-বশে তাঁর 'ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং বিরক্তি বোধ করে না। তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তও হয় না।" {সূরা আল-আম্বিয়া: ১৯-২০}

তারা লাইলাতুল ক্বদরের কল্যাণ, বরকত ও রহমত নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন।

আর **"রূহ"** বলতে জিব্রাঈল 'আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। মর্যাদা ও সম্মানের কারণে তাঁকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর **"শান্তি বর্ষণ"** করার অর্থ হলো: লাইলাতুল ক্বদর মুমিনদের জন্য যাবতীয় ভীতিপ্রদ বস্তু হতে শান্তির রাত; কারণ আল্লাহ তা'আলা বহু লোককে এ রাত্রিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, এর মাধ্যমে অনেকেই তাঁর আযাব থেকে মুক্তি নিরাপত্তা পায়।

আর **"ফজর উদয় পর্যন্ত"** এর অর্থ হলো: ক্বদরের রাতের পরিসমাপ্তি ঘটে ফজর উদয়ের মাধ্যমে; কারণ এর মাধ্যমে রাতের যাবতীয় কাজ শেষ হয়ে যায়।

- **এ সূরায় ক্বদরের রাতের বিবিধ মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে,** যেমন:

প্রথম ফযীলত: আল্লাহ তা'আলা এ রাতে কুরআন নাযিল করেছেন; যা মানুষের জন্য সঠিক পথ নির্দেশিকা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য।

দ্বিতীয় ফযীলত: "আপনাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল কদর' কী?" এ প্রশ্নবোধক আয়াত এ রাতের বড় গুরুত্ব ও মহত্বের উপর প্রমাণবহ।

তৃতীয় ফযীলত: এটা এমন এক রাত, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

চতুর্থ ফযীলত: এ রাতে ফেরেশতারা দুনিয়ার বুকে অবতরণ করে থাকেন; যারা কেবল কল্যাণ, বরকত ও রহমত বর্ষণ করতেই অবতরণ করে থাকেন।

পঞ্চম ফযীলত: এটা শান্তি ও নিরাপত্তাময়; কারণ বান্দা এ রাত আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে কাটিয়ে দেয় ফলে আল্লাহ শাস্তি ও আযাব থেকে অধিক পরিমানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করেন।

ষষ্ঠ ফযীলত: আল্লাহ তা'আলা এ রাতের সম্মানে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে।

- **এ রাতের ফযীলতের মধ্যে আরও রয়েছে:**

* বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

‘যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের আশায় ক্বদরের রাতে দণ্ডায়মান থাকবে (ইবাদত করবে), তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।’[250]

রাসূলের বাণী: **“ঈমান ও সাওয়াবের আশায়”** এর অর্থ হলো: আল্লাহর উপর এবং যারা এ রাত্রিতে কিয়াম করবে (সালাত আদায় করবে) তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা যে প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন সেটার উপর তার পূর্ণ ঈমান রয়েছে। আর সওয়াব ও প্রতিদানের আশাও তার থাকতে হবে।

এ ধরনের সাওয়াব প্রাপ্তির যারা জানে ও যারা জানে না সবার জন্যই সাব্যস্ত হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সওয়াব প্রাপ্তির জন্য জানা থাকা শর্ত করেন নি।

---

[২৫০] বুখারী: ১৯০১; মুসলিম: ৭৬০।

- **আর লাইলাতুল কদর অবশ্যই রমযান মাসে;** কারণ, আল্লাহ তা'আলা এ রাতেই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন; আর তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে তিনি কুরআনকে রমযান মাসে নাযিল করেছেন।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١﴾ [القدر: ١]

"আর অবশ্যই আমরা এ কুরআনকে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি"। {সূরা আল-কাদর: ১}

* আরও বলেন,

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

'রমযান এমন একটি মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}

এর দ্বারা নির্ধারিত হয়ে গেল যে, পবিত্র ক্বদরের রাত রমযানের মধ্যেই রয়েছে। এটি সকল উম্মতের মধ্যে ছিল আর এ উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। কারণ,

* এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ রহ. আবূ যর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ক্বদরের রত সম্পর্কে সংবাদ দিন তা কি রমযানে না অন্য কোনো মাসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা রমযানেই রয়েছে। এরপর আবূ যর আবার প্রশ্ন করলেন, তা কি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত দিন জীবিত ততদিন অবশিষ্ট থাকবে, নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।”[251]... আল-হাদীস।

কিন্তু এ রাতের এ মহান মর্যাদা ও বৃহৎ পুরস্কার এ উম্মতের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন এ উম্মতকে জুম‘আর ফযীলত ও এ জাতীয় অন্যান্য ফযীলত দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

- **আর ক্বদরের রাত অবশ্যই রমযানের শেষ দশ রাতে রয়েছে।** কারণ,

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[২৫১] মুসনাদে আহমাদ ৫/১৭১; নাসাঈ, তুহফাতুল আশরাফ অনুসারে ৯/১৮৩; মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৪৩৭। তবে এর সনদ দুর্বল।

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

‘তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করো।’[252]

- **আর তা জোড় রাত্রিগুলোর চেয়ে বেজোড় রাত্রিগুলোর মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।**

* কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

‘তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করো।’[253]

- **আর লাইলাতুল ক্বদর রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।** কেননা,

* ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে এসেছে,

«أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»

---

[২৫২] বুখারী: ২০২০; মুসলিম: ১১৬৯।

[২৫৩] বুখারী: ২০১৭।

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কতিপয় সাহাবী রমযানের শেষ সাত দিনে লাইলাতুল ক্বদর স্বপ্নে দেখেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমাদের সবার স্বপ্ন শেষ সাত দিনের ব্যাপারে এসে একাত্মতা ঘোষণা করছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতকে নির্দিষ্ট করতে চায়, সে যেন শেষ সাত দিনের মধ্যে তা নির্ধারণ করে।’[254]

* অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي»

‘তোমরা রমযানের শেষ দশ রাতে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ কর। যদি তোমাদের কেউ দুর্বল থাকে অথবা অক্ষম হয়, তাহলে সে যেন শেষ সাত রাতে সেটা খোঁজতে অপারগ না হয়।’[255]

---

[২৫৪] বুখারী: ২০১৫; মুসলিম: ১১৬৫।

[২৫৫] মুসলিম: ১১৯৫।

- **আর শেষ সাতদিনের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে ২৭ তম রাত্রিটিই লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।** কারণ,

* উবাই ইবন কা‘আব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«وَاللهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»

আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই সে রাতটিকে জানি যে রাতটিতে কিয়াম করার (সালাত নিয়ে দাঁড়ানোর) কথা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা হলো, রমযানের ২৭ তম রাত।’[256]

- **তবে প্রতি বছরেই ক্বদরের রাত ২৭ তারিখে হবে তা নির্ধারিত নয়;** বরং সেটি স্থানচ্যুত হয়; কোনো বছর ২৭, আবার কোনো বছরে ২৫ হয়ে থাকে। এতে একমাত্র আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছা নিহিত।

এর প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। তিনি বলেছেন,

«التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى»

---

[২৫৬] মুসলিম: ৭৬২।

“তোমরা এ রাতটিকে রমযানের শেষ দশকে তালাশ কর; নয় রাত বাকী থাকতে তালাশ করো, সাত রাত বাকী থাকতে তালাশ করো, পাঁচ রাত বাকী থাকতে তালাশ করো”।[257]

ইমাম ইবন হাজার রহ. তার ফাতহুল বারীতে বলেন, “আমি প্রাধান্য দিচ্ছি যে, এটি রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে রয়েছে এবং এটি স্থানান্তর হয়ে থাকে।”[258]

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের ওপর অনুগ্রহস্বরূপ এ রাতকে গোপন রেখেছেন। যাতে প্রতেক বান্দা এ রাত অন্বেষণে বেশি করে আমল করতে পারে। এ মহিমান্বিত রাতে সালাত, যিকির ও দু’আ করে আল্লাহর নৈকট্য ও অধিক সাওয়াব অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা এ রাত গোপন রেখেছেন বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে এ রাত অন্বেষণে অধিক সচেষ্ট হয়, আর কে অলস ঘুমায়। কেননা যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর আকাঙ্খী হয় সে তা অর্জনে অধিক চেষ্টা-সাধনা চালায় এবং তা অর্জন করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে থাকে। এ পথে তা লাভ করতে ও সঠিক মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছুতে যত কষ্টই হোক না কেন সেটা তার কাছে গৌণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

---

[২৫৭] বুখারী: ২০২১।

[২৫৮] ফাতহুল বারী: ৪/২৬৬।

তবে কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু বান্দার জন্য কিছু আলামত ও চিহ্ন দিয়ে এ রাতের জ্ঞানকে প্রকাশ করে থাকেন।

* সে কারণেই একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতের আলামত হিসেবে দেখেছিলেন যে সে রাত্রির সকাল বেলা পানি ও মাটির মধ্যে ফজরের সালাত আদায় করছেন। অতঃপর সে রাত্রিতে বৃষ্টি বর্ষিত হলে সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত বৃষ্টি ও মাটির মাঝে আদায় করেন।[259]

- **সম্মানিত ভাই সকল!** ক্বদরের রাতে আল্লাহর রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। প্রিয় বান্দাদের আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সুযোগ করে দেয়া হয়। আর বান্দা যা কিছু আল্লাহর কাছে চায় আল্লাহ তা শ্রবণ করেন, বান্দার চাহিদা ও প্রার্থনার উত্তর দেন ও সৎ কর্মশীলদের জন্য মহা পুরস্কার নির্ধারণ করেন। কেননা ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।
- **তাই আপনারা ক্বদরের রাতের মর্যাদা লাভের অন্বেষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।** আর গাফিলতি ও অলসতা থেকে

---

[২৫৯] বুখারী: ২০২৭; মুসলিম: ১১৬৭।

সাবধান হোন, কারণ এ ধরনের গাফিলতিতে ধ্বংস অনিবার্য।

গত হয়ে গেছে পুরো জীবন ভুলে ও খেলা এবং ক্ষতিগ্রস্ততায়

আমার জীবনের যে সময়টুকু নষ্ট করেছি তার জন্য আফসোস

জীবনের যে সময়টুকু আমি নষ্ট করেছি তাতে আমার কোনো ওযর নেই

আমি প্রশংসা ও শুকরিয়ার কর্তব্য থেকে কত গাফেল হলাম!!

যেহেতু আল্লাহ আমাদেরকে একটি মাস দিয়েছেন, তা আবার এমন মাস

যে মাসে দয়াময় সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির নাযিল করেছেন।

এ মাসের সাথে কী আর কোনো মাসের তুলনা চলে যেখানে আছে লাইলাতুল কদর?

কারণ, এ রাত্রির সংবাদ দিয়ে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে।

গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে তা খোঁজা হবে বেজোড় রাত্রিতে

সুতরাং সে ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে এটাকে এর শেষ দশকে তালাশ করে

এতে নাযিল হয় ফেরেশতারা যাবতীয় নূর ও সৎকাম নিয়ে

আর এজন্যই বলা হয়েছে, শান্তি আর শান্তি যতক্ষণ না উদিত হবে ফজর।

সাবধান! এটাকে গোপন মূলধন হিসেবে জমা করে রাখ, এটা তো সর্বোত্তম মূলধন।

কারণ, এতে রয়েছে বহু মানুষ যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে অথচ সে জানে না।[260]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য করুন যারা এ মাসের সত্যিকারের সিয়াম পালন করেছে, লাইলাতুল ক্বদর লাভ করেছে, এবং এর মাধ্যমে ব্যাপক সাওয়াব ও প্রতিদান প্রাপ্ত হয়েছে।

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন তাদের মধ্যে, যারা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করে, সকল অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে

---

[২৬০] এ কবিতাগুলো ইবনে রাজাবের লাতায়েফুল মা'আরিফে রয়েছে, পৃ. ৩৫১, ৩৫২।

পলায়নকারী, জান্নাতের সুউচ্চ প্রসাদসমূহে নিরাপদ অবস্থানকারী, তাদের সাথে যাদের ওপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন ও গুনাহের কাজ থেকে হেফাযত করেছেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আশ্রয় দিন পথভ্রষ্টকারী ফিতনা থেকে, বাঁচিয়ে রাখুন অশ্লীলতা থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে এবং যা গোপন রয়েছে।

হে আল্লাহ! আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার এবং উত্তম ইবাদত করার তাওফীক দিন। আর আমাদেরকে আপনার আনুগত্যশীল ও ওলীদের কাতারে শামিল করুন। আর দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের কল্যাণ দান করুন ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতাদেরকে এবং সকল মুসলিমকে আপনার দয়ায় ক্ষমা করুন। হে দয়াময়।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর।

ত্রয়োবিংশ আসর

জান্নাতের বর্ণনা

আল্লাহ আমাদেরকে তার অধিবাসী করুন

সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি প্রত্যাশাকারীকে প্রত্যাশার ওপরে পৌঁছান এবং প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনার বেশি দেন। তাওবাকারীর ওপর ক্ষমা ও গ্রহণের দ্বারা অনুগ্রহকারী, সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং তৈরী করেছেন একটি ঘর সেখানে অবতরণের জন্য, আর দুনিয়াকে করেছেন সেখানে নাযিল হওয়ার একটি পর্যায়রূপে। যারা প্রকৃত ঘরের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ তারা তাদের বোকামীরি কারণে এ দুনিয়াকেই তাদের মূল আবাস বানিয়ে নিয়েছে, অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার পূর্বেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা যে সকল সম্পদ কিংবা সন্তান-সন্তুতি অর্জন করেছিল তা তাদের কোনো কাজে আসে নি, তাদের সবাইকেই এতে পরাজিত হতে হয়েছে; তুমি কি কাকদেরকে তাদের ভগ্নাংশের উপর কাঁদতে দেখনি? কিন্তু যাকে আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন সে দুনিয়াকে সঠিকভাবে

চিনতে পেরেছে, ফলে তার সামনে আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ে থাকলেও সে দুনিয়া দ্বারা প্রতারিত হয় নি, সে আল্লাহর ক্ষমা ও এমন জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনব্যাপী। যা শুধু তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, এমন সাক্ষ্য যে সাক্ষীদাতা সে সাক্ষ্যের দলীল-প্রমাণাদি ও মূলনীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর সালাত পেশ করুন, যতদিন মৃদু বাতাস তার উত্তর, দক্ষিন থেকে প্রবাহিত হবে এবং সেটা সামনে ও পিছনে বয়ে যেতে থাকবে। আরও পেশ করুন আবু বকরের উপর যিনি সফর ও অবস্থান সর্বাবস্থায় তাঁর সাথী ছিলেন, অনুরূপ ‘উমারের ওপর, যিনি ইসলামকে এমন তলোয়ার দিয়ে হেফাযত করেছিলেন যার মধ্যে কোনো প্রকার খাঁজ পড়ার ভয় ছিল না, অনুরূপভাবে ‘উসমানের উপর, যিনি তার উপর আপতিত বিপদে ধৈর্যধারণকারী ছিলেন, আর আলীর উপর, যিনি তাঁর উপর কারও হামলা হওয়ার আগেই নিজের বীরত্বে

ছিলেন সম্মুখগামী। অনুরূপভাবে রাসূলের সকল পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ এবং যুগ যুগ ধরে তাদের সুন্দর অনুসারীদের উপর। আর আল্লাহ তাদের উপর যথাযথ সালামও প্রেরণ করুন।

- প্রিয় ভাইয়েরা! আপনার রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে অগ্রসর হোন, যার প্রশস্ততা আসমান এবং জমিনের সমান; যাতে এমন নিয়ামত রয়েছে, যা কোনো চক্ষু কোনো দিন দেখে নি, কোনো কান শুনে নি এবং কোনো অন্তর কল্পনাও করে নি, এমন জান্নাতের প্রতি দ্রুত এগিয়ে চলুন।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ۞مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ أُكُلُهَا دَآئِمٞ وَظِلُّهَاۚ﴾ [الرعد: ٣٥]

'মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেটির দৃষ্টান্ত এরূপ, তার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তার খাদ্যসামগ্রী ও তার ছায়া সার্বক্ষণিক।' {সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ৩৫}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡۖ﴾ [محمد: ١٥]

‘মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্নাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা।” {সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ رِّزۡقٗا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقۡنَا مِن قَبۡلُۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهٗاۖ وَلَهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَهُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥ ﴾ [البقرة: ٢٥]

‘(হে রাসূল!) আপনি তাদের সুসংবাদ দিন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যা তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। যখন জান্নাতবাসীদের কোনো ফল-ফলাদি প্রদান করা হবে, কখন তারা বলবে, এ তো ওই রিযিক যা আমাদেরকে ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছিল এবং

অনুরূপ ফলও প্রদান কর হয়েছিল। আর তথায় তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতমা স্ত্রীগণ। আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে।’ {সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত: ২৫}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَدَانِيَةً عَلَيۡهِمۡ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتۡ قُطُوفُهَا تَذۡلِيلٗا ١٤ وَيُطَافُ عَلَيۡهِم بِـَٔانِيَةٖ مِّن فِضَّةٖ وَأَكۡوَابٖ كَانَتۡ قَوَارِيرَا۠ ١٥ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٖ قَدَّرُوهَا تَقۡدِيرٗا ١٦ وَيُسۡقَوۡنَ فِيهَا كَأۡسٗا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧ عَيۡنٗا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلۡسَبِيلٗا ١٨ ۞وَيَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٞ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ لُؤۡلُؤٗا مَّنثُورٗا ١٩ وَإِذَا رَأَيۡتَ ثَمَّ رَأَيۡتَ نَعِيمٗا وَمُلۡكٗا كَبِيرًا ٢٠ ﴾ [الانسان: ١٤، ٢٠]

‘তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে উদ্যানের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হবে। তাদের চারপাশে আবর্তিত হবে রৌপ্যপাত্র ও স্ফটিক স্বচ্ছ পানপাত্র- রূপার ন্যায় শুভ্র স্ফটিক পাত্র; যার পরিমাপ তারা নির্ধারণ করবে। সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সুরা, সেখানকার এক ঝর্ণা যার নাম হবে সালসাবীল। আর তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা; তুমি তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মুক্তা মনে করবে। আর তুমি যখন দেখবে তুমি সেখানে দেখতে পাবে

স্বাচ্ছন্দ্য ও বিরাট সাম্রাজ্য।’ {সূরা আন-ইনসান, আয়াত: ১৪-২০}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ ١٠ لَّا تَسۡمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةٗ ١١ فِيهَا عَيۡنٞ جَارِيَةٞ ١٢ فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ ١٣ وَأَكۡوَابٞ مَّوۡضُوعَةٞ ١٤ وَنَمَارِقُ مَصۡفُوفَةٞ ١٥ وَزَرَابِيُّ مَبۡثُوثَةٌ ١٦ ﴾ [الغاشية: ١٠، ١٦]

‘তারা সুউচ্চ জান্নাতে অবস্থান করবে, আর তারা সেখানে কোনো অনর্থক কথা-বার্তা শুনতে পাবে না এবং তথায় তাদের জন্য থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা। তথায় রয়েছে সুউচ্চ পালংক, সদা প্রস্তুত পান-পাত্র, সারিবদ্ধ বালিশ ও উন্নত মানসম্পন্ন বিছানাসমূহ।’ {সূরা আল-গাশিয়া, আয়াত: ১০-১৬}

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٢٣ ﴾ [الحج: ٢٣]

‘জান্নাতীদের স্বর্ণের ও মনিমুক্তার অলঙ্কার পরিধান করানো হবে এবং রেশমী কাপড়ের পোশাক পরিধান করানো হবে। {সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৩}

* আল্লাহ আরো বলেন:

﴿عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ٢١﴾ [الانسان: ٢١]

'তাদের উপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাক, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।' {সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ২১}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفۡرَفٍ خُضۡرٖ وَعَبۡقَرِيٍّ حِسَانٖ ٧٦﴾ [الرحمن: ٧٦]

'তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত গালিচার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে।' {সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৬৭}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۖ لَا يَرَوۡنَ فِيهَا شَمۡسٗا وَلَا زَمۡهَرِيرٗا١٣﴾ [الانسان: ١٣]

‘তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যধিক শীত।’ {সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ১৩}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٖ ٥١ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ٥٢ يَلۡبَسُونَ مِن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَقَٰبِلِينَ ٥٣ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ ٥٤ يَدۡعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ٥٥﴾ [الدخان: ٥١، ٥٥]

‘নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে।’ {সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৫১-৫৫}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ أَنتُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ تُحۡبَرُونَ ٧٠ يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١﴾ [الزخرف: ٧٠، ٧٤]

‘তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণখচিত থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে মন যা চায় আর যাতে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী।’ {সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭০-৭১}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٞ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنّٞ ٥٦ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٧ كَأَنَّهُنَّ ٱلۡيَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ ٥٨ ﴾ [الرحمن: ٥٦، ٥٨]

‘সেখানে থাকবে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি সীমিতকারী মহিলাগণ, যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জিন। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। {সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৫৬-৫৭}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِنَّ خَيۡرَٰتٌ حِسَانٞ ٧٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧١ حُورٞ مَّقۡصُورَٰتٞ فِي ٱلۡخِيَامِ ٧٢ ﴾ [الرحمن: ٧٠، ٧٢]

‘সেই জান্নাতসমূহে থাকবে উত্তম চরিত্রবতী অনিন্দ্য সুন্দরীগণ। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? তারা হূর, তাঁবুতে থাকবে সুরক্ষিতা।’ {সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৭০-৭২}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧ ﴾ [السجدة: ١٧]

‘কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।’ {সূরা আস-সিজদা, আয়াত: ১৭}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ ۞لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ وَلَا يَرۡهَقُ وُجُوهَهُمۡ قَتَرٞ وَلَا ذِلَّةٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٦ ﴾ [يونس: ٢٦]

‘যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে **হুসনা তথা সুন্দর প্রতিদান** এবং তা **আরো বাড়তি কিছু**। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই

জান্নাতের অধিকারী, সেখায় অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে।’ {সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬}

এ আয়াতে বর্ণিত **‘হুসনা’** বা **সুন্দর** হলো জান্নাত; কেননা জান্নাতের চেয়ে সুন্দর আর কোনো আবাস নেই। আর আয়াতে বর্ণিত **আরো বাড়তি কিছু** হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার দর্শন। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় করুণা ও দয়ায় আমাদের তা দান করুন।

তাছাড়া জান্নাতের গুণাগুণ, নিয়ামতরাজি, সন্তুষ্টি ও আনন্দদায়ক বিষয়ের বর্ণনায় কুরআনুল কারীমের বহু আয়াত রয়েছে।

০ হাদীসে জান্নাতের বিবরণ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত সম্পর্কে যেসব বিবরণ দিয়েছেন, নমুনা স্বরূপ তার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

* আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنَا عَنِ الْجَنَّةِ، مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: «لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ،

وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ»

‘আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জান্নাত সম্পর্কে বর্ণনা করুন, তা কিসের তৈরি? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইটের তৈরি, তার গাঁথুনী হবে মিশক আম্বরের। তার নুড়ি বা কংকর হবে মনিমুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের। আর তার মাটি যা‘ফরানের। যে তাতে প্রবেশ করবে সে (অশেষ) নিয়ামতপ্রাপ্ত হবে। নিরাশ হবে না, বা অভাব বোধ করবে না, সে তথায় চিরস্থায়ী হবে; মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাক (কখনও) পুরাতন হবে না। তার যৌবন শেষ হবে না।’[261]

* সহীহ মুসলিমে এসেছে, সাহাবী উৎবাহ ইবন গাযওয়ান একদিন ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও তার স্তুতি প্রকাশ করে বললেন,

أَمَّا بَعْدُ، «فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ، يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللهِ لَتُمْلَأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ

২৬১ আহমাদ: ২/৩০৫, ৪৪৫; তিরমিযী: ২৫২৬।

مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ »

'অতঃপর, দুনিয়া তার সমাপ্তির এবং পশ্চাদাপসারণের ঘোষণা দিচ্ছে। দুনিয়ার কিছুই বাকী থাকবে না, একমাত্র ততটুকু যা পাত্রের নিচে অবশিষ্ট থাকে; যা পাত্রের মালিক গ্রহণ করে থাকে। নিশ্চয়ই তোমরা এমন এক বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছো যা শেষ হওয়ার নয়। অতএব তোমরা উত্তম আমলসহ সেদিকে স্থানান্তরিত হও। আর আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার দুই কপাটের মধ্যকার ব্যবধান চল্লিশ বছরের রাস্তার সমপরিমাণ। অথচ এমন একদিন আসবে যেদিন সেখানেও প্রচণ্ড ভীড় থাকবে।'[262]

* অন্য হাদীসে রয়েছে, সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ»

---

[২৬২] মুসলিম: ২৯৬৭।

‘জান্নাতের আটটি দরজা আছে, তন্মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়্যান। এ দরজা দিয়ে সিয়াম পালনকারী ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না।’[263]

* হাদীসে আরও রয়েছে:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا هَلْ مُشَمِّرٍ لِلْجَنَّةِ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا هِيَ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مُشَيَّدٌ، وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ، وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا فِي حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ فِي دَارٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ»، قَالُوا: نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

‘উসামা ইবন যায়েদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! জান্নাতে যাওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকারী কেউ আছে কী? কেননা জান্নাত এমন এক বস্তু যার অবস্থা সম্পর্কে কল্পনাও উদিত হয় না। কা‘বার রবের কসম! তা হচ্ছে, উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, চকচককারী, সুগন্ধি সুবাতাস, সুরম্য অট্রালিকা, প্রবাহমান নদী, পাকা বা সুস্বাদু ফল, অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রী এবং বাহারী পোশাক, তা হবে শান্তির চিরস্থায়ী নীড়।

---

২৬৩ বুখারী: ১৮৯৬; মুসলিম: ১১৫২।

নিরাপদ বাসস্থান, ফল-মূল, চিরসবুজ, নেয়ামতপূর্ণ ও সুউচ্চ সুদৃশ্য মহল্লা। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো ওই জান্নাতের প্রতি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষী ও এর জন্য প্রচেষ্টাকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি সাল্লাম বললেন, তোমরা বল ইন-শাআল্লাহ। অতঃপর উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইন-শাআল্লাহ।’[264]

* অনুরূপভাবে আবু সা‘ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِى إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ».

‘নিশ্চয় জান্নাতের একশ স্তর রয়েছে, যদি পৃথিবীর সকল অধিবাসী তার একটি স্তরে একত্রিত হয়, তবুও তার বিস্তৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে।’[265]

---

২৬৪ ইবন মাজাহ: ৪৩৩২ ইবন হিব্বান: ৭৩৮১। তবে এর সনদ দুর্বল।

২৬৫ আহমাদ ৩/২৯; তিরমিযী: ২৫৩২; তবে সনদ দুর্বল।

অন্য এক হাদীসে ‘আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ»

‘নিশ্চয়ই জান্নাতের একশতটি স্তর রয়েছে। আল্লাহ তার রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য তা তৈরি করেছেন। প্রতি দু’ স্তরের মধ্যে আসমান ও জমিনের ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কারণ তা জান্নাতের মাঝখানে অবস্থিত এবং সর্বোচ্চ জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের নদীসমূহ প্রবহিত হয়, এর ওপরই আল্লাহর আরশ অবস্থিত।’[266]

* অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[২৬৬] বুখারী: ২৭৯০, ৭৪২৩।

«إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفُقِ، مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ»

‘জান্নাতবাসীরা পরস্পর পরস্পরকে কক্ষে অবস্থানরত উপরের দিকে দেখতে পাবে, যেমন- তোমরা দূর আকাশের প্রান্তদেশে পূর্ব বা পশ্চিমে মোতির ন্যায় উজ্জ্বল তারকারাজী দেখে থাকো। আর এটা হবে তাদের পরস্পরের মর্যাদার ভিত্তিতে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ওই স্থান কি নবীদের? তথায় তাঁরা ছাড়া আর কেউ কি পৌঁছতে পারবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! তারা হচ্ছে এমন লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের যথাযথ সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।’[267]

[২৬৭] বুখারী: ৩২৫৬; মুসলিম: ২৮৩১।

* অনুরূপভাবে আবূ মালেক আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا» ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ» .

‘নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে অনেকগুলো কামরা থাকবে। যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরে দেখা যাবে। আল্লাহ তা তৈরি করেছেন ওই সকল ব্যক্তির জন্য, যারা মানুষকে খাদ্য দেয়, সিয়াম পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমায়, তখন তারা সালাতে মগ্ন থাকে।’[268]

* অন্য হাদীসে আবূ মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[২৬৮] মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৪৩; ইবন আবী শাইবাহ্: ৩৩৯৭২; সহীহ ইবন হিব্বান: ৫০৯।

«إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمِ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

'নিশ্চয়ই মুমিনদের জন্য জান্নাতে একটি সুরক্ষিত মোতির তাবু থাকবে। আসমানের দিকে তার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মঞ্জিল। আর মুমিনদের জন্য সেখানে এমন পরিবারসমূহ থাকবে, মুমিন সে তাঁবুগুলোর চারপাশে ঘোরাফেরা করবে অথচ তাদের কেউ কাউকে দেখতে পাবে না।'[269]

* অনুরূপভাবে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتْفِلُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ الأَنْجُوجُ، عُودُ الطِّيبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِينُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ»

'সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পুর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। তারপর যে দলটি প্রবেশ করবে তারা

---

[২৬৯] বুখারী: ৩২৪৩, ৪৮৭৮; মুসলিম: ২৮৩৮।

হবে আকাশের সবচেয়ে আলোকিত তারকার চেয়ে উজ্জ্বল। যারা জান্নাতে যাবে তারা পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুতু আসবে না, কফ-শ্লেষাও আসবে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের, ঘাম হবে মেশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত। তাদের সুগন্ধি কাঠ হবে মুল্যবান আলাঞ্জুজ (সুগন্ধিযুক্ত কাঠ) সকলের গঠন হবে আদি পিতা আদম 'আলাইহিস সালামের ন্যায় লম্বায় ষাট হাত লম্বা।'[270]

অন্য বর্ণনায় আছে,

« لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا»

'তাদের মধ্যে কোনো মতনৈক্য থাকবে না। তারা পরস্পর হিংসা করবে না, তারা সকলে এক আত্মা সদৃশ হবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করবে।'[271]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِينُ»

---

[২৭০] বুখারী; ৩৩২৭; মুসলিম: ২৮৩৪।

[২৭১] বুখারী: ৩২৪৫; মুসলিম: ২৮৩৪।

“আর তাদের স্ত্রীগণ হবেন ডাগর নয়না হূরীগণ”[272]।

* অন্য হাদীসে রয়েছে, জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ» قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ»

‘নিশ্চয় জান্নাতীগণ পানাহার করবে অথচ থুতু ফেলবে না, পেশাব-পায়খানাও করবে না, নাকও ঝাড়বে না। সাহাবীগণ বললেন, তাহলে খাদ্যের কি হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ঢেকুর দেবে এবং মিশকের ন্যায় ঘাম বের হবে। তাদের তাসবীহ ও তাহমীদ শিখিয়ে দেয়া হবে যেমনি তাদেরকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ইলহাম হবে।’[273]

---

[২৭২] মুসলিম: ২৮৩৪।

[২৭৩] মুসলিম: ২৮৩৫।

* অন্য হাদীসে রয়েছে, যায়েদ ইবন আরকাম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِئَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ . حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ».

'শপথ ওই সত্তার! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, নিশ্চয়ই তাদের মধ্য হতে অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের মধ্য হতে প্রত্যেককে একশত ব্যক্তির ন্যায় পানাহার, সহবাস শক্তি ও চাহিদা প্রদান করা হবে। তাদের শরীরের প্রয়োজন (পয়ঃনিস্কাষণের ব্যবস্থা) হবে শরীরের চামড়ার উপর থেকে বের হওয়া ঘাম, যা মিশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত হবে। অতঃপর তাদের পেট আবার খালি হয়ে যাবে।'[274]

* অন্য হাদীসে রয়েছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ

---

[২৭৪] আহমাদ ৪/৩৬৭; সহীহ ইবন হিব্বান: ৭৪২৪।

لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الخِمَارَ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

“জান্নাতে তোমাদের কারও ধনুক অথবা কারও পা রাখার স্থান দুনিয়া ও তাতে যা আছে তা থেকেও উত্তম। যদি কোনো জান্নাতি মহিলা যমীনের দিকে তাকাতো তবে যমীন পর্যন্ত সকল স্থান আলোকিত হয়ে যেতো, আর তার সুগন্ধে এ সকল স্থান পূর্ণ হয়ে যেতো। জান্নাতি মহিলার একটি উড়না দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে তা থেকে উত্তম।’[275]

* অন্য হাদীসে রয়েছে, আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً».

‘নিশ্চয় জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে। জান্নাতীগণ প্রতি শুক্রবার সে বাজারে আসবেন। অতঃপর উত্তরের বাতাস

---

[২৭৫] বুখারী : ৬৫৬৮।

তাদের মুখমণ্ডল ও কাপড়ের উপর প্রবাহিত হবে। এতে তাদের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর তারা যখন নিজ পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের স্ত্রীরা বলবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের কাছ থেকে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষকতা আরো বেড়ে গেছে।'[276]

* তাছাড়া অন্য হাদীসে রয়েছে, 'আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا» فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 43]

জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন একজন আহ্বানকারী ঘোষণা করবেন: জেনে রাখ! তোমরা সর্বদা সুস্থ্য থাকবে; অসুস্থ হবে না। জীবিত থাকবে; কখনও মরবে না; সর্বদা যুবক থাকবে; কখনও বৃদ্ধ হবে না। নিয়ামত প্রাপ্ত হবে; কখনও বঞ্চিত হবে না। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা যে (ভালো) আমল করতে, তারই জন্য তোমাদেরকে

২৭৬ মুসলিম: ২৮৩৩।

এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' {সূরা আল-'আরাফ, আয়াত: ৪৩}'[277]

* অন্য হাদীসে রয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: 17]

'আল্লাহ তা'আলা বলছেন: আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কখনও কোনো চক্ষু দেখে নি, কোনো কান শুনে নি এবং কোনো অন্তকরণ কল্পনাও করে নি। (তিনি বলেন) এর সত্যতা প্রমাণে তোমরা ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি পাঠ করতে পার। "কোনো প্রাণী জানে না, কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক কী ধরনের নিয়ামত তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।" {সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৭}'[278]

---

২৭৭ মুসলিম: ২৮৩৭।

২৭৮ বুখারী: ৩২৪৪; মুসলিম: ২৮২৪।

* অন্য হাদীসে রয়েছে, সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ " قَالَ: «فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ» قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ»

‘যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করে বলবে, হে জান্নাতীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি পূর্ণ করতে চাও। তারা উত্তরে বলবে সেটা আবার কী? তিনি কি আমাদের আমলের পাল্লাকে ভারী করে দেন নি? আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে দেন নি? আমাদেকে জান্নাতে প্রবেশ করান ন? জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন নি? তিনি বলেন, তখন তাদের জন্য পর্দা উম্মোচন করা হবে। তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) দিকে তাকাবেন। আল্লাহর কসম! তাঁর দর্শনের চেয়ে অধিক প্রিয় এবং চক্ষু শীতলকারী কোনো প্রিয় বস্তুই তিনি মানুষকে দান করেন নি।’[279]

---

২৭৯ মুসলিম: ১৮১; আহমাদ: ১৮৯৪১।

* অন্য হাদীসে রয়েছে, আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»

'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতীদের বলবেন, আমি তোমাদের ওপর চির দিনের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। আর কখনও অসন্তুষ্ট হব না।'[280]

হে আল্লাহ! আমাদের জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা করে দিন এবং আমাদের ওপর সন্তুষ্টির অবারিত ঝর্ণাধারা বর্ষণ করুন। আর আপনার দর্শন ও সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবার তাওফীক দান করুন; যে দর্শনে থাকবে না কোনো ধরণের ক্ষতি ও ক্ষতিকারী এবং ভ্রষ্টকারী ফিতনা।

হে আল্লাহ! সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আপনার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহবীর ওপর।

---

২৮০ বুখারী: ৬৫৪৯; মুসলিম: ২৮২৯।

চতুর্বিংশ আসর

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্যাবলি

আল্লাহ তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল প্রাণবানকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার গঠন সুনিপুণ বানিয়েছেন। আসমানসমূহ ও যমীনকে পৃথক করে দিয়েছেন ইতোপূর্বে উভয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। আপন প্রজ্ঞানুযায়ী বান্দাদের ভাগ্যবান ও হতভাগার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ভাগ্যবানদের কিছু কারণ নির্ধারণ করেছেন যা মুত্তাকী অবলম্বন করে। তারা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে যা অনন্তকালের তাই পছন্দ করে। আমি প্রশংসা করি তাঁর, আর এ স্বীকৃতি প্রদান করছি যে আমি তার প্রশংসার হক আদায় করতে সমর্থ নই। আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আর তিনি অনন্ত কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য।

আমি সাক্ষ্য দেই যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সকল সৃষ্টিকুলের

সত্যিকারের মালিক; তারা সবাই তার দাস। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যিনি সুরত ও সীরাতে তথা চেহারা ও চরিত্রে পূর্ণতর ও সুন্দরতম ব্যক্তি।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষিত করুন তাঁর ওপর, তাঁর সাহাবী আবূ বকরের ওপর যিনি অনুসারীদের মধ্যে মর্যাদায় ছিনিয়ে নেয়ায় বিজয়ী প্রতিযোগী, উমরের ওপর যিনি ছিলেন ন্যায়বিচারক যার তুলনা নয় কোনো মানুষ, উসমানের ওপর যিনি প্রত্যশা মাফিক শাহাদাতের জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছেন, আলীর ওপর যিনি ক্ষণিকের বিষয়াবলি বিকিয়েছেন এবং অনন্তের বিষয়াদি খরিদ করেছেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন আর আল্লাহর দীনের যথার্থ সাহায্যকারী তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

- **মুসলিম ভাইয়েরা!** আপনারা জান্নাতের নিয়ামতসমূহ ও তাতে বিভিন্ন প্রকারের খুশি ও আনন্দের বস্তু সম্পর্কে শুনেছেন। আল্লাহর শপথ, জান্নাত এতই উপযুক্ত যে এর জন্য প্রত্যেক আমলকারী আমল করবে এবং প্রতিযোগীরা এতে প্রতিযযোগিতা করবে। আর মানুষ এর অন্বেষণে

জীবন বিসর্জন করবে; এর চেয়ে নিম্নমানের বস্তু থেকে বিমুখ হবে।

- যদি তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস কর যে, এর জন্য কী আমল করতে হবে এবং তা লাভের পথ কী?

তাহলে বলব যে, এর উত্তর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কালামে ওহীর মাধ্যমে সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে বর্ণনা করেছেন।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٣٥ ﴾ [آل عمران: ١٣٣، ١٣٥]

‘আর তোমরা নিজ রবের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন সমপরিমাণ, যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, নিজেদের গোস্বা সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। তারা কখনও কোনো অশ্লীল

কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে) নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে (ওই পাপ) একধিকবার করে না।' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৫}

উল্লিখিত আয়াতসমূহে জান্নাতীদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে:

১ম গুণ: তারা মুত্তাকী

তারা হচ্ছে ঐসব ব্যক্তিবর্গ, যারা তাদের রবের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে তাঁর আনুগত্য ও সওয়াবের আশায় যাবতীয় নির্দেশের বাস্তবায়ন করেছে এবং তার আনুগত্য ও শাস্তির ভয়ে যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করেছে।

২য় গুণ: তারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের সময় ব্যয় করে

তারা আল্লাহর আদিষ্ট স্থানে ব্যয় করে যেমন-যাকাত, সাদকা, প্রত্যেক পূণ্যের স্থান ও আল্লাহর পথে তথা-জিহাদ ও অন্যান্য ভালো কাজে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে।

স্বচ্ছলতার কারণে অর্থের প্রতি তাদের মহব্বত বৃদ্ধি পায় না আর অর্থের লোভে কৃপণতা তাদেরকে স্পর্শ করে না। অনুরূপভাবে অভাব-অনটন বা দারিদ্র্য তাদেরকে প্রয়োজন পড়তে পারে এ আশংকায় সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত রাখে না।

৩য় গুণ: তারা গোস্বা সংবরণ করে

তারা যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন নিজেদের ক্রোধ হজম করে, ফলে তারা সীমালঙ্ঘন করে না এবং এর কারণে অন্যের ওপর হিংসা-দ্বেষে জড়িত হয়ে পড়ে না।

৪র্থ গুণ: তারা মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে

অর্থাৎ যারা তাদের ওপর জুলুম করে ও সীমালঙ্ঘন করে, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের জন্য প্রতিশোধ নেয় না।

* এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤ ﴾ [ال عمران: ٣٤]

‘আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ভালোবাসেন।’ {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪} এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ক্ষমা করা সেখানেই প্রশংসনীয়, যেখানে সেটা ইহসান তথা অনুগ্রহের মধ্যে পড়বে, যখন সেটা ক্ষমার স্থানে হয়, অর্থাৎ এর মাধ্যমে অপরাধীর সংশোধনের আশা করা যায়। কিন্তু যদি ক্ষমার কারণে সে ব্যক্তির অপরাধ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সেখানে তাকে ক্ষমা করা যেমন প্রশংসনীয় কাজ নয় তেমনি তার দ্বারা সাওয়াবেরও আশা করা যায় না।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ [الشورى: ٤٠]

‘যে ক্ষমা করে ও সংশোধন করে, তার প্রতিদান তো রয়েছে আল্লাহর কাছে।’ {সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৪০}

৫ম গুণ: তারা অশ্লীল কাজ হয় গেলে কিংবা নিজেদের উপর যুলুম করলে নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে

‘ফাহেশা’ বা অশ্লীলতা ওই জাতীয় পাপকে বলে: যে পাপ মানুষ ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট মনে করে। আর তা হচ্ছে কবীরা গুনাহ।

যেমন, ১. মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ২. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, ৩. সুদ খাওয়া, ৪. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৫. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৬. যিনা করা, ৭. চুরি করা ইত্যাদি।

আর মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করা: এটা ব্যাপক বিষয়, যা সগীরা ও কবীরা উভয় গুনাহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সুতরাং যখন তারা কোনো দোষ বা গুনাহ করে বসে তখনই সে বিরাট সত্ত্বার কথা স্মরণ করে যার অবাধ্যতা তারা করছে; ফলে তারা তাঁকে ভয় পায়; কিন্তু সাথে সাথে তারা ক্ষমা ও দয়াকেও স্মরণ করে এবং সে ক্ষমা পাওয়ার উপায়সমূহ অবলম্বনে সচেষ্ট হয় আর তাঁর কাছে তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; আর তাঁর কাছে চায় তিনি যেন এ গুনাহগুলোকে তাঁর ক্ষমা দিয়ে ঢেকে দেন, সেগুলোর উপর শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী: "আল্লাহ ছাড়া আর পাপ মার্জনাকারী কী কেউ আছে?" এর দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে যে,

তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে ক্ষমা চায় না; কারণ, তিনি ব্যতীত কেউই ক্ষমা করতে পারে না।

৬ষ্ঠ গুণ: তারা জ্ঞাতসারে পাপ কাজ বারবার করে না:

অর্থাৎ তারা যে কাজটি করেছে সেটাকে পাপ জেনে, যাঁর অবাধ্য হয়েছে সে বিরাট সত্ত্বার কথা জেনে, তাঁর ক্ষমার বিষয়টি নিকটে মনে করে বারবার সে পাপটি করে না; বরং তারা সে পাপ দ্রুত বর্জন করে ও তাওবা করে; কারণ জেনে-বুঝে ছোট গুনাহ বারবার করার ফলে তা কবীরা গুনাহে রুপান্তরিত হয়ে যায়। আর তা ধীরে ধীরে গুনাহগারকে কঠিন পরিণতির দিকে ধাবিত করবে।

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١ ﴾ [المؤمنون: ١، ١١]

‘১. মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। ২. যারা নিজের সালাত বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে আদায় করে। ৩. যারা অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হয় না। ৪. যারা যাকাত প্রদান করে। ৫. যারা নিজ যৌনাঙ্গ সংযত রাখে। ৬. তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তিরস্কৃত হবে না। ৭. অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। ৮. এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে। ৯. এবং যারা তাদের সালাতসমূহের হিফাযত করে। ১০. তারাই উত্তরাধিকারী। ১১. যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।’ {সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত : ১-১১}

উল্লিখিত আয়াতসমূহে জান্নাতীদের আরো কিছু গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে:

১ম গুণ: যারা ঈমান এনেছে

যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং প্রত্যেক ওই সকল বস্তুর ওপর ঈমান আনে, যার প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। যেমন-ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও আখেরাতের ওপর। তেমনি তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস রাখে।

তারা সেই বিশ্বাস এমন দৃঢ়তার সঙ্গে রাখে যে, তা তাদেরকে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিতে, স্বীকৃতি দিতে, কথা ও কাজে পরিণত করতে বাধ্য করে।

২য় গুণ : যারা বিনয়াবনত হয়ে সালাত আদায় করে

সালাতে তারা তাদের অন্তরকে হাযির রাখে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে স্থির রাখে, এটা মনের মধ্যে আনয়ন করে যে, তারা তাদের সালাতে মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান। আল্লাহর সঙ্গে তাঁর কথা দিয়ে কথপোকথন করছে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করছে তাঁর জিকিরের মাধ্যমে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিচ্ছে তার দু‘আর মাধ্যমে। সুতরাং তারা বাহ্যিক ও আন্তরিক সার্বিকভাবে প্রকৃত বিনয়াবনত।

৩য় গুণ: যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে

আয়াতে বর্ণিত ‘লাগও’ বা অযথা বলতে এমন কথা ও কাজকে বুঝায় যাতে কোনো ফায়দা নেই, নেই কোনো কল্যাণ। সুতরাং তারা এসব বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিমুখ থাকে তাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, কঠিন হুশিয়ারী কারণে। তারা তাদের মূল্যবান সময়কে উপকারহীন কাজে নষ্ট করে না। সুতরাং যেরূপে তারা নিজ সালাতকে খুশু‘ বা বিনয়াবনত হওয়ার মাধ্যমে

সংরক্ষণ করে, তেমনি তারা তাদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট না করার মাধ্যমে হেফাযত করে। আর যখন তাদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে, তারা অযথা ও উপকারহীন কাজে তাদের সময়কে নষ্ট করে না, তখন যে সকল কাজ তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে তারা তা থেকে দূরে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

৪র্থ গুণ: যারা তাদের যাকাতকে পালন করে থাকে

এখান যাকাত শব্দ দ্বারা সে সম্পদ উদ্দেশ্য হতে পারে যা ফরয হিসেবে প্রদান করতে হয়। আবার হতে পারে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন সকল কথা ও কাজ যা দ্বারা অন্তর পবিত্র ও স্বচ্ছ হয়।

৫ম গুণ: যারা তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে

তারা নিজেদের লজ্জাস্থান যিনা-ব্যভিচার ও সমকামিতা তথা যৌনাঙ্গ দ্বারা যত প্রকার চারিত্রিক অঘটন হওয়া সম্ভব তা তেকে মুক্ত রাখে; কারণ এতে রয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতা, সামাজিক ও চারিত্রিক অধঃপতন। এখানে লজ্জাস্থানের হিফাযত দ্বারা ব্যাপকভাবে এসব ছাড়াও অন্যান্য কিছুও অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন- পর নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া বা কাউকে অবৈধভাবে স্পর্শ করা।

* আল্লাহর বাণী “তারা তিরস্কৃত হবে না” এর দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে যে, মূল হচ্ছে একজন মানুষ এসব কাজ দ্বারা তিরস্কৃত হবে; কেবলমাত্র স্ত্রী ও নিজের কৃতদাসী এর ব্যতিক্রম। কারণ মানুষের এর প্রয়োজন রয়েছে; এর মাধ্যমে সে প্রাকৃতিক চাহিদা মেটাতে পারে এবং সন্তান-সন্ততি লাভ করতে পারে।

* আর আল্লাহর বাণী “অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে” এর ব্যাপকতা প্রমাণ করে যে, অন্য যে কোনো পন্থায় যৌনক্ষুধা মিটালে সে তিরস্কৃত হবে; সুতরাং হস্ত মৈথুন (যাকে খারাপ অভ্যাসও বলা হয়) তা হারাম হবে। যেহেতু এর দ্বারা স্ত্রী ও কৃতদাসী ছাড়া অপাত্রে বীর্যপাত করা হয়।

৬ষ্ঠ গুণ: যারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে

আমানত অর্থ অন্যের কাছে কোনো কথা, কাজ ও সম্পদকে নিঃশঙ্কচিত্তে গচ্ছিত রাখা। সুতরাং কেউ যদি তোমার কাছে গোপন কথা বলে, তাহলে সে তাকে কথাটি তোমার কাছে আমানত হিসেবে রেখেছে। অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি তোমার নিকট এমন কাজ করে যা সে অন্যের কাছে প্রকাশ করা অপছন্দ করে, তাহলে সে ওই কাজটি তোমার কাছে

আমানত হিসেবে রেখেছে। তদ্রূপ যদি কেউ কোনো সম্পদ তোমার কাছে সংরক্ষনের জন্য সোপর্দ করে তাহলে ওই সম্পদ সে তোমার কাছে আমানত রেখেছে।

আর অঙ্গীকার হচ্ছে: মানুষ নিজের উপর অন্যের জন্য যা বাধ্য করে নেয়। যেমন আল্লাহর জন্য কোনো কিছু মানত করা এবং মানুষের মধ্যে প্রচলিত ওয়াদা-অঙ্গীকার বা চুক্তি।

সুতরাং জান্নাতিরা তাদের মধ্যকার আমানত এবং তাদের মধ্যকার পরস্পর কৃত অঙ্গীকার ও আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তাছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা কোনো বৈধ শর্ত পূরণের বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৭ম গুণ: যারা সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান থাকে

তারা সালাতকে নষ্ট করা থেকে হেফাযত করার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তাই তারা সেটার সময়ের প্রতি লক্ষ্য শর্ত, রুকন ও ওয়াজিবসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে থাকে।

- উপরে বর্ণিত জান্নাতিদের গুণাবলী ছাড়াও কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদের আরও বহু গুণ বর্ণনা

করেছেন; যাতে করে যারা জান্নাতে যেতে চায় তারা এসব গুণে গুণান্বিত হতে পারে।

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদীসে জান্নাতী হওয়ার পদ্ধতি বলা হয়েছে: যেমন,

* আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ »

‘আর যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের একটি রাস্তা সহজ করে দেন।’[281]

* আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ»

[২৮১] মুসলিম: ২৬৯৯।

‘আমি কি তোমাদের বলব না কোন জিনিস গুনাহকে বিলুপ্ত করে ও মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে? সাহাবীগণ বললেন, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, শীতকালে ঠান্ডার মধ্যে উত্তমরূপে ওযু করা, বেশি বেশি মসজিদের দিকে পদক্ষেপ এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের অপেক্ষা করা।’[282]

* সহীহ মুসলিমে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ».

‘তোমাদের মধ্যকার যে কেউ উত্তমরূপে সব স্থানে পানি পৌঁছিয়ে ওযু করে, অতঃপর কালেমা শাহাদাত তথা ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল’ এটা পাঠ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেন। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।’[283]

---

[২৮২] মুসলিম: ২৫১।

[২৮৩] মুসলিম: ২৩৪।

* অনুরূপভাবে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে আরও বর্ণিত আছে, দীর্ঘ হাদীসে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে মুয়াজ্জিনের আহ্বানে আন্তরিকভাবে সাড়া দেয় তথা প্রতিটি বাক্যের উত্তর দেয় এবং সালাতে শরীক হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[284] (হাদীসের সারাংশ)

* উসমান ইবন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে আরও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ বানায়, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন।’[285]

* উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ».

---

[২৮৪] মুসলিম: ৩৮৫।

[২৮৫] বুখারী: ৪৫০; মুসলিম: ৫৩৩।

‘আল্লাহ তা‘আলা বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ওই সালাতসমূহ উত্তমরূপে আদায় করে এবং তা আদায়ের ব্যাপারে কোনো প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন না করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’[286]

* সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমল দ্বারা জান্নাতী হওয়া যায়? উত্তরে তিনি বললেন,

«عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ».

‘তুমি অধিক পরিমাণে সিজদা কর। যত বেশি সিজদা করবে আল্লাহ তোমার মর্যাদা ততখানি বৃদ্ধি করে দেবেন এবং গুনাহ মাফ করে দেবেন।’[287]

* উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[২৮৬] আহমাদ ৫/৩১৭; আবু দাউদ: ৪২৫; নাসাঈ: ১/২৩০; ইবন মাজাহ: ১৪০১।

[২৮৭] মুসলিম: ৪৮৮।

« مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ ».

‘যদি কোনো মুসলিম আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য ফরয ছাড়াও দিবারাতে বারো রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[288]

আর সেগুলো হচ্ছে: চার রাকাআত জোহরের পূর্বে, দু রাকাআত জোহরের পর, দু রাকাআত মাগরিবের পর, দু রাকাআত ইশার পর ও দু রাকাআত ফজরের ফরযের পূর্বে।

* মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ. قَالَ « لَقَدْ سَأَلْتَنِى عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ».

---

[২৮৮] মুসলিম: ৭২৮।

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি বড় এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ। তবে তা ওই ব্যক্তির জন্য সহজ, যার জন্য আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। তা হলো: ১। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, ২. সালাত কায়েম করবে, ৩. যাকাত প্রদান করবে, ৪. রমযান মাসে সিয়াম পালন করবে এবং ৫. বাইতুল্লাহর হজ পালন করবে।’[289]

* সাহাল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ ».

‘নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি দরজা আছে যার নাম রাইয়্যান। ওই দরজা দিয়ে শুধুমাত্র সিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করবেন। তাদের সঙ্গে অন্য কেউ প্রবেশ করবে না।’[290]

---

২৮৯ আহমাদ ৫/২৩১, ২৩৭; তিরমিযী: ২৬১৬।

২৯০ বুখারী: ১৮৯৬; মুসলিম: ১১৫২।

* আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ».

'এক উমরা হতে দ্বিতীয় উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারাস্বরূপ। আর হজ্জে মাবরূর বা কবূল হজ্জের সাওয়াব জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়।'[291] অর্থাৎ যে ব্যক্তি কবূল হজ করল, সে জান্নাতী।'

* জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ ، وَيَرْحَمُهُنَّ ، وَيَكْفُلُهُنَّ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ ، قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ ، أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً ، لَقَالَ: وَاحِدَةً».

'যে ব্যক্তি নিজ ৩টি কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করে এবং তাদের আদর যত্ন করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

২৯১ বুখারী: ১৭৭৩; মুসলিম: ১৩৪৯।

ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, যদি দু'টি কন্যা সন্তান হয়? তিনি উত্তর দিলেন, তবুও ওয়াজিব। সাহাবীগণ কেউ কেউ বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ১টি কন্যা সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত, তাহলে তিনি অবশ্যই একই উত্তর দিতেন।'[292]

* আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ « تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ».

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করায়? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র।'[293]

* 'ইয়াদ ইবন হিমার আল-মুজাশে'য়ী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ...»

---

২৯২ আহমাদ ৩/৩০৩।

২৯৩ তিরমিযী: ২০০৪; ইবন মাজাহ: ৪২৪৬; ইবন হিব্বান: ৪৭৬।

“জান্নাতী তিন প্রকার: ১. ন্যায়-বিচারক, সদকাদানকারী, তৌফিকপ্রাপ্ত বাদশাহ, ২. দয়াবান, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রত্যেক মুসলিমের সঙ্গে নম্র ব্যবহারকারী ও ৩. সচ্চরিত্র ও যাচ্ঞা করা থেকে পবিত্র ব্যক্তি অথচ সে বড় পরিবারের অধিকারী অভাবী।’[294]

হে ভ্রাতাগণ! এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করা হলো, যাতে জান্নাতী ব্যক্তিগণের গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা করে এটা শুধু তার জন্য।

আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই যেন তিনি আমাদের ও আপনাদের সে পথের অনুসারী করেন এবং আমাদের জান্নাতের পথে অটল রাখেন। নিশ্চয় তিনি দাতা ও দয়ালু।

আর আল্লাহ সালাত পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর।

---

[২৯৪] মুসলিম: ২৮৬৫।

পঞ্চবিংশ আসর

জাহান্নামের বর্ণনা

আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে আশ্রয় দিন

সকল প্রশংসা চিরঞ্জীব সর্বসত্ত্বার ধারক আল্লাহর জন্য, তিনি শ্বাশত আর কেউ নয়। তিনি আসমান উপরে স্থাপন করেছেন এবং তারকারাজি দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন। পাহাড়রাজি দিয়ে ভূপৃষ্ঠকে মহাশূন্যে স্থির করেছেন। আপন কুদরতে এসব দেহধারীকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং চিহ্নটুকুও মিটিয়ে দিয়েছেন। আবার তিনি ছবিগুলোয় প্রাণ ফুঁকিয়ে দেবেন আর সহসা মৃতরা দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের একদল নেয়ামতস্থান তথা জান্নাতে যাবে। আরেকদল শাস্তিস্থান তথা জাহান্নামে যাবে, তাদের সামনে এর দরজা উন্মুক্ত করা হবে, প্রতিটি দরজার জন্য রয়েছে তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী। তাদেরকে প্রলম্বিত স্তম্ভসমূহে আবদ্ধ করে রাখা হবে চিন্তা ও কষ্টের মধ্যে। সেদিন তাদেরকে তাদের ওপর ও নিচ থেকে শাস্তি গ্রাস করবে, তাদের কেউ করুণাপ্রাপ্ত হবে না।

আমি সাক্ষ্য দেই যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই। এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য যে মুক্তির প্রত্যাশা করে। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যার আনীত দীনকে আল্লাহ পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ওপর বিজয় দান করেছেন।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষিত করুন তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার, সাহাবী এবং যতদিন মেঘমালা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে ততদিন পর্যন্ত আগত তাঁর সকল অনিন্দ্য অনুসারীর ওপর।

- **হে মুসলিম ভাইগণ!** আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছেন এবং আমাদের বিভিন্ন প্রকার আযাবের খবর দিয়েছেন। যা শুনলে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। জান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। তিনি আমাদের ওপর করুণাময় বলেই আমাদের বিভিন্ন ধরণের ভয় দেখিয়ে সতর্ক করেছেন; যাতে আমরা ভালোভাবে সাবধান ও ভীত হতে পারি।
- সুতরাং আল্লাহর কিতাব কুরআনে মাজীদে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে যা এসেছে তা শুনুন; যাতে আপনারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন।

﴿وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤ ﴾ [الزمر: ٥٤]

‘তোমরা স্বীয় রবের অভিমুখী হও এবং তার আজ্ঞাবহ ও অনুগত হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৪}

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١ ﴾ [ال عمران: ١٣١]

‘তোমরা ওই আগুনকে ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।’ {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَاْ وَأَغۡلَٰلٗا وَسَعِيرًا ٤ ﴾ [الانسان: ٤]

‘নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।’ {সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ৪}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ﴾ [الكهف: ٢٩]

‘নিশ্চয় আমরা যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। {সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ২৯}

* আল্লাহ তা‘আলা শয়তানকে লক্ষ্য করে বলছেন:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ٤٢ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوۡعِدُهُمۡ أَجۡمَعِينَ ٤٣ لَهَا سَبۡعَةُ أَبۡوَٰبٖ لِّكُلِّ بَابٖ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٞ مَّقۡسُومٌ ٤٤﴾ [الحجر: ٤٢، ٤٤]

‘নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই, তবে পথভ্রষ্টরা ছাড়া যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে। আর নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান। তার সাতটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজার জন্য রয়েছে তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী।’ {সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৪২-৪৪}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا﴾ [الزمر: ٧١]

‘আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে

এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭১}

* আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ٦ إِذَآ أُلۡقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقٗا وَهِيَ تَفُورُ ٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۖ﴾ [الملك: ٦، ٨]

‘আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর কতইনা নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল! যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তার বিকট শব্দ শুনতে পাবে। আর তা উথলিয়ে উঠবে। ক্রোধে তা ছিন্নভিন্ন হবার উপক্রম হবে।’ {সূরা আল-মুলক, আয়াত: ৬-৮}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يَوۡمَ يَغۡشَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَمِن تَحۡتِ أَرۡجُلِهِمۡ﴾ [العنكبوت: ٥٥]

‘যেদিন আযাব তাদেরকে তাদের উপর থেকে ও তাদের পায়ের নীচে থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে’ {সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৫৫}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ لَهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ ظُلَلٞ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحۡتِهِمۡ ظُلَلٞۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥۚ يَٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦ ﴾ [الزمر: ١٦]

‘তাদের জন্য তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর তাদের নিচের দিকেও থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন; এদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। ‘হে আমার বান্দারা, তোমরা আমার তাকওয়া অবলম্বন কর’।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৬}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَأَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ٤١ فِي سَمُومٖ وَحَمِيمٖ ٤٢ وَظِلّٖ مِّن يَحۡمُومٖ ٤٣ لَّا بَارِدٖ وَلَا كَرِيمٍ ٤٤ ﴾ [الواقعة: ٤١، ٤٤]

‘আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে তীব্র গরম হাওয়া এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত পানিতে, আর প্রচণ্ড কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয়, সুখকরও নয়।’ {সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৪১-৪৪}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّٗاۚ ﴾ [التوبة: ٨١]

'তারা (মুনাফিকরা) বলে, এ গরমে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও প্রচণ্ড উত্তপ্ত।' {সূরা আত-তওবা, আয়াত: ৮১}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ ١٠ نَارٌ حَامِيَةُۢ ١١ ﴾ [القارعة: ١٠، ١١]

'আপনি কি জানেন তা কী? তা হলো: প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।' {সূরা আল-কারি'আহ, আয়াত: ১০-১১}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُجۡرِمِينَ فِي ضَلَٰلٖ وَسُعُرٖ ٤٧ يَوۡمَ يُسۡحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ٤٨ ﴾ [القمر: ٤٧، ٤٨]

'নিশ্চয় অপরাধীরা রয়েছে পথভ্রষ্টতা ও (পরকালে) প্রজ্জ্বলিত আগুনে। সেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে। (বলা হবে) জাহান্নামের ছোঁয়া আস্বাদন কর।' {সূরা আল-কামার, আয়াত: ৪৭-৪৮}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سَقَرُ ٢٧ لَا تُبۡقِي وَلَا تَذَرُ ٢٨ لَوَّاحَةٞ لِّلۡبَشَرِ ٢٩ ﴾ [المدثر: ٢٧، ٢٩]

'কিসে আপনাকে জানাবে জাহান্নামের আগুন কী? এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। চামড়াকে দগ্ধ করে কালো করে দেবে।' {সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ২৭-২৯}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ ﴾ [التحريم: ٦]

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের সে অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয় ও কঠিন স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।' {সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّهَا تَرۡمِي بِشَرَرٖ كَٱلۡقَصۡرِ ٣٢ كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٞ صُفۡرٞ ٣٣ ﴾ [المرسلات: ٣٢، ٣٣]

‘নিশ্চয় তা (জাহান্নাম) ছড়াবে প্রাসাদসম স্ফুলিঙ্গ। তা যেন হলুদ উষ্ট্রী।’ {সূরা আল-মুরসালাত, আয়াত: ৩২-৩৩}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ يَوۡمَئِذٖ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلۡأَصۡفَادِ ٤٩ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٖ وَتَغۡشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ٥٠ ﴾ [ابراهيم: ٤٩، ٥٠]

‘আর সে দিন তুমি অপরাধীদের দেখবে তারা শিকলে বাঁধা। তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের চেহারাসমূহকে ঢেকে ফেলবে।’ {সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪৯-৫০}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِذِ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسۡحَبُونَ ٧١ ﴾ [غافر: ٧١، ٧٢]

‘যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে- ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।’ {সূরা গাফির/আল-মুমিন, আয়াত: ৭১-৭২}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ يُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ ١٩ يُصۡهَرُ بِهِۦ مَا فِي بُطُونِهِمۡ وَٱلۡجُلُودُ ٢٠ وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنۡ حَدِيدٖ ٢١ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا مِنۡ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ ٢٢ ﴾ [الحج: ١٩، ٢٢]

‘তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে তা থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন কর।’ {সূরা আল-হজ, আয়াত: ১৯-২২}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا سَوۡفَ نُصۡلِيهِمۡ نَارٗا كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُودُهُم بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَۗ﴾ [النساء: ٥٦]

‘নিশ্চয় যারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করবে, আমি তাদের আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে তখন আবার আমি অন্য চামড়া দিয়ে তা পাল্টে

দেব। যাতে তারা আযাব ভোগ করবে পারে।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৬}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ٤٣ طَعَامُ ٱلۡأَثِيمِ ٤٤ كَٱلۡمُهۡلِ يَغۡلِي فِي ٱلۡبُطُونِ ٤٥ كَغَلۡيِ ٱلۡحَمِيمِ ٤٦ ﴾ [الدخان: ٤٣، ٤٦]

‘নিশ্চয় যাক্কূম বৃক্ষ। পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মত, উদরসমূহে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মত।’ {সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৪৩-৪৬}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٞ تَخۡرُجُ فِيٓ أَصۡلِ ٱلۡجَحِيمِ ٦٤ طَلۡعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ ٦٥﴾ [الصافات: ٦٤، ٦٥]

‘এটি একটি বৃক্ষ যা উদগত হয় জাহান্নামের মূল থেকে। এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের ন্যায়।’ {সূরা আস-সাফফাত: ৬৪-৬৫}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمۡ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلۡمُكَذِّبُونَ ٥١ لَأٓكِلُونَ مِن شَجَرٖ مِّن زَقُّومٖ ٥٢ فَمَالِـُٔونَ مِنۡهَا ٱلۡبُطُونَ ٥٣ فَشَٰرِبُونَ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡحَمِيمِ ٥٤ فَشَٰرِبُونَ شُرۡبَ ٱلۡهِيمِ ٥٥ ﴾ [الواقعة: ٥١، ٥٥]

'অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষের ফল, তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। অতঃপর পান করাবে উত্তপ্ত পানি, পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়।' {সূরা আল-ওয়াকি'আ, আয়াত: ৫১-৫৫}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ٢٩ ﴾ [الكهف: ٢٩]

'যদি তারা পান করার জন্য প্রার্থনা করে তখন তাদের পুঁজের ন্যায় পানীয় দ্রব্য দেয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। তা কতই না নিকৃষ্ট পানি এবং খুবই মন্দ আশ্রয়স্থল।' {সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ২৯}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمٗا فَقَطَّعَ أَمۡعَآءَهُمۡ ١٥ ﴾ [محمد: ١٥]

'এবং তাদের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে। যা তাদের নাড়ী-ভুড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে।' {সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَيُسۡقَىٰ مِن مَّآءٖ صَدِيدٖ ١٦ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأۡتِيهِ ٱلۡمَوۡتُ مِن كُلِّ مَكَانٖ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٖۖ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٞ ١٧ ﴾ [ابراهيم: ١٦، ١٧]

‘তাদের পুঁজ মেশানো পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে। তা গলার ভেতর প্রবেশ করলে মনে হবে চতুর্দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করছে। এরপরও সে মরবে না। তার পিছনে অপেক্ষা করছে কঠোর আযাব।’ {সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১৬-১৭}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُجۡرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ٧٤ لَا يُفَتَّرُ عَنۡهُمۡ وَهُمۡ فِيهِ مُبۡلِسُونَ ٧٥ وَمَا ظَلَمۡنَٰهُمۡ وَلَٰكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ٧٦ وَنَادَوۡاْ يَٰمَٰلِكُ لِيَقۡضِ عَلَيۡنَا رَبُّكَۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ٧٧ ﴾ [الزخرف: ٧٤، ٧٧]

‘নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। তাদের আজাব লাঘব করা হবে না। তারা তথায় হতাশ হয়ে থাকবে। আমরা তাদের প্রতি জুলুম করিনি বরং তারাই ছিল জালেম। তারা ডেকে বলবে হে মালিক! (ফেরেশতার নাম) তোমার রবকে বল, যেন আমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করে দেন

(আমাদের মৃত্যু দেন)। সে বলবে নিশ্চয়ই তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।’ {সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭৪-৭৭}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مَّأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَٰهُمۡ سَعِيرٗا ٩٧ ﴾ [الاسراء: ٩٧]

‘তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দেব।’ {সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৯৭}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمۡ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغۡفِرَ لَهُمۡ وَلَا لِيَهۡدِيَهُمۡ طَرِيقًا ١٦٨ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ١٦٩ ﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩]

‘নিশ্চয়ই যারা কুফুরী করে এবং যুলম করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। তিনি তাদের জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখাবেন না। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটা আল্লাহর জন্য সহজ।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৮-১৬৯}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ٦٤ ﴾ [الاحزاب: ٦٤]

‘নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা কাফেরদের লা‘নত করেছেন। তাদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছেন।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣ ﴾ [الجن: ٢٣]

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন তারা তথায় চিরকাল থাকবে।’ {সূরা আল-জিন, আয়াত: ২৩}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ٦ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ ٧ إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ ٨ فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَةِۭ ٩ ﴾ [الهمزة: ٥، ٩]

‘আর কিসে আপনাকে জানাবে হুতামা কী? আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন। যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। নিশ্চয় তা তাদেরকে

আবদ্ধ করে রাখবে প্রলম্বিত স্তম্ভসমূহে।’ {সূরা আল-হুমাযা, আয়াত: ৫-৯}

এছাড়াও জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা ও বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক স্থায়ী শাস্তি সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে।

অনুরূপভাবে হাদীসেও জাহান্নামের বর্ণনা রয়েছে: যেমন,

* হাদীসে রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ».

‘জাহান্নামকে কিয়ামতের ময়দানে আনা হবে। যা ৭০ হাজার ফেরেশতা ৭০ হাজার শিকল দ্বারা (বেঁধে) টেনে উঠাবে।’[295]

* হাদীসে আরো রয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[২৯৫] মুসলিম: ২৮৪২।

«نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا».

'দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনের তাপ সত্তর গুণ বেশি। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দুনিয়ার আগুনই তো শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তিনি উত্তর দিলেন, এর তাপ দুনিয়ার আগুনের ওপর ৬৯ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। প্রত্যেকটিই এর মত গরম।'[296]

* হাদীসে আরো আছে, আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « تَدْرُونَ مَا هَذَا ». قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « هَذَا حَجَرٌ أرسله الله في جهنم مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَالآنَ حين انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا ».

'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির ছিলাম হঠাৎ আমরা একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি

---

২৯৬ বুখারী: ৩২৬৫; মুসলিম: ২৮৪৩।

বলেন, তোমরা কি জান এটা কিসের শব্দ? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ এ ব্যাপারে বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা জাহান্নামের একটি পাথরের শব্দ। যা আল্লাহ ৭০ বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছিলেন, আজ তা জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌঁছল।’[297]

* উৎবাহ ইবন গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খুৎবার মধ্যে জাহান্নামের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন, তিনি বলেন,

قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَوَاللَّهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ

‘জাহান্নামের একটি পাথর জাহান্নামের কিনারা থেকে নিক্ষেপ করা হবে তা নিচ পর্যন্ত পৌঁছতে ৭০ বছর লাগবে। এতদসত্ত্বেও জাহান্নাম পাপীদের দ্বারা ভর্তি হয়ে যাবে। তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হয়েছ?’[298]

* ‘ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে হাদীসে আরও রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[২৯৭] মুসলিম: ২৮৪৪।

[২৯৮] মুসলিম: ২৯৬৭।

«لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِى دَارِ الدُّنْيَا لأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ».

‘যদি জাহান্নামের যাক্কুম ফল দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তার দুর্গন্ধে দুনিয়াবাসীর জীবন-যাপন অসম্ভব হয়ে যাবে।’[299] আবু ঈসা তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান সহীহ’ বলেছেন।

* অন্য হাদীসে নু‘মান ইবন বশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا ».

‘জাহান্নামে যাকে সব চেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে, তাকে জাহান্নামের দু’টি স্যান্ডেল পরিধান করানো হবে যার ফিতাদ্বয় হবে আগুনের। তার উত্তাপে মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে ডেগের ফুটন্ত পানির ন্যায়। সে মনে করবে তাকে

---

২৯৯ আহমাদ ১/৩০১, ৩৩৮; তিরমিযী: ২৫৮৫; ইবন মাজাহ: ৪৩২৫।

সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া হচ্ছে। মূলত তাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হচ্ছে।’[300]

* আরও হাদীসে রয়েছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ».

‘কিয়ামতের ময়দানে দুনিয়ার মধ্যে সব যেয়ে ধনাঢ্য ও সুখী ব্যক্তিকে আনা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নাম থেকে অল্প সময় ঢুকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও দুনিয়াতে সুখ-শান্তিতে ছিলে? তুমি কি কখনও দুনিয়ার নিয়ামত পেয়েছিলে? সে বলবে, না-আল্লাহর কসম! হে আমার রব! আমি কখনও দুনিয়তে শান্তি পাই নি। ঠিক তদ্রুপ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সর্বাধিক কষ্টকর ও অশান্তিতে ছিলে, তাকে অল্প সময়ের জন্য জান্নাতে ঢুকিয়ে নিয়ে আসা হবে,

---

[৩০০] বুখারী: ৬৫৬১, ৬৫২৬; মুসলিম: ২১৩।

অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও অভাব অনটনে ছিলে? সে আল্লাহর কসম করে বলবে, না, আমি কখনও কোনো অভাব-অনটনে বা কষ্টে ছিলাম না।’[301]

অর্থাৎ জাহান্নামী ব্যক্তি দুনিয়ার সকল শান্তি ও নেয়ামতের কথা ভুলে যাবে। আর জান্নাতী ব্যক্তি দুনিয়ার সকল কষ্ট-ক্লেশের কথা ভুলে যাবে।

* অপর হাদীসে রয়েছে, আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ، فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ».

‘কিয়ামতের ময়দানে এক জাহান্নামী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের মালিক হলে কি তা প্রাণের ফিদয়াস্বরূপ খরচ করতে? সে বলবে হে আমার রব! আমি তা করতাম। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আমার বান্দা! আমি

---

[৩০১] মুসলিম: ২৮০৭।

তোমাকে তার চেয়েও সহজ হুকুম দিয়েছিলাম, যখন আমি তোমাকে আদম ('আলাইহিস সালাম) এ পিঠ থেকে বের করেছিলাম। তখন বলেছিলাম তুমি আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি আমার কথা অমান্য করে আমার সঙ্গে অন্যকে শরীক করেছিলে।'[302]

* অন্য হাদীসে,

«عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، وهو ابن أمية، ومنيه أمه ـ : يُنْشِئُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَهْلِ النَّارِ سَحَابَةً سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً مُدْلَهِمَّةً ، فَإِذَا أَشْرَفَتْ عَلَيْهِمْ نَادَاهُمْ: يَا أَهْلَ النَّارِ، أَيَّ شَيْءٍ تَطْلُبُونَ ؟ وَمَا الَّذِي تُسْأَلُونَ ، فَيَذْكُرُونَ بِهَا سَحَابَ الدُّنْيَا ، وَالْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ، فَيَقُولُونَ: نَسْأَلُ بَارِدَ الشَّرَابِ ، فَيُمْطِرُ عَلَيْهِمْ أَغْلالا تُزَادُ فِي أَغْلالِهِمْ ، وَسَلاسِلَ تُزَادُ فِي سَلاسِلِهِمْ ، وَجَمْرًا تُلْهِبُ النَّارَ عَلَيْهِمْ»

'ইয়া'লা ইবন মুনইয়াহ – তাঁর পিতার নাম উমাইয়া আর মুনইয়াহ তার মায়ের নাম- বর্ণনা করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামীদের জন্য ঘন কালো মেঘ সৃষ্টি করবেন। যখন মেঘ তাদের সামনে দেখা যাবে তখন মেঘ তাদের ডেকে বলবে, হে জাহান্নামীরা! তোমরা মেঘ থেকে কি কিছু চাও, তখন তারা দুনিয়ার মেঘের কথা চিন্তা করবে এবং দুনিয়ার

[৩০২] বুখারী: ৩৩৩৪, ৬৫৫৭; মুসলিম: ২৮০৫;

পানির কথা ভাববে, তাই তারা বলবে, আমরা পিপাসিত, আমরা মেঘ থেকে বৃষ্টি চাই, পানি চাই। অতঃপর মেঘ তাদের জন্য আগুনের বেড়ী, শিকল ও আগুনের কয়লা অধিক পরিমাণে বর্ষণ হতে থাকবে। আর আগুনের কয়লা আগুনের দাহ্য আরও শক্তি বাড়িয়ে দেবে।'[303]

* অন্য হাদীসে রয়েছে, আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ثَلَاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ . وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ . قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ ؟ قَالَ: نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ».

'তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না ১. মদ্যপায়ী, ২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ও ৩. জাদুতে বিশ্বাসী। যে ব্যক্তি মদ পান করে মারা যাবে, আল্লাহ তাকে গুওত্বাহ নদীর রক্ত পান করাবেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, নহরে গুওত্বাহ কী? তিনি উত্তরে বললেন, যে নদী দিয়ে জাহান্নামী মহিলাদের

---

৩০৩ ফাওয়ায়েদ তামাম: ৯৬১; তাবারানী ফিল আওসাত্ব, দেখুন: মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৩৯০। দুর্বল।

লজ্জাস্থানের দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত বইতে থাকবে, তার দুর্গন্ধ প্রত্যেক জাহান্নামীর কষ্ট বৃদ্ধি করবে।’[304]

* অন্য হাদীসে জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ» أَوْ «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»

‘আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদা; যে ব্যক্তি নেশা করবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে ‘তীনাতুল খাবাল’ থেকে পান করাবেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলে, হে আল্লাহর রাসূল! তীনাতুল খাবাল কি? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের পুঁজ বা দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম।’[305]

* বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের বলা হবে,

---

[৩০৪] আহমাদ ৪/৩৯৯; মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/১৪৬। দুর্বল।

[৩০৫] মুসলিম: ২০০২।

مَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِى النَّارِ.

'তোমরা কী চাও? তারা বলবে হে রব! আমরা পিপাসিত। আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তখন তাদেরকে ইঙ্গিত করে বলা হবে যে তোমরা কি হাওযে নামবে না? এরপর তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে; তারা দেখতে পাবে জাহান্নামকে মরীচিকার মত; যার একাংশ আরেক অংশকে বিধ্বংস করছে; তারপর তারা জাহান্নামে পতিত হবে।'[306]

হাসান বছরী রহ. বলেন, 'তোমাদের ওই জাহান্নামীদের সম্পর্কে কী ধারণা, যারা ৫০ হাজার বছর পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেখানে তারা কোনো খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না এবং এক ফোঁটা পানিও পান করতে পারবে না। পানির পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হবে। তাদের পেট ক্ষুধায় আগুনের মত জ্বলতে থাকবে। অতঃপর তাদের জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর সেখানে তাদেরকে ফুটন্ত গরম

---

[৩০৬] বুখারী: ৪৫৮১; মুসলিম: ১৮৩।

পানি পান করনো হবে। যার উত্তপ্ততার কোনো তুলনা নেই, যে উষ্ণতা ও উত্তপ্ততা পরিপক্কতা পেয়েছে।'[307]

ইবনুল জাওযী রহ. জাহান্নামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, জাহান্নাম এমন ঘর যার অধিবাসীদের শান্তি থেকে দূরে রাখা হয়েছে। সকল প্রকারের আনন্দ ও শান্তি তেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাদের সাদা চামড়া কাল রঙে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। তাদের পাহাড়ের চেয়ে শক্ত হাতুড়ি দ্বারা পিটানো হচ্ছে। সেখানে শাস্তি দেওয়ার জন্য কঠোর হৃদয়ের ও কঠিন শাস্তিদাতা ফেরেশতা রয়েছে। হায়! যদি তুমি তাদেরকে দেখতে সেই ফুটন্ত পানিতে সাঁতার কাটতে। কঠিন ঠাণ্ডাতে নিক্ষিপ্ত হতে। চিন্তা ও কষ্ট সর্বক্ষণ তাদের সাথী থাকবে, ফরে তারা কখনও খুশী হতে পারবে না। তাদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা সে স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। স্থায়ীভাবে, চিরকাল সেখানে তারা থাকবে, তারা তা থেকে মুক্তি পাবে না। তাদের শাস্তি দেয়ার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে, যারা কঠোর হৃদয়ের হবে। যাদের ধমক আযাব থেকে বড় কষ্টদায়ক হবে। যাদের অনুশোচনা তাদের বিপদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। তাদের যৌবনকালকে পাপ দ্বারা

---

৩০৭ (বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) উমদাতুল কারী: ২৮/৪৮৩।

ধ্বংস করার কারণে তার কাঁদতে থাকবে। তারা যত কাঁদবে কঠোর হৃদয় কঠিন ফেরেশতাগণ তাদেরকে তত বেশি কষ্ট দিতে থাকবে। হায় আফসোস তাদের জন্য যে তারা তাদের রবের রোষানলে পড়েছে! হায় আফসোস তাদের বড় বিপদের জন্য! আহা তাদের কত অপমান যে সকল মানুষের সামনে অপমানিত হচ্ছে। হে সৃষ্টির ঘৃণিত ব্যক্তিরা! এখন তোমাদের দুনিয়ার হারাম উপার্জন কোথায় গেল? আজ তোমাদের পাপ করার আগ্রহ কোথায় গেল? মনে হবে যেন তা ছিল তাদের আকাশ কুসুম কল্পনা। তারপর তাদের এ শরীরকে জাহান্নামে পোড়ানো হবে, যখনই তাদের শরীর পুড়ে যাবে, আল্লাহ নতুন দেহ পরিবর্তন করে দেবেন। যখন শরীরের চামড়া পুড়ে যাবে, নতুন চামড়া দ্বারা পরিবর্তন দেবেন। সেখানে তাদের শাস্তি বাড়ানোর জন্য কঠিন হৃদয়ের ফেরেশতা সর্বক্ষণ নিযুক্ত থাকবে।'

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান। আমাদের চিরস্থায়ী আপমান ও ধ্বংস হতে বাঁচান। হে আল্লাহ আপনি আপনার রহমতে আমাদেরকে মুত্তাকীদের ঘরের বাসিন্দা করুন করুন। আর আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতাসহ মুসলিমদের ক্ষমা করে দিন। হে করুণাময় রব!

আর আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর সালাত পেশ করুন।

ষষ্ঠবিংশ আসর

জাহান্নামে প্রবেশের কারণ

সকল প্রশংসা শক্তিমান, সুদৃঢ়, বিজয়ী, শক্তিশালী, সুউচ্চ আল্লাহর জন্য, ক্ষীণতর স্বরও যার শ্রবণের বাইরে নয়; গর্ভস্থ শিশুর নড়াচড়াও যার দৃষ্টিতে গোপন নয়। তাঁর বড়ত্বের সামনে প্রতাপশালী বাদশাও বিনীত হয়। তাঁর ক্ষমতার সম্মুখে চক্রান্তকারীর চক্রান্ত বিফল হয়। ভুলকারীর ওপর তিনি যেমন চান তাঁর ফয়সালা বাস্তবায়ন করেন। তিনি যাকে চান সৃষ্টিকূলের মধ্য থেকে তাকে নির্বাচিত করেন। আর এরাই বামপন্থী দল আর ওরাই ডানপন্থী। কর্মসম্পাদনকারীদের কর্মসম্পাদনের আগেই এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপি চূড়ান্ত হয়েছে। যদি এ শ্রেণীকরণ না হত তবে মুজাহিদদের জিহাদ বিফলে যেত এবং কাফেরদের মধ্য থেকে ঈমানদারদের কিংবা বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে সন্দেহবাদীদের চেনা যেত না। এ বিন্যাসকরণ না হলে অপরাধীতে জাহান্নাম পূর্ণ হত না। {আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হিদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার কথাই সত্যে পরিণত

হবে যে, ‘নিশ্চয় আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব’।} ওই হলো আল্লাহর হিকমত হে আমার ভাই আর তিনি সকল প্রজ্ঞাবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান। আমি পবিত্র সে সত্তার প্রশংসা করি শোকরগুযারদের অনুরূপ প্রশংসা। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি ধৈর্যশীলদের অনুরূপ সাহায্য। আমি তাঁর কাছে অপমানজনক শাস্তি থেকে পরিত্রাণ চাই।

আমি সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তিনিই সত্য ও প্রকাশ্য মালিক। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও সুনির্বাচিত বিশ্বস্ত রাসূল।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষিত করুন তাঁর ওপর, তাঁর সাহাবী আবূ বকরের ওপর যিনি দীনের ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যে তাঁর প্রথম অনুসারী, উমরের ওপর যিনি আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে দৃঢ় ও অনড়, উসমানের ওপর যিনি রাসূলের দুই কন্যার স্বামী ও উত্তম জোড়ার অধিকারী, আলীর ওপর যিনি বিদ্যার সাগর ও মুক্ত বক্ষের অধিকারী এবং জাহান্নামের অগ্নির কারণসমূহ থেকে পবিত্র। আর রাসূলের সব পরিবার-পরিজন, পুণ্যাত্মা সব সাহাবী ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর দীনের সকল অনুসারীর ওপর।

- **মুসলিম ভাইগণ!** জেনে নিন যে, জাহান্নামে প্রবেশের কিছু কারণ রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে বর্ণনা করেছেন, যাতে করে মানুষ তা থেকে সাবধান হয় ও তা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে।

এ কারণসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত:

প্রথম: এমন কারণ যা মানুষকে কাফির বানায়। এ রকম কাজে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমান থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যায় এবং তা তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম অবধারিত করে।

দ্বিতীয়: এমন কারণ যদ্বারা মানুষ ফাসিক হয়। এরকম অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তি ন্যায়-পরায়ণতা থেকে পাপাচারী হয়ে পড়ে; এবং তা তাকে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার উপযোগী বানিয়ে দেয়; যদিও তাকে সেখানে চিরস্থায়ী করে না।

- **প্রথম শ্রেণীর লোকদের প্রকারভেদ:**

১ম প্রকার: আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা

যা সংঘটিত হয় আল্লাহর রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং আসমা ওয়াস-সিফাতের মধ্যে শির্ক করার মাধ্যমে। যেমন- এ বিশ্বাস

করা যে, আল্লাহর সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো স্রষ্টা আছে, সৃষ্টির ব্যাপারে তার সংশ্লিষ্টতা আছে অথবা সে এককভাবে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। তেমনি এ ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ রয়েছে যে ইবাদত পাওয়ার উপযোগী অথবা আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করা, ফলে তার জন্য কিছু ইবাদত নিবেদিত করা অথবা এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর মত অন্য কারও সে রকম জ্ঞান, ক্ষমতা কিংবা সম্মান রয়েছে; এ জাতীয় যে কোনো বিশ্বাসই শিরকে আকবার বড় শির্ক; যা ঐ ধরণের বিশ্বাসীকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী বানাবে।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢ ﴾ [المائدة: ٧٢]

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৭২}

২য় প্রকার: আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী করা অথবা তাঁর ফেরেশতাগণ অথবা রাসূলগণ অথবা কিয়ামত দিবস অথবা তাকদিরের ভালো-মন্দকে অস্বীকার করা।

সুতরাং যারাই উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের কোনো কিছু মিথ্যা মনে করবে কিংবা অস্বীকার করবে অথবা সন্দেহ পোষণ করবে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٥١ ﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١]

‘নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে পার্থক্য করতে চায়, আর আমরা কতিপয় রাসূলে ঈমান রাখি ও কতিপয় রাসূলকে অস্বীকার করি; বস্তুত এরা মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে এরাই নিরেট কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫০-১৫১}

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ٦٤ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ٦٥ يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠ ٦٦ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ٦٧ رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنٗا كَبِيرٗا ٦٨ ﴾ [الاحزاب: ٦٤، ٦٨]

‘নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের ওপর লা‘নত করেছেন ও তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। সেখানে কোনো বন্ধু বা কোনো সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের চেহারা আগুনে উলট পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায় আফসোস! যদি আমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করতাম! আমরা তো আমাদের নেতাদের ও বড়দের অনুসারী ছিলাম। তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের রব! আপনি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদের প্রতি মহা অভিসম্পাত করুন।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪-৬৮}

৩য় প্রকার: ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির কোনো একটি ফরযকে অস্বীকার করা।

- সুতরাং যে কেউ আল্লাহর একত্ববাদ ফরয হওয়া অস্বীকার করে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান অস্বীকার করে অথবা তাঁর রিসালত সকল মানুষের জন্য হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা পাঁচ সালাতের ফরয, অথবা যাকাত অথবা রমযানের সিয়াম অথবা হজ অস্বীকার করে, সে কাফির ব্যক্তি হবে। কারণ; সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের ঐকমত্য তথা ইজমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।
- ঠিক তদ্রুপ কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে শির্ক হারাম হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা যাদের হত্যা করা আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন তাদের হত্যা করা হারাম মনে করতে অস্বীকার করল অথবা যিনা-ব্যভিচার অথবা পুং মৈথুন অথবা মদ পান ইত্যাদি যেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নায় প্রকাশ্য ভাষ্য রয়েছে সেগুলোকে হারাম মানতে অস্বীকার করল সেও কাফের হয়ে যাবে; কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপকারী। কিন্তু যদি সে নও মুসলিম হয়, আর এ গুলোর কোনো কিছুকে অজ্ঞতার কারণে অস্বীকার করে বসে, তবে যতক্ষণ না সেটা জানবে ততক্ষণ কাফের হবে না। তবে যদি জানার পর অস্বীকার করে তবে সেও কাফের হয়ে যাবে।

৪র্থ প্রকার: আল্লাহ তা‘আলা অথবা তাঁর দ্বীন অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ٦٥ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْۚ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

‘আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন, ‘আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে’? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছ।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬৫-৬৬}

আর আয়াতে বর্ণিত ‘ইস্তেহযা’ বা বিদ্রূপ করার অর্থ হচ্ছে, ঠাট্টা করা, ব্যঙ্গ করা। এটা আল্লাহ, তাঁর দ্বীন ও রাসূলের সাথে বড় ধরণের অপমানজনক কাজ ও বড় ধরণের অপদস্থ ও অসম্মান প্রকাশ। মহান আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

৫ম প্রকার : আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর দ্বীন ও তাঁর রাসূলকে গালি দেয়া

গালি দ্বারা উদ্দেশ্য, দোষ-ত্রুটি তালাশ করা, ভুল বের করে বেড়ানো এবং এমনভাবে উল্লেখ করা যা দ্বারা তাদের অপমান, খাটো করা অথবা সম্মানহানি ইত্যাদি বুঝায়; যথা- লা‘নত দেওয়া কিংবা তাদের খারাপ ভাষায় কথা বলা ও খারাপ গুণে গুণান্বিত করা ইত্যাদি।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূলকে গালি দেবে করে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে; প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সার্বিকভাবে সে কাফের। চাই সে গালি দেয়াকে হালাল মনে করুক বা হারাম মনে করুক অথবা বিশ্বাসের কথাটি ভুলে শৈথিল্য প্রদর্শন করেই বলুক।... আর আমাদের আলেমগণ আরও বলেন, যদি ওই কথা কেউ ঠাট্টা করে অথবা ঐকান্তিকভাবে বলে, সর্বাবস্থায় সে কাফির হয়ে যাবে। আর এটাই হচ্ছে সঠিক ও অকাট্য কথা।

ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াই থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: ‘সকল মুসলিমের এ বিষয়ে ইজমা‘ তথা

ঐকমত্য যে, যে কেউ আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলকে গালি দেবে অথবা আল্লাহ তা‘আলা যা নাযিল করেছেন তার সামান্যতম অংশকেও প্রতিহত করতে চাইবে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। যদিও সে আল্লাহ যা নাযিল করেছে তা স্বীকারকারী বলে মুখে দাবি করে থাকুক।’

শাইখুল ইসলাম আরও বলেন, ‘অন্যান্য নবীকে গালি দেওয়ার বিধান আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়ার বিধানের মতই। তাই যদি কেউ কুরআনে যাদেরকে নবী হিসেবে নাম নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে গালি দেয়, অথবা যাদের নবুওয়তের বিষয়টি প্রসিদ্ধ হয় যেমন রাসূলের হাদীসে তাদের উল্লেখ এসেছে যে একজন নবী এমন করেছেন অথবা এমন বলেছেন এটা শুনে কেউ যদি তাঁকে নবী জানার পরও গালি দেয় তবে সেও ওই হুকুমের অন্তর্গত। অর্থাৎ কাফের হয়ে যাবে।

তবে নবীগণ ব্যতীত অন্যদের গালি দেওয়া: যদি এ গালি দ্বারা রাসূলকেই গালি দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, যেমন কেউ রাসূলের সাহাবীগণকে গালি দিল, যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাটো করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেও

কাফির হিসেবে ধর্তব্য হবে। কারণ রাসূলের সাথে থাকার কারণেই তাদেরকে গালি দেওয়া হচ্ছে।

এর উদাহরণ হচ্ছে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচার ইত্যাদির অপবাদ দেওয়া (নাউযু বিল্লাহ)। এর মাধ্যমে এ ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে; কারণ এর দ্বারা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান ও তাকে গালি দেওয়া হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ﴾ [النور: ٢٦]

‘দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৬}

৬ষ্ঠ প্রকার: আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার-ফয়সালা করা; এ বিশ্বাসে যে, এটি বেশি বাস্তব এবং মানুষের জন্য আল্লাহর আইন থেকে অধিক কল্যাণকর

* সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে সেটাকে বেশি বাস্তব এবং মানুষের জন্য আল্লাহর আইন থেকে অধিক কল্যাণকর বিশ্বাস পোষণ করে

বিচার ফয়সালা করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]

'যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফির।' {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৪৪}

* তদ্রুপ কেউ যদি মনে করে গায়রুল্লাহর (মানুষের) ফয়সালা আল্লাহর ফায়সালা থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা মনে করে যে, মানুষের ফয়সালা আল্লাহর ফয়সালার সমান অথবা সে মনে করল যে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা বিচার-ফয়সালা দেওয়া জায়েয; এসব অবস্থায়ও সে কাফির হবে; যদিও সে ঐ বিচার না করে। কারণ, এর মাধ্যমে সে আল্লাহর বাণীতে মিথ্যারোপ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]

'আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?' {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৫০}

৭ম প্রকার: মুনাফিকী

অর্থাৎ অন্তরে কুফরী গোপন রেখে মানুষের সম্মুখে কথা ও কাজে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ١٤٥ ﴾ [النساء: ١٤٥]

‘নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের তলদেশে থাকবে। আপনি তাদের কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৫}

এই দল (মুনাফিকরা) পূর্বের দল হতে নিকৃষ্টতম। সুতরাং এদের শাস্তি কাফিরদের থেকেও বেশি হবে। তারা জাহান্নামের নিম্নতম স্থানে অবস্থান করবে। কেননা এরা কুফরী, ধোঁকাবাজী এবং আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে ঠাট্টা করাসহ বিবিধ পাপে জড়িত।

* আল্লাহ তা‘আলা এদের প্রসঙ্গে বলেছেন :

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ

بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ ١٣ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤ ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ١٥﴾
[البقرة: ٨، ١٥]

‘মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর শেষ দিবসের ওপর, বাস্তবে তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে ও মুমিনগণকে ধোঁকা দেয়। বস্তুত তারা নিজেদের ধোঁকা দেয় কিন্তু তারা তা বুঝে না। তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে। আর আল্লাহ তাদের রোগ বৃদ্ধি করে দেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদের মিথ্যা বলার কারণে। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা জমিনে ফেৎনা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা মীমাংসাকারী। জেনে রাখ! তারাই প্রকৃত ফেৎনা সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বুঝে না। আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা সে রকম ঈমান আন, যেভাবে অন্য লোকজন ঈমান এনেছে। তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব বোকাদের মত? মনে রেখ, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা কিন্তু তারা তা বোঝে না। আর তারা যখন ঈমানদারদের সঙ্গে সাক্ষাত করে তখন বলে,

আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। আমরা তো মুসলিমদের সঙ্গে শুধু উপহাস করছি। বরং আল্লাহই তাদের সঙ্গে উপহাস করেন আর তাদের অবকাশ দেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান পেরেশান থাকে।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮-১৫}

মুনাফিকদের অনেকগুলি আলামত বা নিদর্শন আছে:

- **আল্লাহর যা নাযিল করেছেন তাতে সন্দেহ করা, যদিও সে নিজেকে ঈমানদার বলে প্রকাশ করে।** যেমন,

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱرۡتَابَتۡ قُلُوبُهُمۡ فَهُمۡ فِي رَيۡبِهِمۡ يَتَرَدَّدُونَ ٤٥ ﴾ [التوبة: ٤٥]

'নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায় যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহ বাতিক হয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্দেহের অবর্তে তারা ঘুরপাক খাচ্ছে।' {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৪৫}

- **আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান অপছন্দ করা।** যেমন,

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ٦١ ﴾ [النساء: ٦٠، ٦١]

‘আপনি কি তাদের দেখেন নি যারা দাবি করে যে, তারা আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তীদের ওপর অবতীর্ণ বিষয়ে ঈমান এনেছে, তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ত্বাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায় (মীমাংসার জন্য)। অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা যেন ত্বাগুতকে অমান্য করে। আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় বহু দূর নিয়ে যেতে চায়। আর যখন আপনি তাদের বলেন, যা আল্লাহ নাযিল করেছে এবং তিনি যা রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন সে দিকে আস, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে যাচ্ছে।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০-৬১}

- **ইসলামের বিজয় এবং মুসলিমদের সাহায্য করাকে অপছন্দ করা এবং মুসলিমদের অপমান-লাঞ্ছনায় খুশি হওয়া।** যেমন,

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِن تُصِبۡكَ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡۖ وَإِن تُصِبۡكَ مُصِيبَةٞ يَقُولُواْ قَدۡ أَخَذۡنَآ أَمۡرَنَا مِن قَبۡلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمۡ فَرِحُونَ ٥٠ ﴾ [التوبة: ٥٠]

‘আপনাকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করলে তাদের তা মন্দ লাগে, পক্ষান্তরে আপনার কোনো বিপদ এলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং তারা উল্লাসিত মনে ফিরে যায়।’ {সূরা আত-তওবা, আয়াত: ৫০}

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ قُلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٩ إِن تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡ وَإِن تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٞ يَفۡرَحُواْ بِهَاۖ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٞ ١٢٠ ﴾ [آل عمران: ١١٩، ١٢٠]

‘যখন তারা তোমাদের সঙ্গে মিশে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয় তখন তোমাদের ওপর আক্রোশবশত আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা

নিজ আক্রোশেই মরতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের কথা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তোমাদের যদি কোনো কল্যাণ হয়, তাহলে তাদের মন্দ লাগে আর তোমাদের যদি কোনো অকল্যাণ হয়, তাহলে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সবই আল্লাহর আয়ত্বে রয়েছে।' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৯-১২০}

- **মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ও ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা এবং মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য তৈরী করা এবং এটা করতে পছন্দ করা।** যেমন,

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ وَفِيكُمۡ سَمَّٰعُونَ لَهُمۡ﴾ [التوبة: ٤٧]

'যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে তোমাদের মধ্যে ফাসাদই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করত, তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অনুসন্ধানে। আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের কথা অধিক শ্রবণকারী।' {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৪৭}

- **ইসলামের দুশমন ও কাফের নেতৃবৃন্দকে ভালোবাসা, তাদের প্রশংসা করা এবং তাদের ইসলাম বিরোধী মতাদর্শ প্রচার-প্রসার করা।** যেমন,

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ۞أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مَّا هُم مِّنكُمۡ وَلَا مِنۡهُمۡ وَيَحۡلِفُونَ عَلَى ٱلۡكَذِبِ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤ ﴾ [المجادلة: ١٤]

'আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি যারা আল্লাহর গজবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তারা মুসলিমদের দলভুক্ত নয় অনুরূপভাবে তারা তাদেরও দলভুক্ত নয়; আর তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে।' {সূরা আল-মুজাদালাহ্, আয়াত: ১৪}

- **মুমিনদের নিয়ে টিপ্পনী কাটা, তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে দোষ খুঁজে বেড়ানো।** যেমন,

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٩ ﴾ [التوبة: ٧٩]

'মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ

করে। অতঃপর তারা তাদের নিয়ে উপহাস করে, আল্লাহ্ তাদেরকে নিয়ে উপহাস করেন; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৭৯}

অর্থাৎ যারা অধিক ইবাদত করতে তাদেরকে মুনাফিকরা রিয়াকারী বা প্রদর্শনকারী বলত। আর যারা অক্ষম ছিল তাদেরকে শৈথিল্যকারী বলে দোষ দিত।

- **ঘৃণা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুমিনদের ডাকে সাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকা।** যেমন,

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ ٥ ﴾ [المنافقون: ٥]

'যখন তাদের বলা হয় তোমরা এসো! আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর আপনি তাদের দেখবেন তারা দম্ভভরে ফিরে যায়।' {সূরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত: ৫}

- **সালাতকে ভারী মনে করা ও তা থেকে অলসতা।** যেমন,

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا ١٤٢ ﴾ [النساء: ١٤٢]

‘অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সঙ্গে। বস্তুত তারা নিজেরা নিজেদের প্রতারিত করে। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়; আর তারা আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪২}

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ»

‘মুনাফিকদের পক্ষে ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করা বড় কঠিন।’[308]

- **আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এমন মুমিনদের কষ্ট দেওয়া।**

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمِنۡهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلنَّبِيَّ﴾ [التوبة: ٦١]

---

৩০৮ বুখারী: ৬৫৭; মুসলিম: ৬৫১।

‘আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয়।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬১}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٥٧ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٥٨﴾ [الاحزاب: ٥٧، ٥٨]

‘নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত করেন আর তাদের জন্য রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। আর যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহণ করে।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৭-৫৮}

- এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুনাফিকের নিদর্শনাবলী আলোচিত হলো, আমরা এগুলো উল্লেখ করেছি; যাতে এগুলো থেকে সাবধান করা যায় এবং এ পথের পথিক হওয়া থেকে নিজের অন্তরকে পবিত্র রাখা যায়।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিফাক থেকে আপনার কাছে আশ্রয় দিন। আমাদেরকে যেরূপ ঈমান থাকলে আপনি সন্তুষ্ট হোন সেরূপ ঈমান নসীব করুন।

হে সৃষ্টিকুলের রব! আপনি আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দিন।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের ওপর।

সপ্তবিংশ আসর

জাহান্নামে প্রবেশের আরো কিছু কারণ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আপন ক্ষমতায় সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে নিজ বিস্ময়কর প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর নিদর্শনাবলি দ্বারা নিজ এককত্বের সপ্রমাণতা তুলে ধরেছেন। অপরাধীর জন্য তাঁর বিরুদ্ধাচারণের শাস্তির ফয়সালা করেছেন। অতঃপর তাওবার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তার তাওবা কবুলের মাধ্যমে তার প্রতি বদান্যতা দেখিয়েছেন। অতএব আল্লাহর আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর জান্নাতের প্রতি প্রতিযোগী হও। তিনি তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে নিজ দয়া থেকে দ্বিগুণ অংশ দেবেন।

আমি তাঁর প্রশংসা করি তাঁর মহান গুণাবলির এবং পূর্ণতর বিশেষণসমূহের। আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তাঁর তাওফীক দান এবং তাঁর পর্যাপ্ত নেয়ামতরাজির জন্য।

আর আমি সাক্ষ্য দেই যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তাঁর ইবাদত কিংবা প্রতিপালনে কোনো শরীক

নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা এবং রাসূল। যিনি নিখিল সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন; মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদদাতা হিসেবে এবং কাফেরদের তাঁর জাহান্নাম ও শাস্তি থেকে সতর্ককারী হিসেবে। আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর উম্মতের মধ্যে তাঁর খলীফা আবূ বকরের ওপর, কাফেরদের প্রতি দৃঢ়তা ও শক্তিমত্ততায় বিখ্যাত উমরের ওপর, নিজ দায়িত্ব পালনে মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী উসমানের ওপর, তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলীর ওপর এবং রাসূলের সকল পরিবার-পরিজন, সাহাবী ও আদর্শের অনুসারীর ওপর।

- **মুসলিম ভাইগণ! পূর্ব আসরে** প্রথম প্রকার জাহান্নামী যারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি।

  এ আসরে আল্লাহর তাওফীকে আমরা দ্বিতীয় প্রকার জাহান্নামীদের কয়েকটি কারণ আলোচনা করব।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ সব কারণ, কেউ সেগুলো করলে সাময়িকভাবে জাহান্নামী হয়ে থাকে। তন্মধ্যে:

১ম কারণ: মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।

অবাধ্য হওয়া অর্থ, তাদের সঙ্গে অপরিহার্য সদ্ব্যবহার ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেষ লঙ্ঘন করা বা কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা। যেমন,

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

‘আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, ‘হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।’ {সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৪}

* অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ﴾ [لقمان: ١٤]

‘আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।’ {লুকমান: ১৪}

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَالْعَاقُّ لوالديه وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ.

‘তিন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। ১ম: মদ পানে আসক্ত ২য়: পিতা-মাতার নাফরমান সন্তান ও ৩য়: দায়্যুস যে, নিজ পরিবারের অশ্লীলতা সমর্থন করে।’[309]

২য় কারণ: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য, কোনো লোক কর্তৃক তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঘটানো; ফলে সে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য শারিরীক ও আর্থিক অধিকার প্রদান করা থেকে বিরত থাকে।

---

[৩০৯] আহমাদ ২/৬৯; নাসাঈ ৫/৮০।

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে জুবাইর ইবন মুত‘ইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ».

(আত্মীয়তার সম্পর্ক) ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’[310] সুফিয়ান রাহেমাহুল্লহ বলেন: ছিন্নকারী অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

* অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিমে আরও এসেছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যখন আল্লাহ তা‘আলা সকল সৃষ্টিকুলকে অস্তিত্বে আনলেন, তখন ‘রাহেম’ তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আল্লাহকে বলল,

«هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهْوَ لَكِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}

---

[৩১০] বুখারী: ৫৯৮৪; মুসলিম: ২৫৫৬।

‘আমাকে বিচ্ছিন্ন করা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার স্থান (সময়) এটা। আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, তবে তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখব এবং তোমাকে যে ছিন্ন করবে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব? শুনে আত্মীয় বলল, অবশ্যই। তখন আল্লাহ বললেন, তোমার জন্য এরূপই করা হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইচ্ছা করলে তোমরা এ আয়াতটি পড়তে পারো:

﴿ فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمۡ وَأَعۡمَىٰٓ أَبۡصَٰرَهُمۡ ٢٣ ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣]

‘ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন করেন।’ {সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২-২৩}[311]

আফসোসের বিষয়, কোনো কোনো মুসলিম আজ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে একেবারেই গাফেল।

---

৩১১ বুখারী: ৪৮৩০; মুসলিম: ২৫৫৪।

তারা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলনের সেতুবন্ধনকে ছিন্ন করে চলছে।

তাদের কারও কারও বক্তব্য হচ্ছে, আত্মীয়রাই সম্পর্ক বজায় রাখছেন না। কিন্তু এ বক্তব্য তাদের কোনো উপকারে আসবে না। কারণ, যে সম্পর্ক ঠিক রাখবে, শুধু তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে-এ যদি নীতি হয়, তাহলে তা আল্লাহর জন্য হলো না; বরং বদলা স্বরূপ। যেমন,

* ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

‘সে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী বলে গণ্য হবে না যে শুধু বদলাস্বরূপ সম্পর্ক বজায় রাখে; বরং সেই সম্পর্ক স্থাপনকারী যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও জুড়ে দেয়।’[312]

---

৩১২ বুখারী: ৫৯৯১।

* অনুরূপভাবে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِى وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ. فَقَالَ « لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ».

‘আমার কিছু আত্মীয় এমন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক যতই জুড়ি, ততই তারা ছিন্ন করে, যতই সৎ ব্যবহার করি, তারা দুর্ব্যবহার করে, সহনশীলতা অবলম্বন করলেও তারা বুঝতে চায় না; তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি ব্যাপার এমনই হয়, যেমন তুমি বললে, তাহলে তুমি যেন তাদের প্রতি গরম বালু নিক্ষেপ করলে, (যেন তুমি তাদেরকে তা-ই খাইয়েছ) আর তুমি যেভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে চলছ, তা যদি অব্যাহত রাখতে পার, তাহলে আল্লাহ সর্বদা তোমার সাহায্যকারী থাকবেন।’[313]

---

[৩১৩] মুসলিম: ২৫৫৮।

বান্দা যখন সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে, তখন তার পরিণাম প্রশংসনীয় হবে এবং শীঘ্রই এমন ফল হবে যে, তারা নিজেরাই এসে সম্পর্ক স্থাপন করবে; যেমনটি সে সম্পর্ক তৈরী করেছে; যদি আল্লাহ তাদের কল্যাণ চান।

৩য় কারণ: সুদ খাওয়া।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٣٢ ﴾ [ال عمران: ١٣٠، ١٣٢]

'হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার। তোমরা সে আগুনকে ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের ওপর রহম করা হয়।' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩০-১৩২}

আল্লাহর পক্ষ হতে উপদেশ ও সতর্কপাণী পৌঁছার পরও যে সুদে লিপ্ত, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য স্থায়ী জাহান্নামের ধমক দিচ্ছেন।

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ ﴾
[البقرة: ٢٧٥]

'যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হবে ওই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করেছে। তাদের এ অবস্থার কারণ হলো: তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত রয়েছে, তাহলে পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা (মূলধন) তারই থাকবে, আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করে, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫}

৪র্থ কারণ: ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠﴾ [النساء: ١٠]

‘নিশ্চয় যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ (গ্রাস) করে তারা নিজেদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করে, অচিরেই তারা প্রজ্জলিত আগুনে প্রবেশ করবে।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০}

ইয়াতীম: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে তাকে শরীয়তের পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয়।

৫ম কারণ: মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।

* আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ».

‘মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার পা স্বস্থান হতে ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বে না যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত করবেন।’[314]

মিথ্যা সাক্ষ্য বলা হয়, অজানা বা বাস্তবের বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করাকে। কারণ সাক্ষ্যদাতার জন্য জানা বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর সাক্ষ্য প্রদান বৈধ নয়।

* হাদীসে রয়েছে:

‘জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি সূর্য দেখেছ? সে বলল হ্যাঁ, তখন তিনি তাকে বললেন, এ ধরনের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে; নতুবা বিরত থাকবে।’[315]

৬ষ্ঠ কারণ: বিচার-ফয়সালায় ঘুষ।

* ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ.

---

৩১৪ ইবন মাজাহ: ২২৭৩; মুস্তাদরাকে হাকেম: ৪/৯৮। হাদিসটি বানোয়াট।

৩১৫ কাশফুল খাফা: ২/৭১। তবে এর সনদ দুর্বল।

‘ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামে যাবে।’[316]

হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করছেন। তার বর্ণনাকারীরা সবাই গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ। যেমটি তারগীব ওয়াত তারহীবে এসেছে।

নিহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘হাদীসে বর্ণিত ‘রা-শী’ অর্থ ঘুষদাতা আর ‘মুরতাশী’ অর্থ ঘুষগ্রহীতা।

তবে ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি বা জুলুম থেকে রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে কিছু প্রদান করতে হলে, তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।’[317]

৭ম কারণ: মিথ্যা শপথ করা।

* হারেস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজে (মিনার পাথর মারার স্থান) দু’জামরার মধ্যবর্তী স্থানে বলতে শুনেছি,

«مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا».

[৩১৬] তাবারানী ফিস সাগীর, ১/২৮। দুর্বল সনদে।

[৩১৭] আন-নিহায়া ফী গারীবিল আসার, ইবনুল আসীর কৃত ২/২২৬।

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্পদ মিথ্যা শপথের দ্বারা ছিনিয়ে নেয়, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়। কথাটি উপস্থিত সকলেই তোমাদের অনুপস্থিতদের বলে দেবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই বাণীটি দু'বার অথবা তিনবার বলেছেন।'[318]

আর শপথকে 'গামূস' বলার কারণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ ধরনের শপথ করবে তাকে তা গুনাহে ডুবিয়ে দেয়, তারপর তাকে জাহান্নামে ডুবায়।

মিথ্যা শপথ করে কোনো দাবীকৃত বস্তুর ফয়সালা নিজের পক্ষে নিয়ে আসা, অথবা মিথ্যা শপথ করে অস্বীকারকৃত বস্তু থেকে তার দায়মুক্তির ঘোষণা আদায় করা উভয়টিই গুনাহের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই।

৮ম কারণ: মানুষের মধ্যে না জেনে বিচার করা অথবা যুলুম ও পক্ষপাতিত্ব করে বিচার করা।

* বুরাইদা ইবনুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[৩১৮] আহমাদ ৫/৭৯; মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/২৯৪, ২৯৫ নং ৫১৬৫।

« الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ ».

'বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার জান্নাতে যাবে এবং দুই প্রকার যাবে জাহান্নামে। যে জান্নাতে যাবে সে হলো, যে বিচারক সত্য উদ্ঘাটন করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। আর যে ব্যক্তি সত্য জেনেও অন্যায় বিচার করে সে জাহান্নামী। আরেকজন মানুষের বিচার করে না জেনেই, সেও আগুনে যাবে।'[319]

৯ম কারণ: প্রজাদের ধোঁকা দেয়া এবং তাদের কল্যাণ কামনা না করা।

অর্থাৎ এমনভাবে রাষ্ট্র বা বিচারকার্য পরিচালনা করা, যাতে জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না এবং কাজটিও অনুপকারী হয়। কারণ,

[৩১৯] আবু দাউদ: ৩৫৭৩; তিরমিযী: ১৩২২; ইবন মাজাহ: ২৩১৫।

* মা‘কাল ইবন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ».

‘যাকে আল্লাহ জনগণের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, যদি প্রজাদের ধোঁকা দেয়া অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।’[320]

এ হাদীসটি ব্যাপক অর্থবোধক। এটা গৃহকর্তা কর্তৃক তার পরিবার পরিচালনা এবং শাসক কর্তৃক তার রাষ্ট্র পরিচালনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ,

* ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ

---

৩২০ বুখারী: ৭১৫০; মুসলিম: ১৪২।

وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

‘মনে রেখো তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক, তোমাদের প্রত্যেককে আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে, শাসক রক্ষক, অতএব তাকে তার প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, গৃহকর্তা তার পরিবারের অভিভাবক, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল, অতএব তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ হিসাব দিতে হবে, খাদেম তার মনিবের সম্পদের হিফাযতকারী, কাজেই সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, অতএব তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।’[321]

১০ম কারণ: প্রাণীর মূর্তি তৈরি করা।

অর্থাৎ যে সকল সৃষ্টির প্রাণ তথা রূহ আছে, যেমন-মানুষ, জীব-জন্তু উত্যাদি। এ সকল প্রাণীর মূর্তি তৈরি বা চিত্রাঙ্কন করা। কারণ,

[৩২১] বুখারী: ৭১৩৮; মুসলিম: ১৮২৯।

* ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ»

'প্রত্যেক অঙ্কনকারী জাহান্নামী, তার তৈরিকৃত বা অঙ্কিত প্রত্যেকটির আত্মা তার দেহে প্রবিষ্ট করে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।'[322]

* বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে:

«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا»

'যে ব্যক্তি কোনো চিত্রাঙ্কন বা মূর্তি তৈরি করবে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে ততক্ষণ শাস্তি প্রদান করতে থাকবেন, যতক্ষণ সে মুর্তি বা চিত্রে আত্মা সঞ্চার না করবে। অথচ সে কখনও তাতে আত্মা সঞ্চারে সক্ষম হবে না।'[323]

তবে ফল, বৃক্ষ, লতা-পাতা উদ্ভিদ ইত্যাদি যার বাড়ন্ত শরীর আছে কিন্তু প্রাণ নেই, এ ধরনের সৃষ্টির চিত্র আঁকতে কোনো

---

৩২২ মুসলিম: ২১১০।

৩২৩ বুখারী: ২২২৫।

অসুবিধা নেই। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ মত পোষণ করেন।

* অবশ্য কিছু সংখ্যক আলেম সহীহ বুখারীর হাদীসের ব্যাপকতার কারণে তাও নিষেধ করেছেন। হাদীসটি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً»

‘তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করতে চায়। সে একটি যব বা শষ্যদানা বা বিন্দু পরিমাণ একটা কিছু সৃষ্টি করে দেখায় না কেন?’[324]

১১তম কারণ: কঠোরত, কৃপণতা ও অহঙ্কার।

* হারেস ইবন ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ»

---

[৩২৪] বুখারী: ৫৯৫৩; মুসলিম: ২১১১।

‘আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তারা হচ্ছে প্রত্যেক কঠোরতাকারী, সম্পদ সঞ্চয়কারী কৃপণ ও অহংকারী।’[325]

(উতুল্ল) বলা হয় অত্যধিক কঠিন ব্যক্তি, যার হৃদয় সত্য গ্রহণ বা মানুষের জন্য বিগলিত হয় না।

(জাওয়ায) বলা, হয়, লোভী ও কৃপণকে। অর্থাৎ সে সম্পদ গচ্ছিত ও সঞ্চয়কারী এবং সম্পদ বিতরণে বাধা প্রদানকারী।

(মুস্তাকবির) যে অহঙ্কারবশত সত্যকে উপেক্ষা করে এবং মানুষের জন্য বিনম্র হয় না, যে নিজেকে মানুষ থেকে উঁচু ও বড় মনে করে এবং তার মতকে বাস্তবের বিপরীত হলেও সঠিক মনে করে।

১২ তম কারণ: পানাহারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্বর্ণ-রৌপ্যে পাত্র ব্যবহার করা।

* বুখারী ও মুসলিমে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

৩২৫ বুখারী: ৪৯১৮; মুসলিম: ২৮৫৩।

‘যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, মূলত সে নিজ পেটে আগুন ভর্তি করে।’[326]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে:

«إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» .

‘যে স্বর্ণ-রূপার পাত্রে খায় বা পান করে, সে মূলত স্বীয় পেটে জাহান্নামের আগুনই ভরে।’[327]

* ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের আংটি দেখে তা খুলে নিক্ষেপ করে বললেন:

«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»

‘তোমাদের কেউ কি করে আগুনের অঙ্গারের ইচ্ছা করে সেটাকে হাতে রেখে দেয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলে তাকে বলা হলো, তোমার আংটিটি গ্রহণ কর এবং এর দ্বারা উপকৃত হও। তিনি বললেন, আল্লাহর

---

৩২৬ বুখারী: ৫৬৩৪; মুসলিম: ২০৬৫।

৩২৭ মুসলিম: ২০৬৫।

শপথ! কখনো নয়, আমি সেটা নেবো না, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেলে দিয়েছেন।'[328]

- **সুতরাং ভাইয়েরা আমার!** আপনারা জাহান্নামে প্রবেশের কারণসমূহ থেকে সাবধান হোন এবং এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করুন যা আপনাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। এর ফলে স্থায়ী জান্নাত পেয়ে ধন্য হবেন। আর জেনে রাখুন! দুনিয়া তুচ্ছ বস্তু মাত্র, যা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

কাজেই স্বীয় রবের দরবারে আজীবন সত্যের ওপর অটল থাকার প্রার্থনা করুন। আরও প্রার্থনা করুন তিনি যেন আপনাদেরকে এমন মুমিন পুরুষ ও নারীদের সাথে হাশর করান যাদের উপর আল্লাহ তার নেয়ামত প্রদান করেছেন।

হে আল্লাহ! নিজ দয়ায় আমাদেরকে হকের ওপর অটল রাখুন এবং তার ওপর মৃত্যু দান করুন। আর আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতা ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন। হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু!

আর আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি সালাত পেশ করুন।

---

[৩২৮] মুসলিম: ২০৯০।

অষ্টাবিংশ আসর

যাকাতুল ফিতর

সকল প্রশংসা মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান, সর্বোচ্চ, মহান আল্লাহর জন্য। তিনি তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপুণভাবে নিরূপণ করেছেন। তিনি তাঁর শরীয়তের বিধানাবলিকে আপন প্রজ্ঞানুযায়ী সুদৃঢ় করেছেন সৃষ্টির জন্য সুস্পষ্ট ও শিক্ষা হিসেবে। আমি তাঁর প্রশংসা করি তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির উপর। আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করি তাঁর পরিপূর্ণ নেয়ামতসমূহের উপর।

আর আমি সাক্ষ্য দেই যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসাও তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূল। আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীবৃন্দ এবং সবার প্রত্যাবর্তন ও ফিরে যাওয়ার দিন পর্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁদের আদর্শের সকল অনুসারীর ওপর।

- **ভাইয়েরা আমার!** সম্মানিত মাস রমযান গত হতে চলেছে, তার সামান্য অংশই বাকী আছে; সুতরাং যে ব্যক্তি এটা যথাযথ মূল্যায়নের সাথে অতিবাহিত করেছে সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে অতঃপর এটা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে। আর যে এটা অলসতায় অতিবাহিত করেছে, সে যেন আল্লাহর নিকট তওবা করে এবং নিজ ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, কারণ মৃত্যুর পূর্বে ওযর পেশ করা গ্রহণযোগ্য হবে।
- **ভাইয়েরা আমার!** নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই মাসের শেষে আপনাদের উপর যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন; আর এটা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ঈদের নামাযের পূর্বেই।

আজকের মজলিসে এ যাকাতুল ফিতর বিষয়ে কথা বলব। এর বিধান, হেকমত, শ্রেণী, পরিমাণ, ওয়াজিব হওয়ার সময়, প্রদানের সময় ও স্থান সম্পর্কে আলোচনা করব।

যাকাতুল ফিতরের বিধান বা হুকুম:

যাকাতুল ফিতর প্রদান করা ফরয। এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুসলিমের উপর অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রাসূল যা ফরয করেছেন অথবা করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন সেগুলোও যা

আল্লাহ ফরয করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন তার হুকুম রাখে। অর্থাৎ তা মানাও অবশ্যম্ভাবী।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠ ﴾ [النساء: ٨٠]

‘যে রাসূলের হুকুম মান্য করল, সে আল্লাহর হুকুমই মান্য করল। আর যে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে তাদের জন্য পর্যবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাই নি।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾ [النساء: ١١٥]

‘যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকে ফিরাবো যে সে ফিরতে চায় এবং আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ٧]

‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।’ {সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭}

আর যাকাতুল ফিতর মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন-কৃতদাস সকলের ওপর ফরয।

* আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ»

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে স্বাধীন, গোলাম, নারী, পুরুষ, ছোট-বড় সকল মুসলিমের ওপর এক সা‘ খেজুর, বা এক সা‘ যব যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন।’[329]

---

৩২৯ বুখারী: ১৫০৩; মুসলিম: ৯৮৪।

* পেটের বাচ্চার পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর দেয়া ওয়াজিব নয়, কিন্তু কেউ যদি আদায় করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কারণ,

* ‘উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু পেটের বাচ্চার পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করতেন।

- ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং যাদের ভরণ-পোষণ তার দায়িত্বে রয়েছে যেমন-স্ত্রী ও এমন নিকটাত্মীয় যাদের নিজেদের ফিতরা নিজেদের দেওয়ার সামর্থ নেই সন্তান তাদের পক্ষ থেকেও আদায় করা **আবশ্যক**। আর যদি তারা নিজেদের ফিতরা নিজেরা দেওয়ার সামর্থ রাখে তবে নিজেদের যাকাতুল ফিতর নিজেরাই আদায় করা উত্তম। কারণ ওয়াজিব হওয়ার সম্বোধন তাদেরকেই মৌলিকভাবে করা হয়েছে।
- আর যাকাতুল ফিতর কেবল তাদের উপরই **আবশ্যক** যার ঈদের দিন ও রাত্রের খরচ সম্পাদনের পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকবে। যদি এক সা‘ এর চেয়ে কম পরিমাণ সম্পদও কারও অতিরিক্ত থাকে তবে তাকে তা-ই যাকাতুল ফিতর হিসেবে প্রদান করতে হবে। কারণ,

* আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾ [التغابن: ١٦]

‘তোমরা সাধ্য অনুপাতে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।’ {সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬}

* অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«َإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

‘আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে আদেশ করি, তোমরা তখন তা সাধ্যানুযায়ী পালন করো।’[330]

যাকাতুল ফিতর প্রবর্তনের হিকমত বা রহস্য:

বস্তুত: যাকাতুল ফিতরের হিকমত অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ:

- এর দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়; যাতে তারা ঈদের দিনে ভিক্ষা করা থেকে বিরত থেকে ঈদের দিনগুলোতে ধনীদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে; ফলে ঈদ হবে সার্বজনীন। তাছাড়া এর মধ্যে বদান্যতা ও সহমর্মিতার মত মহৎ চরিত্র দ্বারা গুণান্বিত হওয়া যায়। চওয়ার প্রয়োজন না হয়

[৩৩০] বুখারী: ৭২৮৮; মুসলিম: ১৩৩৭।

- সিয়াম পালনকারীর সিয়ামে যে শৈথিল্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ব গুনাহ হয়ে থাকে, এর মাধ্যমে সিয়াম পালনকারীকে তা থেকে পবিত্র করা যায়।
- যাকাতুল ফিতর আদায়ের দ্বারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। তিনি নিজ দয়ায় বান্দাকে পূর্ণ একমাস সিয়াম পালনের তাওফীক দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে কিয়ামেরও সুযোগ দিয়েছেন এবং এর মধ্যে যতটুকু সম্ভব কিছু সৎ কাজেরও সুযোগ দিয়েছেন।

* আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন অনর্থক ও অশ্লীল কথা-বার্তা দ্বারা সিয়ামের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তা থেকে পবিত্র করা এবং মিসকীনদের খাদ্য প্রদানের জন্য। ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করলে তা যাকাতুল ফিতর হিসাবে গণ্য হবে। আর ঈদের সালাতের পর আদায় করলে তা অন্যান্য সাধারণ দানের মত একটি দান হবে।’[331]

---

৩৩১ আবু দাউদ: ১৬০৯; ইবন মাজাহ: ১৮২৭; মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৪০৯।

যাকাতুল ফিতরের শ্রেণী বিভাগ:

মানুষের সাধারণ খাদ্য জাতীয় বস্তু; যেমন-খেজুর, আটা, চাল, কিসমিস, পনির ইত্যাদি। অথবা এর বাইরে সাধারণত যা মানুষের খাদ্য হিসেবে পরিগণিত তাও দেওয়া যাবে।

* বুখারী ও মুসলিমে ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ »

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন, খেজুর অথবা যব থেকে এক সা' পরিমাণ।'[332]

আর ওই যুগে তাদের খাদ্য ছিলো যব।' যেমন,

* আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ»

[৩৩২] বুখারী: ১৫০৩।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় আমরা যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম এক সা' খাদ্য দ্বারা। তখন আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিসমিস, পনির এবং খেজুর।'[333]

- **অতএব, পশুর খাদ্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করলে, আদায় হবে না।** কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসকীনদের খাদ্যদ্রব্য হিসেবে যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন জীব-জন্তুর খাদ্য হিসেবে নয়।
- **তাছাড়া কাপড়, বিছানা-কার্পেট, পানপাত্র, খাদ্য-রসদ ইত্যাদি যা মানুষের খাদ্য বলে বিবেচিত নয় তা দ্বারা দিলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না।** কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য দ্বারা দেওয়া ফরয করেছেন সুতরাং রাসূল যেটা নির্ধারণ করেছেন সেটা অতিক্রম করা যাবে না।
- **অনুরূপ খাদ্যের মূল্য পরিশোধের মাধ্যমেও আদায় করা যাবে না।** কারণ,

- তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আদেশের বিপরীত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

---

৩৩৩ বুখারী: ১৫০৮; মুসলিম: ৯৮৫।

‘যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের কোনো আদেশ নেই, তা অগ্রহণযোগ্য।’[334] অপর বর্ণনায় এসেছে:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»

‘যে আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু আবিষ্কার করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।’ এটি ইমাম মুসলিম সংকলন করেছেন। তবে এর মূল কথা বুখারী-মুসলিম উভয়টিতেই রয়েছে।’[335]

- **তাছাড়া** খাদ্যমূল্য প্রদান সাহাবীগণের আমলের পরিপন্থী। কারণ, তারা খাদ্যজাতীয় বস্তু দ্বারাই যাকাতুল ফিতর আদায় করতেন।

* আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ من بعدي»

‘তোমরা অপরিহার্যভাবে আমার সুন্নাতকে আকড়ে ধরো এবং আমার পরবর্তীতে সঠিক পথে পরিচালিত ও হিদায়াতের ওপর

---

৩৩৪ বুখারী: ৭৩৫০।

৩৩৫ বুখারী: ২৬৯৭; মুসলিম: ১৭১৮।

প্রতিষ্ঠিত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত বা আদর্শ অনুসরণ করে চলো।’[336]

- **তাছাড়া** যাকাতুল ফিতর সুনির্দিষ্ট প্রকার নির্ধারণ করে-দেওয়া ইবাদত। বিধায় তা সুনির্দিষ্ট বস্তুর বাইরে অন্য কিছু দ্বারা আদায় করলে গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমনিভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের পরে বের করলে তা যথেষ্ট হয় না।
- **তাছাড়া** রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য দ্বারা নির্ধারণ করেছেন, আর সে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সমান নয়। সুতরাং মূল্যই যদি ধর্তব্য হয়, তাহলে নির্দিষ্ট কোনো এক প্রকারের এক সা‘ পরিমাণ নির্ধারিত হতো এবং অন্যান্য প্রকার থেকে একই মূল্যের সমান নির্ধারিত হতো।
- **আর** মূল্য প্রদান করলে যাকাতুল ফিতর প্রকাশ্য ইবাদাত থেকে পরিণত হয় গোপন ইবাদতে। যেহেতু এক সা‘ খাদ্য প্রদান করলে তা মুসলিমদের মাঝে প্রকাশ্য হয়, ছোট-বড় সকলেই তা জানতে পারে, স্বচক্ষে তার পরিমাপ ও বণ্টন দেখে এবং তারা পরস্পর তা গ্রহণ করে। কিন্তু মূল্য হলে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে তা গোপনে আদান-প্রদান হয়ে যায়।

যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ:

---

৩৩৬ আহমাদ ৪/১২৬, ১২৭; আবু দাউদ: ৪৬০৭; তিরমিযী: ২৬৭৬; ইবন মাজাহ: ৪২, ৪৩।

যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ হলো: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের এক সা‘। যার ওজন: উন্নত মানের গমের চার শত আশি মিসকাল গম। আর গ্রামের ওজনে **‘দুই কেজি ৪০ গ্রাম’ গম**। যেহেতু এক মিসকাল সমান সোয়া চার গ্রাম, তাই ৪৮০ মিসকাল সমান ২০৪০ গ্রাম।

অতএব রাসূলে যুগের সা‘ জানতে ইচ্ছা করলে, তাকে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম গম ওজন করে এমন পাত্রে রাখতে হবে, যা মুখ পর্যন্ত ভরে যাবে। অতঃপর তা দ্বারা পরিমাপ করতে হবে।

যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়:

ঈদের রাতে সূর্যাস্তের সময় জীবিত থাকলে তাদের ওপর যাকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক; নতুবা নয়।

সুতরাং কেউ সুর্যাস্তের এক মিনিট পূর্বে মারা গেলে তার ওপর ওয়াজিব হবে না।

আর এক মিনিট পরে মারা গেলে অবশ্যই তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে।

যদি কোনো শিশু সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পর ভূমিষ্ট হয়, তার ওপরও আবশ্যক হবে না। তবে আদায় করা সুন্নাত হবে। যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

আর সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পূর্বে ভূমিষ্ট হলে তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে।

যাকাতুল ফিতর আবশ্যক হওয়ার সময় রামযানের শেষ দিনের সূর্যাস্তের পর এজন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তখন থেকে ফিতর তথা খাওয়ার মাধ্যমে রমযানের সিয়াম সমাপ্ত হয়। এ কারণেই একে রমযানের যাকাতুল ফিতর বা সিয়াম ভাঙ্গার যাকাত বলা হয়। এতে বুঝা গেল যে, ফিতর তথা সিয়াম শেষ হওয়ার সময়টাই যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়।

যাকাতুল ফিতর আদায়ের সময়:

যাকাতুল ফিতর আদায়ের দুটি সময় রয়েছে:

১. ফযীলতপূর্ণ সময় ও ২. জায়েয সময়।

- **ফযীলতপূর্ণ সময়:** ঈদের দিন সকালে ঈদের সালাতের পূর্বে। কারণ;

* সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»

‘আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় যাকাতুল ফিতর ঈদুল ফিতরের দিনে এক সা‘ পরিমাণ খাদ্য আদায় করতাম।’[337]

অনুরূপভাবে বুখারীতে ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ঈদের সালাত পড়তে যাওয়ার পূর্বে যাকাতুল ফিতর আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।’[338] অনুরূপভাবে হাদিসটি ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

---

[৩৩৭] বুখারী: ১৫১০।

[৩৩৮] বুখারী: ১৫০৩; মুসলিম: ৯৮৬।

ইবন ‘উয়াইনা স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ‘আমর ইবন দীনারের সূত্রে ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মানুষ ঈদের দিন যাকাতুল ফিতর ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করবে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥ ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]

‘নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর সালাম আদায় করে।’ {সূরা আ‘লা, আয়াত: ১৪-১৫}

সুতরাং ঈদুল ফিতরের সালাত একটু বিলম্ব করে পড়া উত্তম; যাতে মানুষ যাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারে।

- **জায়েয সময়:** ঈদের একদিন দু’দিন পূর্বে যাকাতুল ফিতর আদায় করা।

* সহীহ বুখারীতে নাফে‘ বর্ণনা করেন, ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজের এবং ছেট-বড় সন্তানদের পক্ষ হতেও যাকাতুল ফিতর প্রদান করতেন। এমনকি তিনি আমার সন্তানদের যাকাতুল ফিতরও প্রদান করতেন। তিনি যারা যাকাতুল ফিতর গ্রহণ করত তাদেরকেই প্রদান করতেন। আর

তারা ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে যাকাতুল ফিতর দিতেন।[339]

- **ঈদের সালাতের পর আদায় করা জায়েয নেই**। তাই বিনা কারণে সালাতের পর পর্যন্ত বিলম্ব করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের পরিপন্থী।

* পূর্বে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»

'ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করলে তা যাকাতুল ফিতর হিসাবে গণ্য হবে। আর ঈদের সালাতের পর আদায় করলে তা অন্যান্য সাধারণ দানের মত একটি দান হবে।'[340]

- আর যদি কোনো সঙ্গত কারণবশত বিলম্ব করে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন সে এমন স্থানে আছে যে তার কাছে আদায় করার মত কোনো বস্তু নেই বা এমন কোনো ব্যক্তিও নেই, যে এর হকদার। অথবা হঠাৎ তার কাছে ঈদের সালাতের সংবাদ পৌঁছল যে কারণে সে

---

৩৩৯ বুখারী: ১৫১১।

৩৪০ আবু দাউদ: ১৬০৯; ইবন মাজাহ: ১৮২৭; মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৪০৯।

সালাতের পূর্বে আদায় করার সুযোগ পেল না অথবা সে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছিল, আর সে আদায় করতে ভুলে গেছে। এমতাবস্থায় সালাতের পর আদায় করলে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ সে অপারগ।

ওয়াজিব হচ্ছে, যাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি বা উকিলে মাধ্যমে যথাসময়ে সালাতের পূর্বে পৌঁছানো। যদি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে প্রদানের নিয়ত করে, কিন্তু যাকাতুল ফিতর বের করার সময় তার সঙ্গে বা তার কোনো ওকিল বা প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটে তাহলে অন্য কোনো যাকাতুল ফিতরের উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবে। কোনো ক্রমেই নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করবে না।

যাকাতুল ফিতর প্রদানের স্থান:

যাকাতুল ফিতর প্রদানের সময় ফিতরা প্রদানকারী যে এলাকায় সে অবস্থান করছে সে এলাকার গরীবরাই এর হকদার; সে (ফিতরা প্রদানকারী) উক্ত এলাকার স্থায়ী অধিবাসী হোক বা অস্থায়ী হোক। বিশেষ করে যদি সম্মানিত স্থান হয় যেমন মক্কা বা মদীনা অথবা সেখানকার ফকীররা এর প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী হয় তবে সেখানে বের করাই নির্দিষ্ট। কিন্তু যদি সে এমন এলাকায় থাকে যেখানে কোনো

হকদার না থাকে বা হকদার চেনা অসম্ভব হয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে একজন উকিল নিযুক্ত করবে যে উকিল উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে তার যাকাতুল ফিতর আদায় করে দেবে।

যাকাতুল ফিতরের হকদার:

সদকাতু ফিতরের হকদার হচ্ছে (১) দরিদ্র, (২) ঋণগ্রস্ত, যারা তা আদায়ে অক্ষম। সুতরাং তাদেরকে প্রয়োজন পরিমাণ দেয়া যাবে।

একটি যাকাতুল ফিতর অনেক ফকীরকে দেওয়া জায়েয।

আবার অনেকগুলো যাকাতুল ফিতর এক মিসকীনকেও দেয়া যাবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু তাদের কতটুকু দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করেন নি।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যদি একদল লোক তাদের যাকাতুল ফিতর ওজন করার পর একটি পাত্রে জমা করে, তারপর সেখান থেকে পুনরায় পরিমাপ ছাড়া বণ্টন করে তবে তা আদায় হয়ে যাবে।

কিন্তু ফকীরকে জানিয়ে দেয়া উচিৎ যে, তাকে তারা যা দিচ্ছে তার পরিমাণ তারা জানে না; যাতে করে (ফকীর) নিজে কাউকে দিতে গিয়ে তার পরিমাপ না জেনে ধোঁকায় না পড়ে।

আর ফকীরের জন্য বৈধ, কারো থেকে যাকাতুল ফিতর গ্রহণের পর নিজের পক্ষ থেকে বা পরিবারের অন্য সদস্যদের পক্ষ থেকে পরিমাপ করার পর যাকাতুল ফিতর প্রদান করা। অথবা তা পরিপূর্ণ আছে বলে দাতার কথায় বিশ্বাস করে পরিমাপ ছাড়াই প্রদান করা।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আনুগত্য করার তাওফীক দিন। আমাদের আত্মা, কথা ও কাজ পরিশুদ্ধ করে দিন। আমাদেরকে খারাপ আকীদা-বিশ্বাস, খারাপ কথা ও খারাপ কাজ থেকে পবিত্র করুন। নিশ্চয় আপনি উত্তম দানশীল ও করুণাময়।

হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর সকল পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

ঊনত্রিংশ আসর

তওবা সম্পর্কে

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টিতে আপন এককত্বের ওপর প্রমাণ স্থাপন করেছেন। আপন সৃষ্টিতে যেভাবে চান ইয্যত ও ক্ষমতার হস্তক্ষেপ করেন। মুত্তাকীদের নির্বাচিত করে তাদের ঈমান ও নিরাপত্তা দান করেন। অপরাধীদের আপন সংযম ও করুণায় ক্ষমা ও মার্জনা করেন। তাঁর অবাধ্যদের রিযিক বন্ধ করেন না দয়া ও করুণাবশত। নিষ্ঠাবান মুমিনদেরকে আপন নৈকট্যের মৃদু বায়ূ দ্বারা প্রশান্তি দান করেন এবং হিসাব দিবসে তার মহাবিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন। তাঁর সন্তুষ্টির পথ অবলম্বনকারীকে তিনি নিজ আস্তানায় হেফাযত করেন। মুমিনকে তার অন্তরে ঈমান অঙ্কিত করে সম্মানিত করেন। নিজ সৃষ্টিতে তিনি বিধি-বিধান প্রবর্তন করেন, তাই তাদের জন্য জারী করেন আদেশ-নিষেধ। আপন সহযোগিতায় দাঁড় করান ফলে কেউ সে আদেশ পালন করতে সমর্থ হয় আবার কেউ তাতে অপারগ হয়। যে উদাসীন ও বিস্মৃতপ্রায় তাকে নিজ উপদেশবাণী দিয়ে জাগ্রত করেন। তিনি গুনাহগারকে তার গুনাহ মাফের জন্য

তাওবার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মহান রব; সৃষ্টিজগতে তাঁর কোনো তুলনা নেই। তিনি দয়ালু দাতা; যিনি পানাহারের মুখাপেক্ষী নন। সকল সৃষ্টি সর্বদা তাঁর মুখাপেক্ষী এবং দিবারাত্রি তাঁর করুণার ভিখারী। আমি তাঁর প্রশংসা করি এমন প্রশংসা যা কোনো রবের ইবাদতকারী করে থাকে এবং আর তাঁর কাছে ওযর পেশ করছি নিজ পাপ ও ত্রুটির জন্য।

আর আমি সাক্ষ্য দেই যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই, নিজ মন থেকে একনিষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষ্য। আমি আরও সাক্ষ্য দেই মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে তাঁর দল থেকে বাছাই করা হয়েছে।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর শ্রেষ্ঠতম সঙ্গী আবূ বকরের ওপর, উমরের ওপর যার চলার পথে শয়তান চলত না, উসমান শহীদের ওপর, যিনি যুদ্ধের কাতারে শহীদ হননি, আলীর ওপর যিনি তাঁর যুদ্ধের সাহায্যকারী এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীবৃন্দ ও তাঁর আদর্শের অনুসারীদের ওপর।

- **ভাইয়েরা আমার!** রমযান মাস শেষ করুন, আল্লাহর কাছে গুনাহ থেকে তাওবার মাধ্যমে, তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করে তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে। কেননা, মানুষ গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। প্রত্যেক আদম সন্তান গুনাহ করে তবে সর্বোত্তম পাপী হলো, তাওবাকারী।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণীতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁর কাছে তাওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ ٣ ﴾ [هود: ٣]

'আরো যে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকে ফিরে আস, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের এক উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর মহাদিনের শাস্তির আশংকা করি।' {সূরা হূদ, আয়াত: ৩}

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ فَٱسۡتَقِيمُوٓاْ إِلَيۡهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُۗ ﴾ [فصلت: ٦]

‘(হে মুহাম্মাদ) আপনি বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, তবে আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মা‘বুদ একমাত্র মা‘বুদ। অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।’ {সূরা হা-মীম-সিজদাহ, আয়াত: ৬}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١ ﴾ [النور: ٣١]

‘হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ [التحريم: ٨]

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ

মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।’ {সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮}

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২২}

আর তাওবার বর্ণনায় বহু আয়াত রয়েছে।

হাদীসসমূহ:

* আগার্র ইবন ইয়াসার আল-মুযানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ، فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ، مَرَّةٍ»

‘হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ, আমি প্রতিদিন একশত বার তাওবা করি।’[341]

* আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»

‘আল্লাহর শপথ, অবশ্যই আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাওবা করি ৭০ বারেরও অধিক।’[342]

* আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»

---

[৩৪১] মুসলিম: ২৭০২।

[৩৪২] বুখারী: ৬৩০৭।

‘বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন আল্লাহ ওই ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে বিশাল বিস্তৃত ভূমিতে সফর করছিল, হঠাৎ তার বাহন পালিয়ে গেল, যে বাহনে তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। কোনো উপায় না দেখে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় একটি বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় হঠাৎ বাহনটি তার পাশেই উপস্থিত পেল। সে লাগাম হাতে নিয়ে আনন্দের অতিশয্যে বলে ফেললো, আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দে ভুল বলে ফেলল।’[343]

আল্লাহ সুবহানাহু বান্দার তাওবাতে খুশি হওয়ার কারণ হচ্ছে তিনি তাওবা ও ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। অনুরূপভাবে তিনি এটাও ভালোবাসেন যে বান্দা তার কাছ থেকে পলায়ন করার পর আবার তার কাছে ফিরে আসছে।

* আনাস এবং ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

---

[৩৪৩] মুসলিম: ২৭৪৭।

'বনী আদমের যদি স্বর্ণের একটি উপত্যকা থকে, তাহলে সে তখন দু'টি উপত্যকার কামনা করে। মাটিই একমাত্র তার মুখ ভরতে পারে। আর যে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।'[344]

- **তাওবা:** আল্লাহর নাফরমানী ছেড়ে, তার আনুগত্যে ফিরে আসাকে তাওবা বলে। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই সত্যিকারের মা'বুদ। আর ইবাদতের তাৎপর্য হচ্ছে ভালোবাসা ও সম্মানার্থে মা'বুদ সমীপে বিনয়ী ও অনুগত হওয়া। অতএব, যখনই বান্দার পক্ষ হতে প্রভুর অবাধ্যতা প্রকাশ পাবে, তখন সেটা থেকে তাওবা হচ্ছে, তার কাছে দীন, হীন, ভীত, সন্ত্রস্ত, লজ্জিত ও নত হয়ে তার দরবারে ফিরে আসা ও তার দরজায় দাড়ানো।
- **তাওবা করা ওয়াজিব; তাৎক্ষণিকভাবে**। বিলম্ব করা বা গড়িমসি করা জায়েয নেই। কারণ;

- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে আদেশ করেছেন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ তৎক্ষণাৎ পালনীয়। কারণ, বান্দার জানা নেই বিলম্বে কী পরিণতি হবে। হতে পারে হঠাৎ তার মৃত্যু এসে যাবে, আর তাওবার সুযোগ ঘটবে না।

---

[৩৪৪] বুখারী: ৬৪৩৬; মুসলিম: ১০৪৯।

- তাছাড়া বারবার গুনাহ করা অন্তরকে কঠিন করে দেয়, আল্লাহ হতে দুরে সরিয়ে দেয় ও ঈমানী শক্তি দুর্বল করে দেয়। পক্ষান্তরে আনুগত্য ঈমান বৃদ্ধি করে ও নাফরমানী কমিয়ে দেয়।
- বারংবার গুনাহে লিপ্ততা, ওই গুনাহের প্রতি মুহাব্বত ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। কারণ, নফস কোনো বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা বর্জন করা কঠিন হয়। এ কারণেই আল্লাহর নাফরমানী হতে মুক্ত হওয়া কষ্টকর। তখন শয়তান পূর্বের চেয়ে বড় গুনাহে জড়িয়ে দেয়।

* এজন্য আল্লাহ ওয়ালা আলেমগণ বলেন, 'গুনাহ কুফরীর দূতস্বরূপ।'[345] ক্রমশ গুনাহে জড়িত হতে থাকে, পরিণামে দ্বীন থেকে সরে পড়ে। আল্লাহর কাছে এ থেকে নিরাপত্তা চাই।

- **আল্লাহ যে তাওবার আদেশ করেছেন, তা হলো খালেস তাওবা। খালেস তাওবার জন্য পাঁচটি শর্ত:**

প্রথম শর্ত: তাওবা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হতে হবে

আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর প্রতি সম্মান, সাওয়াবের আশা, শাস্তি ভয় তাকে তাওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। এ তাওবার মধ্যে মাখলুকের মহব্বত বা দুনিয়ার তুচ্ছ কোনো স্বার্থ থাকতে পারবে না। অন্যথায় তাওবা কবুল হবে না। কারণ, সে

[৩৪৫] ইবনুল কাইয়্যম: আদ-দা ওয়াদ দাওয়া পৃ. ১০০।

আল্লাহর কাছে তওবা করে নি; বরং ওই উদ্দেশ্যের কাছে সে তাওবা করেছে।

দ্বিতীয় শর্ত: কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত হতে হবে

সে তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হবে, এই গুনাহ যদি না হতো—এমন আশা করবে। ফলে এই লজ্জা ও পেরেশানীর কারণে সে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, তাঁর সমীপে নত হবে এবং যে নফস তাকে অন্যায় করতে প্ররোচিত করেছিল তার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হবে; আর এভাবেই তার তাওবা হবে বিশ্বাস ও সঠিক অনুধাবন থেকে উদ্ভূত।

তৃতীয় শর্ত: তৎক্ষণাৎ সে গুনাহ বর্জন করা

তাই নাফরমানী যদি হারাম কাজ করার ফলে হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা পরিত্যাগ করবে।

আর যদি নাফরমানী ওয়াজিব বর্জন করার কারণে হয়, তবে তা তখনই করতে হবে, যদি তার কাযা সম্ভব হয়, যেমন, যাকাত, হজ।

- **গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তওবা কবুল হয় না।** উদাহরণস্বরূপ:

- কেউ সুদী লেনদেনে লিপ্ত থেকে বললো, আমি সুদ থেকে তাওবা করছি। তাহলে তাওবা সহীহ হবে না; বরং এ হলো আল্লাহর সঙ্গে ঠাট্টার শামিল, যা বান্দাকে আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়।
- অনুরূপ জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় না করার গুনাহ থেকে তাওবা করল অথচ এখনো জামাতে সালাত আদায় বর্জন করেই চলে তবে তার সে তাওবা বিশুদ্ধ হয়নি।

- **আর যদি গুনাহ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয়, তাহলে তাদের থেকে নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত তাওবা সহীহ হবে না।**

- সুতরাং যদি গুনাহটি হয় কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া অথবা সম্পদ অস্বীকার করা, তাহলে সেটার হকদারের কাছে তা পৌঁছাতে হবে, যদি সে জীবিত থাকে। আর যদি হকদার মারা গিয়ে থাকে তবে তা ওয়ারিসদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আর যদি ওয়ারিসও না থাকে তাহলে বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা দিতে হবে। আর যদি প্রাপক জানা না থাকে, তার পক্ষ থেকে দান করে দেবে। আর এ সম্পর্কে আল্লাহই জানবেন।
- আর নাফরমানী যদি কোনো মুসলিমের **গীবত** তথা পরনিন্দা হয়, তবে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে; যদি সে তার গীবত করা সম্পর্কে জানতে পারে অথবা যদি এ আশংকা থাকে যে লোকটি তার গীবত সম্পর্কে জেনে

যাবে। আর যদি এরকম কিছু না হয় তবে সেই গীবতের মজলিসেই তার ভালো প্রশংসা করবে। কারণ, নেক কাজ গুনাহকে বিলুপ্ত করে দেয়।

- **নির্দিষ্ট গুনাহ থেকে তাওবা করা যাবে, যদিও অন্য গুনাহে লিপ্ত থাকে।** কারণ 'আমল যৌগিক বিষয়, আর ঈমান বাড়ে-কমে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সব গুনাহ থেকে তাওবা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাওবার গুণ তার জন্য সাব্যস্ত হবে না এবং তাওবাকারীদের উঁচু মর্যাদা ও প্রশংসার অধিকারীও সে হবে না।

চতুর্থ শর্ত: ভবিষ্যতে আর গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

কারণ, তাওবার ফলাফল এটাই, যা তাওবাকারীর সত্যবাদিতার প্রমাণ।

যদি বলে যে 'সে তাওবাকারী' অথচ সে কোনো একদিন গুনাহ করার সংকল্পবদ্ধ বা দোদুল্যমান থাকে, তাহলে তার তাওবা বিশুদ্ধ হবে না। কারণ, এটা সাময়িক তাওবা, এ তাওবাকারী উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে যখন সে আবার এ গুনাহটি করবে। এর মাধ্যমে লোকটিকে ঘৃণাবশত গুনাহ থেকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বুঝায় না।

পঞ্চম শর্ত: তাওবা কবুলের সময় অতিক্রান্ত না হওয়া

কেননা, সময় অতিক্রম করার পর তাওবা করলে, তা গৃহীত হবে না।

তাওবা কবুলের শেষ সময় দু’ প্রকার:

১. সকলের জন্য সমানভাবে ও ২. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষ।

- **তন্মধ্যে সকলের জন্য সাধারণভাবে:** সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়া। তখন আর তাওবা কোনো উপকারে আসবে না।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يَوۡمَ يَأۡتِي بَعۡضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفۡسًا إِيمَٰنُهَا لَمۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ أَوۡ كَسَبَتۡ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيۡرٗاۗ﴾ [الانعام: ١٥٨]

‘যে দিন আপনার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন আসবে, সে দিন এমন কোনো ব্যক্তির ঈমান আনয়ন তার জন্য ফলপ্রসু হবে না যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করে নি কিংবা স্বীয় ঈমান অনুযায়ী কোনোরূপ সৎকর্ম করে নি।’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৮৫}

এখানে নিদর্শন দ্বারা পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া উদ্দেশ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[346]

* 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« ولا تزال التوبة تقبل حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ»

'তাওবা সর্বদা কবুল হতে থাকে সূর্য পশ্চিম আকাশ হতে উদিত হওয়া পর্যন্ত। উদয় হলে প্রত্যেকের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। মানুষের জন্য তার আমল যথেষ্ট হয়ে যায়।'[347] ইবন কাসীর হাদীসের সূত্রকে 'হাসান' বলেছেন।

* আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ»

---

[৩৪৬] দেখুন, বুখারী: ৭১২১।

[৩৪৭] আহমাদ ১/১৯২; ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: পৃ. ১৩৭।

‘যে ব্যক্তি সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদয়ের পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।’[348]

- **প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে:** মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে এবং মৃত্যু প্রত্যক্ষ করবে তখন তাওবা তার কোনো উপকারে আসবে না এবং গৃহীতও হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ﴾ [النساء: ١٨]

‘আর এমন লোকদের তাওবা কবুল হবে না যারা মন্দ কাজ করে। এমনকি যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলতে থাকে আমি এখন তাওবা করছি।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১৮}

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ»

---

৩৪৮ মুসলিম: ২৭০৩।

‘আল্লাহ বান্দার তাওবা গরগরার (রূহ ওষ্ঠাগত হবার) পূর্ব পর্যন্ত কবুল করেন।’[349]

- সকল শর্ত পূরণের মাধ্যমে তাওবা যখন সহীহ ও গৃহীত হবে তখন আল্লাহ তার কৃত পাপ যত বড়ই হোক তা মুছে দেবেন।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣ ﴾ [الزمر: ٥٣]

‘হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের ওপর যুলম করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করবেন। তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩}

এ আয়াতটি মহান পালনকর্তার অনুগত ও আজ্ঞাবহ তাওবাকারীদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।

* আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

---

৩৪৯ আহমাদ: ২/১৩২; তিরমিযী: ৩৫৩৮; ইবন মাজাহ: ৪২৫৩। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١١٠ ﴾ [النساء: ١١٠]

'যে গুনাহ করে কিংবা নিজের ওপর যুলম করে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও করুণাময় পাবে।' {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১০}

- অতএব আপনারা নিজের জীবনের সময় থাকতে হঠাৎ করে মৃত্যু আসার পূর্বেই দ্রুত স্বীয় রবের কাছে খালেস তাওবা করুন। কারণ তখন আর উদ্ধারের কোনো উপায় থাকবে না।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন আন্তরিকভাবে তাওবা করার তাওফীক দিন; যা আমাদের কৃত পাপসমূহ মিটিয়ে দেবে এবং আমাদেরকে সহজ পথ জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিন। কঠিন পথ জাহান্নামের রাস্তা থেকে দূরে রাখুন। আর আপনার স্বীয় করুনায় আমাদেরকে এবং আমাদের পিতামাতা ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়।

আর আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কিরামের ওপর সালাত পেশ করুন।

ত্রিংশ আসর

রমযান মাসের সমাপ্তি

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি প্রশস্ত, মহান, বদান্য, দানশীল, দয়ালু। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপুণভাবে নিরূপণ করেছেন। তিনি শরীয়ত নাযিল করেছেন আর তা সহজ করেছেন। তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞাতা। তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন অতঃপর তা সম্পন্ন করেছেন। [আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র নির্ধারণ। আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়। সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায়।] {সূরা ইয়াছীন, আয়াত : ৩৮-৪০}

প্রশংসা করছি তিনি যা প্রদান করেছেন এবং হেদায়াত দিয়েছেন তার। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাঁর অনুগ্রহ ও দানের। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ

নেই। তিনিই মুনিব, উচ্চ ও সর্বোচ্চ। তিনি প্রথম তাঁর আগে কিছু নেই। তিনি শেষ তাঁর পরে কিছু নেই। তিনি বিজয়ী তাঁর ওপর কেউ নেই। তিনি নিকটে তাঁর চেয়ে কাছে কিছু নেই। তিনি সবকিছুই জানেন। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে তিনি সকল সৃষ্টিকুল থেকে নির্বাচিত করেছেন।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর ওপর; তাঁর সাথী শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী আবূ বকরের ওপর; ধর্মকর্মে বীরত্বে খ্যাতিমান উমরের ওপর; দুষ্কৃতিকারীদের হাতে অন্যায়ভাবে নিহত উসমানের ওপর; সুনিশ্চিতভাবে সবচে নিকটাত্মীয় আলীর ওপর এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজন, সাহাবী ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সুচারুরূপে তাঁদের অনুসরণকারীদের ওপর।

- **ভ্রাতৃবৃন্দ!** অতি শীঘ্রই রমযান মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এবং নতুন একটি মাস আগমন করছে। কিন্তু রমযান মাস আমাদের আমল অনুযায়ী আমাদের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে থাকবে। এ মাসে যে ব্যক্তি ভালো আমল করতে পেরেছে, সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া

আদায় করে। ও শুভ পরিণামের অপেক্ষায় থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালো আমলকারীর আমল নষ্ট করেন না। আর যে ব্যক্তি এ মাসে অন্যায় কাজ করেছে, সে যেন তা প্রভুর কাছে খালেস তাওবা করে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

আল্ল'হ তা'আলা আমাদের জন্য এ রমযানের শেষে কিছু ইবাদত নির্ধারণ করেছেন, যা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য বাড়িয়ে দিবে, ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আমলনামায় অধিক সাওয়াব লেখা হবে।

- **আল্লাহ আমাদের জন্য প্রবর্তন করেছেন যাকাতুল ফিতর:** যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।
- **তিনি আমাদের জন্য প্রবর্তন করেছিন 'তাকবীর':** রমযানের সময় পূর্ণ হওয়ার পর সূর্য ডোবার পর ঈদের চাঁদ উঠা থেকে শুরু করে ঈদের সালাত আদায় পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

'যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বর্ণনা করো

(তাকবীর বলো) আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারো।’ {সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত: ১৮৫}

তাকবীরের পদ্ধতি হলো: অধিকহারে নিম্নের এ তাকবীর পড়া:

«الله أكبر الله أكبر لا إله إلاَّ الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»

- **আর সুন্নাত হচ্ছে, পুরুষগণ** মসজিদে, বাজারে এবং ঘরে সকল জায়গায় উচ্চস্বরে তাকবীর দিবে, আল্লাহর মহত্বের ঘোষণা দেওয়া, তাঁর ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য।

  আর মহিলারা তাদের স্বর নিচু করে তাকবীর দিবে। যেহেতু তার নিজেদেরকে ও নিজেদের কণ্ঠস্বরকে গোপন করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে।

  কতইনা সুন্দর ঈদের দিনে মানুষের অবস্থা। তাদের সিয়াম সাধনার মাস শেষে তারা সর্বত্র তাকবীর ধ্বনী দ্বারা আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করে এবং তারা আল্লাহর তাকবীর, প্রশংসা ও একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে আকাশ-বাতাশ মুখরিত করে তোলে। তারা আল্লাহর রহমতের আশাবাদী এবং তাঁর আযাবের ভয়ে শংকিত !!

- অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা‘আলা ঈদের দিন তাঁর বান্দাদের জন্য **ঈদের সালাত প্রবর্তন করেছেন;** যা

মহান আল্লাহর যিকির বা স্মরণকে পূর্ণতা প্রদান করে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর উম্মতের নারী-পুরুষ সবাইকে এ আদেশ দিয়েছেন। আর নির্দেশ শিরোধার্য। কারণ,

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمد: ٣٣]

'হে ঈমানদারগণ! তেমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমাদের আমলসমূহকে নষ্ট করো না।' {সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৩}

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের ঈদের সালাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে যেতে বলেছেন। যদিও তাদের জন্য ঈদের সালাত ছাড়া অন্যান্য সালাত ঘরে পড়াই উত্তম। যা প্রমাণ করে যে ঈদগাহে নারীদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

* উম্মে আতিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেন:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমরা যুবতী, ঋতুবর্তী এবং পর্দানশীনা নারীদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদ্বহাতে সালাতের উদ্দেশ্যে বের করি। তবে ঋতুবতী নারীগণ সালাতে অংশ গ্রহণ করবে না। ঈদগাহে এক পাশে থাকবে, কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে এবং দো‘আয় শরীক হবে। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রত্যেকের জিলবাব বা বোরকা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, সে তার বোনের বোরকা নিয়ে হলেও ঈদের সালাতে শরীক হবে।’[350]

০ **সুন্নাত হচ্ছে, ঈদুল ফিতরের সালাতে যাওয়ার পূর্বে খেজুর খাওয়া।** তিন, পাঁচ বা ততোধিক বেজোড় সংখ্যায়। কারণ,

* আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا»

৩৫০ বুখারী: ৩৫১; মুসলিম: ৮৯০।

‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের সালাতে খেজুর না খেয়ে বের হতেন না এবং তিনি বেজোড় সংখ্যায় হিসাব করে খেতেন।’[351]

০ **অনুরূপ আরও সুন্নাত হচ্ছে, ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।** কেননা,

* আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

«مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا »

‘সুন্নাত হলো, ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।’[352]

০ **আরও সুন্নাত হচ্ছে, পুরুষগণ সৌন্দর্য অবলম্বন করবেন এবং সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে সজ্জিত হবে।** যেমন,

* সহীহ বুখারীতে ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ»

---

৩৫১ বুখারী: ৯৫৩।

৩৫২ তিরমিযী: ১২৯৬।

‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একটি রেশমী পোশাক বাজার থেকে এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা ক্রয় করে ঈদের দিন এবং মেহমানের উপস্থিতিতে ব্যবহার করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড়ের দরুণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন: রেশমী পোশাক ওই সকল ব্যক্তিদের জন্য যারা আখেরাতের কিছুই পাবে না।’[353]

পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক বা স্বর্ণলঙ্কার ব্যবহার বৈধ নয় বিধায় রাসূল এ কথা বলেছেন। এর থেকে বুঝা যায় যে, অন্য সুন্দর পোষাক পরা সুন্নাত।

- **পুরুষদের জন্য কোনো প্রকার রেশমী কাপড় এবং কোনো ধরনের স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করা জায়েয নেই।** কারণ এগুলো উম্মতে মুহাম্মাদীর পুরুষদের জন্য হারাম।
- **তবে নারীগণ,** ঈদগাহে সাজ-সজ্জাহীন, আতর ব্যবহার ছাড়া, পূর্ণ পর্দাসহ যাবে। কারণ তাদেরকে বাইরে বের হওয়ার সময় উলঙ্গপনা, সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং সুঘ্রাণ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং গোপনীয়তা ও পর্দার আদেশ করা হয়েছে।

---

[৩৫৩] বুখারী: ৯৪৮।

০ ঈদের সালাত বিনয়াবনত ও একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ভয়-ভীতি সহকারে আদায় করবে। বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকর করবে এবং দো‘আ পড়বে। তাঁর রহমতের আশা ও আযাবের ভয় করবে। ঈদগাহে সবাই একত্রিত হওয়ার বিষয়টিকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সামনে হাশরের মাঠে মহা অবস্থানস্থলে একত্রিত হওয়ার সাথে তুলনা করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। আর এ ঈদগাহ মাঠে মানুষের মধ্যকার মর্যাদার তারতম্যকে আখেরাতের সেদিন বড় ধরনের তারতম্য হবে সেটাও স্মরণ করবে।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ وَلَلۡأٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا ٢١﴾ [الاسراء: ٢١]

‘হে নবী! আপনি লক্ষ্য করুন, আমরা কিভাবে তাদের একদলকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আখিরাত তো অবশ্যই মর্যাদায় মহত্তর ও শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর।’ {সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২১}

আর প্রত্যেকে যেন রমযানের মত আল্লাহর বড় নেয়ামত প্রাপ্তি এবং তিনি যে এতে বান্দাকে সালাত, সিয়াম, কুরআন

তিলাওয়াত, সাদকা ইত্যাদি ইবাদত করা সহজ করে দিয়েছেন সে জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। কারণ তা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে তা থেকেও উত্তম।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨ ﴾ [يونس: ٥٨]

‘বলুন, ‘এটা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়; কাজেই এতে তারা যেন আনন্দিত হয়।’ তারা যা পুঞ্জীভূত করে তার চেয়ে এটা উত্তম।’ {সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৮}

কারণ, ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম গুনাহ মাফের ও পাপ থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়। সুতরাং মুমিনগণ রমযান মাস পেলে খুশি হয়। আর দুর্বল ঈমানদার রমযান মাস পূর্ণ হলে খুশি হয়; কারণ সে সাওম থেকে মুক্তি পেয়েছে যা তার উপর ভারী ছিল এবং যা নিয়ে তার অন্তর সংকীর্ণ ছিল। আর এ দু’দলের মধ্যে পার্থক্য যে বিরাট তা স্পষ্ট।

- **হে আমার ভাই সকল!** রমযান মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মুমিনের আমল তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শেষ হবে না।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ٩٩ ﴾ [الحجر: ٩٩]

‘আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করুন, আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত।’ {সূরা হিজর, আয়াত: ৯৯}

* তিনি আরো বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ ﴾ [ال عمران: ١٠٢]

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।’ {সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১০২}

* আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ... »

‘মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়।’[354]

---

৩৫৪ তিরমিযী: ১৩৭৬।

এখানে একমাত্র মৃত্যুকেই মানুষের আমলের পরিসমাপ্তি ধরা হয়েছে। সুতরাং রমযান মাসের সাওম শেষ হলেও ঈমানদারের আমল সিয়াম পালনের দ্বারাই বন্ধ হয়ে যাবে না; কারণ সিয়াম তো তারপরও প্রতি বছর থাকবে। আর আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। যেমন,

* সহীহ মুসলিমে আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

‘যে ব্যক্তি রমযানে সিয়াম পালন করবে, অতঃপর শাওয়ালের আরো ছয়টি সিয়াম পালন করবে, সে সারা বছর সিয়াম রাখার সমতুল্য সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।’[355]

এ ছাড়া প্রতি মাসে তিনটি করে সিয়াম পালন করা: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন,

«ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»

---

[৩৫৫] মুসলিম: ১১৬৪।

‘প্রতি মাসে তিনটি এবং এক রমযানের পর অন্য রমযান সিয়াম পালন করা সারা বছর সিয়াম পালনের সমান।’[356]

* অনুরূপ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ... «صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»

‘আমাকে আমার বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন।... এর মাঝে উল্লেখ করলেন: প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন।[357]

তবে উত্তম হচ্ছে, এ তিন দিনের সাওম أيام الْبِيض অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে হওয়া। কারণ,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললেন:

«يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»

---

৩৫৬ মুসলিম: ১১৬২।

৩৫৭ বুখারী: ১১৭৮; মুসলিম: ৭২১।

‘হে আবূ যর! তুমি যখন প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করবে তখন তা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে পালন করবে।’[358]

* অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে এসেছে, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরাফার দিনের সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি উত্তর দিলেন, ‘তা এক বছরের আগের গুনাহ ও এক বছরের পরের গুনাহের কাফফারাস্বরূপ।’ আর তাঁকে আশুরার সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘তা পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ করে।’ আর প্রতি সোমাবারের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, ‘সোমবার আমি জন্মগ্রহণ করেছি ও সোমবার নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছি এবং সোমবার আমার ওপর কুরআন নাযেল হয়েছে।’[359]

* তাছাড়া সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হলো,

---

[৩৫৮] আহমদ ৫/১৫০; তিরমিযী: ৭৬১।

[৩৫৯] মুসলিম: ১১৬২।

«ؔأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ»

‘রমযানের পরে কোন মাসে সিয়াম পালন উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর মাস মুহাররমের সিয়াম।’[360]

* বুখারী ও মুসলিমে ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»

‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া অন্য কোনো সময় পূর্ণ এক মাস সিয়াম পালন করতে দেখি নি। তেমনি শাবান মাস ছাড়া অন্য মাসে অধিক নফল সিয়াম পালন করতে দেখে নি।’[361]

* অন্য শব্দে এসেছে, ‘তিনি শা‘বানের অল্পকিছু ছাড়া পুরোটারই সাওম পালন করতেন।’[362]

* ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে অপর বর্ণনায় আছে,

৩৬০ মুসলিম: ১১৬৩।

৩৬১ বুখারী: ১৯৬৯; মুসলিম: ১১৫৬।

৩৬২ মুসলিম: ১১৫৬।

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন।’[363] এ হাদীসটি আবু দাউদ ব্যতীত ছয় গ্রন্থকারের বাকী সবাই সংকলন করেছেন। আবু দাউদে তা উসামা ইবন যায়েদ থেকে বর্ণিত।

* আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

‘বনী আদমের আমল সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আমার আমল সিয়াম অবস্থায় পেশ হওয়া আমি পছন্দ করি।’[364]

---

[৩৬৩] আহমাদ: ৬/৮০, ৮৯, ১০৬; তিরমিযী: ৭৪৫; নাসাঈ: ৪/২০২, ২০৩; ইবন মাজাহ: ১৭৩৯।

[৩৬৪] তিরমিযী: ৭৪৭।

রমযান মাস শেষ হওয়ার দ্বারা রাত জাগরণ কিন্তু শেষ হয়ে যায় না; বরং বছরে প্রত্যেক রাতে নফল সালাত ও তাহাজ্জুদ পড়ার মাধ্যমে রাতের কিয়াম শরীয়তে অনুমোদিত। আর আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কথা ও কাজ দ্বারা সারা বছর তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের বিষয়টি প্রমাণিত।

* সহীহ বুখারীতে মুগীরাহ ইবন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এত অধিক নফল সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি কি শুকরগুজার বান্দা হব না?’[365]

* অনুরূপ আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

[৩৬৫] বুখারী: ৪৮৬৩।

«أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلَامٍ»

‘হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার কর, খাদ্য খাওয়াও, আর যখন মানুষ ঘুমে থাকে তখন রাতে নফল সালাত আদায় কর, তাহলে তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।’[366]

* অনুরূপ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«َأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»

‘ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাত।’[367]

আর রাতের সালাতে সব ধরনের নফল এবং বিতর অন্তর্ভুক্ত। রাতের সালাত দু’ দু’ রাকাত করে আদায় করতে থাকবে। সময় শেষ হওয়ার ভয় হলে এক রাকাত মিলিয়ে বিতর পড়ে

৩৬৬ তিরমিযী: ২৪৮৫; ইবন মাজাহ: ১৩৩৪।

৩৬৭ মুসলিম: ১১৬৩।

নেবে। অথবা চতুর্থ আসরে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেও পড়া যেতে পারে।

* বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه»

‘আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে (শেষ রাতে) প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, আমাকে কে ডাকবে যে আমি তার ডাকে সাড়া দেব? আমার কাছে চাওয়ার মত কে আছে যে আমি তাকে দান করবো? কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে যে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।’[368]

- **তাছাড়া রয়েছে, দৈনিক ১২ রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।** চার রাকাত জোহরের পূর্বে ও দু’রাকাত পরে। দু’রাকাত

---

[৩৬৮] বুখারী: ১১৪৫; মুসলিম: ৭৫৮।

মাগরিবের পর। দু'রাকাত ইশার পর ও দু'রাকাত ফজরের সালাতের পূর্বে।

* উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি,

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ الفَرِيضَةِ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

'যদি কোনো মুসলিম বান্দা ফরয ছাড়া বার রাকাত সুন্নাত সালাত প্রতিদিন আদায় করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।'[369]

- **আরও রয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায়ের পর কিছু যিকর**। এ যিকর করতে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নির্দেশ দিয়েছেন, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْۚ ﴾ [النساء: ١٠٣]

---

৩৬৯ মুসলিম: ৭২৮।

‘অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩}

* অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয সালাত থেকে সালাম ফিরাতেন, তখন তিনবার ইস্তেগফার করতেন। অতঃপর এ দো‘আ পড়তেন:

«اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

‘হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি আর আপনার কাছ থেকেই আসে শান্তি; আপনি বড়ই বরকতময় হে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী’।[370]

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

---

৩৭০ মুসলিম: ৫৯১।

‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ৩৩ বার মোট ৯৯ বার। সর্বশেষে ১০০ পূর্ণ করতে বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তাহলে তার গুনাহ সমুদ্র ফেনা পরিমাণ হলেও আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন।’[371]

- সুতরাং হে আমার ভাইগণ! আপনারা পূণ্যের কাজে বেশি করে আত্মনিয়োগ করুন। পাপ ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন। যাতে আপনাদের পার্থিব জীবন সুখময় হয় আর মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী শান্তির অধিকারী হতে পারেন।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧]

‘পুরুষ ও নারীদের মধ্য থেকে যে ঈমানসহ সৎকর্ম করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কার্যের উত্তম পুরস্কার দেব।’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭}

---

৩৭১ মুসলিম: ৫৯৭।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ঈমানের ওপর মজবুত রাখুন এবং আমলে সালেহ করার তাওফীক দিন। হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আমাদেরকে পুণ্যবান ব্যক্তিদের সঙ্গী বানান।

আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর।